বঙ্গবিজেতা।

উপহার।

মদীয়

বিদ্যালয়ে সহাধ্যায়ী,

বিদেশ ভ্রমণে চির-সহচর

জীবনের বন্ধু,

শ্রীবিহারীলাল গুপ্ত মহানুভবকে

এই প্রণয়োপহার প্রদান

করিলাম।

মেহেরপুর।
২৬এ অক্টোবর, ১৮৭৪।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বজয় হইতে ১৬৮০ খৃঃ অব্দে
তিরোহিত হইয়াছিল, এই এক-
.গলক্ষমতা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া-
.দগের জাতীয় জীবন ও উদ্যম ও
পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করা লেখকের প্রধান
বর্ষের মধ্যে আকবর ও জেহাঙ্গীর, শাহ-
সম্রাটচতুষ্টয়ের শাসনকাল এই উপন্যাস-
াছে।

.র পূর্ব্বে বঙ্গবাসিগণ বঙ্গদেশ মাত্র আপনাদিগের
বলিয়া মনে করিতেন; অর্দ্ধশতাব্দির সুশিক্ষা ও অন্যান্য
ঘটনাবশতঃ অদ্য তদপেক্ষা উদার মতের আবির্ভাব হইয়াছে। অধুনা
সুশিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রই সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান
করেন; মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত, উত্তরপশ্চিমবাসী ও শিখ সকলকেই
স্বদেশী ও ভ্রাতাস্বরূপ জ্ঞান করেন। ভারতের অসংখ্য লোকের
মধ্যে দিন দিনে সৌহৃদ্য ও নিকট সম্বন্ধ বৃদ্ধি পাইতেছে, দিনে
দিনে ভারতবাসিগণ এক জাতি হইতেছে। লেখকের ক্ষুদ্র ...র
যতদূর সাধ্য, এই উদার বিশ্বাস সমর্থন করিবার চেষ্টা করা ...ছে।
এই উপন্যাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণ বঙ্গক্ষেত্র অতিক্রম ক... ভ্রমণ
করিয়াছেন, সমস্ত ভারতক্ষেত্র লেখকের কল্পনাবিচরণের ভূমি।
বঙ্গদেশ ও রাজস্থান, উত্তর, পশ্চিম ও মহারাষ্ট্র এই প্রদেশচতুষ্টয়
অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসচতুষ্টয় যথাক্রমে রচিত হইয়াছে।

উপরি উক্ত শত বৎসরের মধ্যে প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা-
গুলি,—অর্থাৎ মোগল ক্ষমতার উন্নতি ও রাজপুতদিগের অবনতি,
পরে মোগলক্ষমতার অবনতি ও মহারাষ্ট্রদিগের উন্নতি,—এই পুস্তকে
বর্ণিত হইয়াছে। এই ঘটনাবলিতে যে যে মহল্লোক লিপ্ত ছিলেন,
তাঁহাদিগেরও যথাস্থানে উল্লেখ আছে। টোডরমল্ল, মানসিংহ,
প্রতাপসিংহ, জয়সিংহ, জগৎসিংহ ও শিবজী প্রভৃতি প্রাতঃ-
স্মরণীয় হিন্দু বীরগণ এই শত বৎসরের মধ্যে আপন আপন
কীর্ত্তিদ্বারা যশের অবিনশ্বর মন্দিরে স্থান পাইয়াছেন।

শিবজীর মৃত্যু হইতে দুই শতাব্দি অতিবাহিত হইয়াছে ;—এত দিনের পূর্ব্বের কথা বর্ণনা করিতে স্থানে স্থানে ভুল হয় নাই, এরূ আশা করি না। তবে যতদূর সাধ্য ইতিহাস আদর্শ করিয়া ঐতি হাসিক ঘটনা ও চরিত্রের প্রকৃত বর্ণনায় যত্নবান হইয়াছি। ছ বৎসরের পরিশ্রমের ফল অদ্য পাঠক-হস্তে অর্পণ করিলাম।

কাটওয়া।
১৩ই আগষ্ট ১৮৭৯।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গবিজেতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুরে আগমন।

While the ploughman near at hand,
Whistles o'er the furrowed land,
And the milkmaid singeth blithe,
And the mower whets his scythe,
And every shepherd tells his tale
Under the hawthorn in the dale.

Milton.

১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশে হিন্দু রাজ্যের লোপ হইল। সেই অবধি ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গান অথবা পাঠানেরা এই দেশে রাজত্ব করেন। রা কখন দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতেন, ন বা সময় পাইলে স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতেন। াদিগের রাজ্যতন্ত্র অনেকাংশে ইউরোপীয় ফিউডল ্যতন্ত্রের সদৃশ ছিল। দেশের সিংহাসন শূন্য হই- ই কখন কখন সেনাপতিগণ আপনাদিগের মধ্যে াকেও রাজা স্থির করিতেন, কখন বা কোন সেনা- ত আপন বাহুবলে সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। শের অধিপতি কোন একটী উৎকৃষ্ট জেলা আপন ীনে রাখিতেন, অন্যান্য জেলা প্রধান প্রধান সেনা- দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন। তাঁহারা ার আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে জমী াগ করিয়া দিতেন। কালক্রমে এই প্রকার রাজ্য-

ক

তন্ত্রের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। সেনাপতি-গণ কখন কখন বঙ্গাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতেন, আবার সুযোগ পাইলেই আপন আপন জেলায় স্বাধীন ভাব অবলম্বন করিতেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণ সাহস ও যুদ্ধকৌশলে ন্যূন হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ; এ জন্য পাঠান অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগকেই প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাঁহাদিগকেই জমীদার করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা প্রজার নিকট কর সংগ্রহ করিতেন এবং তাঁহাদিগকেই বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র করিতেন। এমন কি, বঙ্গদেশের পাঠান রাজা-দিগের মধ্যে আমরা এক জন হিন্দু রাজারও নাম দেখিতে পাই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংস রাজা বঙ্গ দেশের অধিপতি হইয়া সাত বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করেন। তিনি পূর্ব্বে জমীদার ছিলেন, আপন বাহুবলে সিংহা-সনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, ও তাঁহার বংশ সর্ব্ব শুদ্ধ চত্বারিং বৎসর বঙ্গ দেশে রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত [illegible] হইতে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে যে, দেশে[illegible] দিগের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। দেশস্থ জমীদার জায়[illegible] দার অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন; প্রধান প্রধান জ[illegible] দারদিগের কিছু কিছু সৈন্য থাকিত ও যুদ্ধসময়ে প্র[illegible] দ্বন্দী যোদ্ধাগণ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব দলভুক্ত করি[illegible] বিশেষ যত্ন করিতেন।

দেশের কৃষক ও প্রজাগণ সম্পূর্ণরূপে জমীদারদি[illegible] অধীন থাকিত। জমীদারগণ সচ্চরিত্র ও সদয় হই[illegible] কৃষকদিগের আনন্দ; জমীদার প্রজাপীড়ক হই[illegible] তাঁহাদিগের আর নিস্তার থাকিত না। পরাক্র[illegible] জমীদারগণ প্রায়ই আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ করিতে[illegible]

তাহাতেও দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইত। ফলতঃ সে সময়ে যে জমীদার বিশেষ বুদ্ধিকুশল হইতেন, তিনি ছলে বলে কৌশলে অন্যান্য জমীদারের নিকট হইতে জমী লইয়া আপন অধিকার বাড়াইতে পারিতেন। প্রজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, দস্যু ও দুশ্চরিত্র লোকদিগকে তাঁহারাই দণ্ড দিতেন, তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে শান্তি রক্ষা করিতেন। অধিক কি, তৎকালে তাঁহারাই প্রজাগণের "বাপ মা" ছিলেন। প্রজারা কি হারে কর দিবে, তাহা তাঁহারাই নির্দ্ধারিত করিতেন; তাঁহারা যাহা চাহিতেন, তাহা দিতে অসম্মত হওয়া কোন প্রজার সাধ্য ছিল না। তাঁহারা অবিচার করিলে সুবিচারের সম্ভাবনা ছিল না। ফলতঃ জমীদারেরাই প্রজাদিগের পালনকর্ত্তা ও বিচারপতি ছিলেন, তাঁহারাই প্রজাদিগের রক্ষক ও রাজা ছিলেন।

১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শেষ পাঠান রাজা দায়ুদ খাঁ বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পর বৎসরই আকবর সাহ এই দেশ জয় করিবার অভিলাষ করেন। তিনি স্বয়ং পাটনা নগর বেষ্টন ও অধিকার করিয়া মনাইম খাঁকে সেনাপতি রাখিয়া দিল্লী যাত্রা করেন। মনাইম খাঁ নাম মাত্র সেনাপতি ছিলেন; ক্ষত্রিয় চূড়ামণি রাজা টোডরমল্লই বস্তুতঃ পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করেন। তিনিই দায়ুদ খাঁকে বার বার পরাস্ত করিয়া অবশেষে কটকের মহাযুদ্ধে জয় লাভ করেন। তাহাতে দায়ুদ খাঁ ভীত হইয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার দেশ মোগলদিগকে অর্পণ করিলেন ও কেবল উড়িষ্যা মাত্র আপন অধীনে রাখি-

লেন। এই সন্ধির পরই টোডরমল্ল দিল্লী যাত্রা করেন, এবং দায়ুদ খাঁ অবকাশ পাইয়া সন্ধির কথা বিস্মৃত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশ অধিকার করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সাহ হোসেন কুলীখাঁকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন; তিনি নাম মাত্র সেনাপতি; রাজা টোডরমল্লই সর্ব্বেসর্ব্বা। টোডরমল্ল দ্বিতীয় বার বঙ্গদেশে আসিয়া রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদ খাঁকে পরাস্ত করেন। সেই যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ নিহত হয়েন ও পাঠান রাজ্য বিলুপ্ত হয়। দিল্লীশ্বর হোসেন কুলী খাঁকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন, এবং টোডরমল্ল পুনরায় দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। হোসেন কুলী ও তৎপরে মজফ্ফর খাঁ চারি বৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল ও মজফফর খাঁ নিধন প্রাপ্ত হইলেন। আকবর সাহ অতিশয় বুদ্ধিমান সম্রাট ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যে হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশ দুইবার জয় করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সেই শত্রুসংকুল দেশ দিল্লীর অধীনে রাখিতে পারিতেছেন না। সুতরাং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীর পুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয়, ও দুই বৎসর কাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কি প্রকার সম্ব ছিল, সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহাতে পাঠক মহাশ বোধ হয়, বিরক্ত হইবেন না।

এক দিন প্রাতঃকালে এক ব্রহ্মচারী নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী ইচ্ছামতী নদীতীরস্থ রুদ্রপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। চারিদিকে কেবল বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছিল। প্রভাত বায়ু রহিয়া রহিয়া শস্য ক্ষেত্রের উপর খেলা করিতেছিল। শস্য আনন্দে যেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছিল। বহুদূরে প্রান্তর সীমায় দুই একটী পল্লীগ্রাম দেখা যাইতেছিল.; কুটীরাবলি দেখা যায়না, কেবল নিবিড় হরিৎবর্ণ বৃক্ষাবলি নয়নগোচর হইতেছিল। আকাশ অতি নীল, পক্ষী সকল গান করিতেছিল। কৃষকগণও পল্লীগ্রাম হইতে আসিতে আসিতে মনের উল্লাসে গান করিতেছিল। ব্রহ্মচারী যাইতে যাইতে একজন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন," রুদ্রপুর আর কত দূর?" কৃষক উত্তর করিল," অধিক দূর নাই, প্রায় আধ ক্রোশ হইবে।"

সেই ক্ষেত্র হইতে একজন ভদ্রোচিত বেশে ব্রহ্মচারীর নিকট আসিতে আসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, রুদ্রপুরে যাইতেছেন? আমি তথাকার লোক; চলুন, একত্রে যাই,—আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়?" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, " আমার নাম শিখণ্ডিবাহন, ইচ্ছামতী নদীতীরে মহেশ্বর মন্দির হইতে আসিতেছি। তোমার নাম কি?"

" আমার নাম নবীন দাস; এই স্থানে আমার কিছু জমী আছে, সেই জন্য আমি আসিয়াছিলাম।"

শিখ। "এবার শস্য হইয়াছে?"

নবী। "ঠাকুর, আমার দুই কুড়ি বৎসর পার হইয়াছে, এমন সুন্দর শস্য কখন দেখি নাই। বিধাতার অনুগ্রহের সীমা নাই। তবে—"

শিখ। "তবে কি?"

নবী। "অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে? মোগল পাঠানে যেরূপ যুদ্ধ, কি হয়, কে জানে? যে স্থান দিয়া একবার সেনা যায়, সে স্থান যেন মরুভূমি হইয়া পড়ে।"

ক্ষণেক পর নবীন দাস আবার বলিতে লাগিল, "আমাদের জমীদারপুত্রের কি হইয়াছে, শুনিয়াছেন?"

শিখ। "না; কি হইয়াছে?"

নবী। "তিনি এক প্রকার উন্মত্তের মত হইয়াছেন, কারণ কেহ জানে না। তাঁহার পিতা তাঁহার আরোগ্যের জন্য কত যত্ন করিলেন, কোন ফল হইল না। আপনি ঠাকুর লেখা পড়া জানেন, আপনি কিছু স্থির করিতে পারেন?"

শিখ। "শাস্ত্রে উন্মত্ততার অনেক কারণ নির্দ্দেশ করে,—বন্ধুর বিয়োগ, রমণীর প্রেম—"

নবী। "না, সেরূপ নহে; আমাদের জমীদারপুত্র কত প্রকার বিহ্বল কথা বলেন, কিছু ঠিকানা থাকে না। বোধ হয়, অনেক লেখা পড়া শিখিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন।"

শিখ। "কি বলেন, বলিতে পার?"

নবী। "কখন বলেন, বৈরনির্যাতন পরম ধর্ম্ম, কখন বলেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন,—কেও ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা? ঠাকুর প্রণাম।"

এই বলিয়া নবীনদাস পথের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট এক মলিনবসন যুবাপুরুষকে সম্বোধন করিল। যুবক কি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ আপন নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া উঠিয়া পথিকদিগের সঙ্গে চলিলেন নবীনদাস বলিতে লাগিল,—

"ইনি আমাদের গ্রামের পাগ্‌লা ঠাকুর। তবে পাগ্‌লা ঠাকুর! অনেক দিন দেখি নাই কেন? আমাদের গ্রাম হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলে? আর এখনই বা ভূমিতে উপবিষ্ট কেন?" ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সমস্ত রাত্রি চলিয়া শ্রান্ত হইয়াছিলাম।" নবীন পাগলকে আর কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা আরম্ভ করিল,—

"শুনিয়াছি, আমাদের জমীদারপুত্র কখন কখন বলিতেন, বৈরনির্য্যাতনে পরম সুখ, কখন বলিতেন, স্ত্রীরত্ন পরম রত্ন, কখন বলিতেন, বন্ধু হত্যার মত পাপ নাই, আবার কখন বলিতেন, প্রজার কষ্ট দেখা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

শিখণ্ডিবাহন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, তিনি কোন ভয়ানক পাপ করিয়া থাকিবেন, মহা পাপে চিত্তের উন্মত্ততা জন্মে।"

নবী। "তিনি কোন পাপ করিবেন, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।"

এই বলিয়া নবীনদাস ক্ষণেক স্থির হইয়া যেন পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বলিল, "তাঁহার অন্তঃকরণে যে দয়া, তিনি পাপ করিতে পারেন না। আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল, আমি একবার ইচ্ছাপুর গিয়াছিলাম, দেখিলাম, দুই চারি জন প্রজা খাজানা দিতে পারে নাই বলিয়া ঘরে আবদ্ধ আছে। তখন আমাদের জমীদারপুত্র সুরেন্দ্রনাথের বয়স ৫।৬ বৎসর হইবে। তিনি লুকাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দিলেন ও প্রজাগণের হস্তে দুইটী করিয়া মুদ্রা দিলেন। প্রজারা আনন্দে খাজানা দিয়া চলিয়া গেল।"

ইন্দ্রনাথ অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

"তাহার পর প্রজারা হঠাৎ কেন খাজানা দিল, মুদ্রাই বা কোথা হইতে পাইল, কেহ কিছু স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে প্রজারা গৃহে ফিরিয়া গেলে পর শিশু অতি ভয়ে ভয়ে পিতার নিকট আপন কর্ম্ম স্বীকার করিলেন। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। আমি দ্বারে দাঁড়াইয়াছিলাম; আমার চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল।"

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে তিন জনই রুদ্রপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন। নানা প্রকার বৃহদাকার বৃক্ষে গ্রাম আচ্ছাদিত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সূর্য্যরশ্মি পত্রের ভিতর দিয়া শুষ্ক পত্ররাশি ও গ্রাম্য পথের উপর পতিত হইতেছে। ডালে ডালে নানা প্রকার সুন্দর পক্ষী গান করিতেছে,—কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, ফিঙ্গা, পাপিয়া, ঘুঘু, সকলেই নিজ নিজ রবে মনের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। মোগল পাঠানের জয় বিজয়ে তাহাদের বিশেষ চিন্তা বা ক্ষতি লাভ নাই,—সম্পূর্ণ উদাসীন, উচ্চে বসিয়া রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য সরোবরে পদ্ম ও শালুক ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, স্থানে স্থানে বৃক্ষতলে দুই একটী কুটীর দেখা যাইতেছে, স্থানে স্থানে দুই একজন কৃষক গান করিতে করিতে মাঠে যাইতেছে, তাহাদের গৃহিণীগণ মৃণ্ময় কলস কক্ষে লইয়া হেলিয়া দুলিয়া জল আনিতে যাইতেছে।

শিখণ্ডিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্বেতা নামে এক ব্রাহ্মণী এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহার নিবাস কোথা?"

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "চলুন, আমি দেখাইয়া দিতেছি।" অনন্তর কিছু পথ লইয়া গিয়া দূর হইতে মহাশ্বেতার ঘর দেখাইয়া দিলেন। শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার ঘরে অতিথি হইলেন, আর ইন্দ্রনাথ তাঁহার চিরপরিচিত সরলস্বভাব বন্ধু নবীন দাসের বাটীতে অতিথি হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনী।

She stole along, she nothing spoke,
The sighs she heaved were soft and low,
And naught was green upon the oak,
But moss and rarest mistletoe:
She kneels beneath the huge oak tree,
And in silence prayeth she.

Coleridge.

রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছে। আজি শুক্ল পক্ষের চতুর্দ্দশী; কিন্তু মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন; ক্ষেত্র, গ্রাম, অটবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। খদ্যোৎমালা বৃক্ষলতাদির নিবিড় অন্ধকার রঞ্জিত করিতেছে। ইচ্ছামতী নদী বিপুলকায়া হইয়া তরঙ্গমালায় প্রবাহিত হইতেছে ও সেই তরঙ্গমালা নিশাবায়ুবেগে অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইতেছে। নিবিড় নিকুঞ্জ বনের ভিতর দিয়া স্বন্ স্বন্ শব্দে বায়ু প্রধাবিত হইতেছে,—বায়ুর শব্দ ও তরঙ্গের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হইতেছে না। সমগ্র জগৎ সুপ্ত।

এ প্রকার গভীর অন্ধকারে, এই শীত বায়ুতে একাকিনী কোন্ শুভ্রবসনা নদীজলে অবগাহন করিতেছেন? ইনি ব্রতাবলম্বিনী! অন্ধকারে ইহাঁর শুভ্র বসন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। স্নানান্তর বনপুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। পরে নিকটবর্ত্তী এক পুরাতন বটবৃক্ষতলে এক শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কবাট রুদ্ধ করিলেন।

মন্দিরের ভিতর একটী অল্পায়ত শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত শিবপ্রতিমা ও একটী প্রদীপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সেই প্রদীপের জ্যোতিঃ রমণীর শুভ্র বসনে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। রমণী অনেক কাল যৌবনাবস্থা অতিবাহন করিয়াছেন; বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষের অধিক হইবে, শীর্ণ কলেবর ও দুই একটী শুভ্র কেশ দেখিলে হঠাৎ পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক বোধ হয়। যদি তাঁহার শ্বেত বসন না থাকিত, তাহা হইলে অন্ধকারে ঘাটে স্নান করিতে দেখিলে, কৃষকপত্নী বলিয়াও বোধ হইতে পারিত। মন্দিরাভ্যন্তরে দীপালোকে তাঁহার মুখ অবলোকন করিলে সে ভ্রম আর থাকিতে পারে না। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘায়ত অথচ কোমলতাশূন্য নহে। ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত; কিন্তু চিন্তারেখায় গভীরাঙ্কিত। গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত কৃষ্ণ কেশ রাশি কপোলে, হৃদয়ে ও গণ্ডে লম্বিত রহিয়াছে। নয়নে যে সমুজ্জ্বলতা, তাহা প্রায় নবীনার নয়নেও দেখা যায় না। কিন্তু সে যৌবনের সমুজ্জ্বলতা নহে, হৃদয়ের সমুজ্জ্বল চিন্তাগ্নি যেন নয়ন দিয়া বিস্ফুলিঙ্গরূপে বহির্গত হইতেছে। ওষ্ঠ অতি সুচিক্কণ অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপ্রকাশক। সমস্ত শরীর গম্ভীর ও উন্নত; ও বিধবার শ্বেতবস্ত্রে আবৃত হইয়া অধিকতর গাম্ভীর্য্য ধারণ করিয়াছে। রমণী

পুষ্প সকল প্রতিমার সম্মুখে রাখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন।

অনেক ক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। বায়ু ক্রমশঃই প্রবল হইতে লাগিল, ও রহিয়া রহিয়া বট-বৃক্ষের ভিতর দিয়া ভীষণশব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কবাট ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিতে লাগিল, প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়, কিন্তু রমণীর মুখমণ্ডলের স্থির ভাবের কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। স্থির ভাবে, মুদিত নয়নে, নিস্পন্দ শরীরে প্রায় এক প্রহর কাল আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কি কামনা, কি বিষয়ে আরাধনা করিলেন, অনুভব করিতে আমরা সাহস করি না।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে রমণী প্রদীপ লইয়া বহির্গত হইবার জন্য কবাট খুলিলেন। খুলিবা মাত্র বাতাসে প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। সেই ঘনান্ধকার নিশীথ সময়ে ক্ষীণাঙ্গী প্রবল বায়ুবেগে কিঞ্চিন্মাত্র কাতরা না হইয়া ধীরে ধীরে রুদ্রপুরের গ্রাম্য পথ দিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথ অতি সঙ্কীর্ণ; উভয় পার্শ্বে কেবল নিবিড় বন ও তাহার পার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষ-সমূহের পত্ররাশিদ্বারা অন্ধকার দ্বিগুণ নিবিড় বোধ হই-তেছে। সেই বৃক্ষতলে স্থানে স্থানে এক একটা কুটীর দেখা যাইতেছে। কুটীরবাসীগণ সকলেই সুপ্ত; জীব জন্তুর শব্দ মাত্র নাই। এই প্রকারে মহাশ্বেতা কতক পথ অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এক কুটীরে উপস্থিত হইয়া কবাটে আঘাত করিলেন। দ্বার ভিতর হইতে উদ্ঘা-টিত হইল; মহাশ্বেতা প্রবেশ করিলে ভিতরে প্রদীপ হস্তে এক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিল।

মহাশ্বেতা কি চিন্তা করিতে করিতে আসিতেছিলেন;

অল্পবয়স্কার মুখ দেখিবামাত্র সহসা সকল চিন্তা দূর হইল, ও পবিত্র স্নেহভাব বদনমণ্ডলে বিকাশ পাইতে লাগিল। বলিলেন—“সরলা, এত রাত্রি হইয়াছে, তুমি এখনও জাগিয়া আছ? যাও মা, শোও গে যাও।” এই বলিয়া সস্নেহে সরলার মুখচুম্বন করিলেন। সরলা উত্তর করিল, “রাত্রি অধিক হইয়াছে, তা মা, আমি জানিতাম না; ব্রহ্মচারী ঠাকুর মহাভারতের কথা কহিতেছিলেন, তাহাই শুনিতেছিলাম। আমার বোধ হয়, মহাভারতের কথা শুনিলে আমি সমস্ত রাত্রি জাগিতে পারি।”

“না মা, সমস্ত রাত্রি জাগিলে পীড়া হইবে,” এই বলিয়া মাতা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মুখচুম্বন করিলেন। সরলা প্রদীপ লইয়া যখন শয়নগৃহে যাইতেছিল, তাহার মাতা অনিমেষলোচনে অনেকক্ষণ তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও অর্দ্ধস্ফুট বচনে বলিলেন, “তুমি আমার সর্ব্বস্ব, বিধাতা কি বন-শোভার নিমিত্ত এই অমূল্য রত্ন, এই অতুল্য পুষ্প সৃজন করিয়াছিলেন?” বলিতে বলিতে যে ঘরে ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথায় গমন করিলেন।

সরলা শয়নগৃহে যাইয়া প্রদীপ রাখিল। মাতা শয়ন করিতে আসিবেন বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল না, প্রদীপও নির্ব্বাণ করিল না। তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষ হইবে, কিন্তু এখনও যৌবন সম্যকরূপে আবির্ভূত হয় নাই, মুখ দেখিলে এখনও বালিকা বলিয়া বোধ হয়। অবয়ব বা মুখে বিশেষ রূপের ছটা বা লাবণ্য কিছুই ছিল না; কবি-গণ যেরূপ তম্বঙ্গী রূপসীদিগের বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন, আমাদের সরলার সে অপরূপ সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না। তবে শরীর কোমলতাপূর্ণ, ও মুখমণ্ডলে

এক স্বর্গীয় মধুরিমা ও সরলতা বিরাজমান রহিয়াছে,—দেখিলেই বোধ হয়, যেন বালিকাহৃদয়ে কুটিলতার লেশমাত্র নাই, কেবল সুশীলতা, সরলতা ও মানব-সাধারণের প্রতি পবিত্র প্রেম এবং স্নেহরাশি বিরাজ করিতেছে। বিশেষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার মাতার মত নয়ন দুটী সমুজ্জ্বল; সমুজ্জ্বল, কিন্তু শান্ত, সরল, ও কোমলতাপূর্ণ। ওষ্ঠদ্বয় বিশেষ সুচিক্কণ নহে, কিন্তু দেখিলে বোধ হয়, পরিমল মিষ্টতার আধার আর সদা সুহাসিতে বিকশিত। গুচ্ছ গুচ্ছ নিবিড় কৃষ্ণ কেশ বদনমণ্ডলের সরল কিশোর ভাব অধিকতর বর্দ্ধন করিতেছে। সর্ব্ব অঙ্গ কোমল ও সুস্নিগ্ধ। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর শয্যায় শয়ন করিতে না করিতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল, প্রস্ফুটিত পদ্ম যেন পুনরায় মুকুলিত হইয়া কোরক ভাব ধারণ করিল।

যে কুটীরে মাতা ও কন্যা বাস করিতেন, সে কুটীর অতিশয় সামান্য। পল্লীগ্রামের অন্যান্য ঘর যে প্রকার, একুটীরও সেই প্রকার। ক্ষুদ্র একটী পাকশালা ও একটী গোশালা ছিল, এতদ্ভিন্ন দুইটী বড় ঘর ছিল, তাহার মধ্যে একটীতে মাতা ও কন্যা ও একমাত্র দাসী শয়ন করিত, ও অপরটীতে দিনের বেলা কর্ম্ম কার্য্য হইত, ও কোন অতিথি আসিলে তাহাতেই শয্যা রচনা হইত। গোশালায় দুই তিনটী গাভী থাকিত, প্রাঙ্গণে একটী গোলা ছিল, তাহাতে কিছু ধান্য সঞ্চিত থাকিত। গৃহ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্রায়ত বাগান ছিল, তাহাতে কতকগুলি ফল বৃক্ষ ছিল ও সরলা কতকগুলি পুষ্পের চারা রোপণ করিয়াছিল। যদিও কুটীর সামান্য, তথাপি কোন আগন্তুক আসিলেই অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিতেন যে, কুটীরবাসিনীগণ নিতান্ত সামান্য লোক নহেন।

গৃহের মধ্যে সকল দ্রব্যই এমন পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে কি গ্রামে কি নগরে, প্রায় সেরূপ দেখা যায় না। বসন যৎসামান্য, কিন্তু অতি পরিচ্ছন্ন; ঘরগুলিও যৎসামান্য কিন্তু যৎপরোনাস্তি পরিষ্কৃত; প্রাঙ্গণে তৃণ মাত্র নাই। কুটীরবাসিনীদিগের আচার ব্যবহার দেখিয়া শুনিয়া প্রথম প্রথম গ্রামবাসীগণ নানা প্রকার আলোচনা করিত। এক্ষণে ছয় সাত বৎসরাবধি তাঁহাদিগকে সেই গ্রামে বাস করিতে দেখিয়া সকলেই নূতন অনুভবে বিরত হইল, সকলেই সিদ্ধান্ত করিল যে, মহাশ্বেতা কোন ধনাঢ্যের বনিতা হইবেন। ধনাঢ্য বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় বিবাহ করাতে পূর্ব্বস্ত্রী জ্বালাতন হইয়া স্বীয় কন্যাকে লইয়া নিভৃতে এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

এদিকে মহাশ্বেতা বহু সম্মান করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্মচারীকে আহার করাইয়া আপনিও কিছু জলযোগ করিলেন। পরে ব্রহ্মচারীকে এক আসনে উপবেশন করাইয়া আপনি ভূমিতে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি কথোপকথন হইতে লাগিল, আমরা তাহার কিয়দংশ বিবৃত করিব।

শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, "ভগিনি, আমি ধর্ম্ম পিতা চন্দ্রশেখরের নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সম্প্রতি তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজি সাত বৎসর হইল, ধর্ম্ম-পিতা তীর্থে গিয়াছিলেন, তখন মোগল পাঠানের মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। সাত বৎসরে হিমালয় হইতে কাবেরী তীর পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন।"

মহা। "পিতার সার্থক জীবন!"

শিখ। "অবশেষে মুঙ্গেরের নিকট কোন গ্রামে ধ্যান করিতে করিতে সহসা তাঁহার স্বপ্ন হইল যে, রক্তস্রোতে

এক মহা অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, তিমিরে এক মহাতেজঃ লীন হইয়াছে। স্বপ্নের মর্ম্ম কিছু কিছু অনুভব করিয়া বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে আমার প্রমুখাৎ তোমার ভয়ানক ব্রতের বিষয় শুনিয়া ধর্ম্ম-পিতা অতি-শয় বিস্মিত হইলেন। তিনি ব্রতের সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, এ ব্রত হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। ভগিনি, এখনও ক্ষান্ত হও!"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "ভ্রাতঃ, এ অনুরোধ হইতে আমাকে মার্জ্জনা করুন। এ ব্রত আমার প্রাণের অংশ স্বরূপ ও জীবনের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছে। এত শোক, এত মনস্তাপ সহ্য করিয়া যে আমি জীবিত আছি, এই ভয়ানক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও যে আমি স্বচ্ছন্দ আছি, সে কেবল এই ভীষণ বৈরনির্য্যাতন ব্রতের নিমিত্ত। যে দিন ব্রত উদ্‌যাপন করিব, সে দিন আমাকে জীবন ত্যাগ করিতে হইবে।"

এই উত্তর শ্রবণ করিয়া শিখণ্ডিবাহন ব্রত ত্যাগের অনুরোধ হইতে একবারে নিরস্ত হইলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "বৈরনির্য্যাতনের কোন বিশেষ উপায় অব-লম্বন করিতেছ?"

"আমি এক সিদ্ধ পুরুষের নিকট এক ভীষণ মন্ত্র লইয়াছি। তিনি এই মন্ত্রের সাধনের জন্য যে অনুষ্ঠান বলিয়া দিয়াছেন তাহাও ভীষণ, কিন্তু সে অনুষ্ঠানে আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় স্নান করিয়া নিশা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দেবদেব মহাদেবের সেই মন্ত্র দ্বারা আরাধনা করিব,—যত দিন মহাদেব শত্রু নিপাত না করেন, তত দিন কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে,—সপ্তম বর্ষের মধ্যে শত্রু নিপাত না হইলে

কুমারী কন্যাকে মহাদেবের নিকট হত্যা দিয়া চিতা-রোহণ করিব।”

অনেক ক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ব্রহ্ম-চারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তোমার ব্রত কি, তাহা আমি অবগত আছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বৈরনির্য্যাতন সাধনের জন্য এই ব্রত ধারণ ভিন্ন অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছ ?”

মহাশ্বেতা গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন, “যিনি এই বিপুল সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা লাভ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে আর কি উপায় অবলম্বন করিতে পারে ?”

সরলস্বভাব ব্রহ্মচারী মহাশ্বেতাকে উপরি উক্ত ভীষণ ব্রত হইতে নিরস্ত করিবার জন্য আর এক বার চেষ্টা করিলেন। মহাশ্বেতা বুঝিতে পারিয়া বলি-লেন, “আপনি পূর্ব্ব কথা সকল জানিলে, এ প্রকার অনুরোধ করিতেন না,—আমি নিবেদন করিতেছি শ্রবণ করুন। আর মহাত্মা চন্দ্রশেখরকেও এই সকল কথা জানাইবেন।”

পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে করিতে মহাশ্বেতার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল বিকৃতি ধারণ করিল, শরীর কণ্টকিত হইল, উজ্জ্বল চক্ষু আরও ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, ঘরের চারিদিকে নিবিড় অন্ধকারে বায়ু স্বন্ স্বন্ শব্দে প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতেছে, ও মহাশ্বেতার সামান্য কুটীরকে বেগে আঘাত করিতেছে, কিন্তু স্মৃতিজাত প্রবল চিন্তাবায়ু তদপেক্ষা শতগুণে বেগে মহাশ্বেতার হৃদয়কন্দর আঘাত করিতেছিল। শিখণ্ডিবাহন এ

প্রকার বিকৃতি অবলোকন করিয়া মহাশ্বেতাকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হইতে নিরস্ত হইতে বলিবার ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মহাশ্বেতা বলিলেন—"আমি পাপীয়সী বটি; যে পরের অমঙ্গলের জন্য সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রত ধারণ করিয়া থাকিতে পারে, সে পাপীয়সী নহে ত কি? কিন্তু সামান্য অত্যাচারে আমি পাপ ব্রত অবলম্বন করি নাই। শ্রবণ করুন।"

সরলচিত্ত শিখণ্ডিবাহন অগত্যা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ব্রতাবলম্বিনীর পূর্ব্ব কথা।

But o'er her warrior's bloody bier
The lady dropped nor flower nor tear.
Vengeance deep brooding on the slain
Had locked the source of softer woe,
And burning pride and high disdain
Forbade the rising tear to flow.

Scott.

"আমার স্বামী রাজা সমরসিংহ, বঙ্গদেশের ভূষণ ছিলেন। পাঠান দায়ুদখাঁর সহিত যৎকালে মোগলদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, আকবর সাহ স্বয়ং যে সময়ে পাটনা নগর বেষ্টন করেন, ও গঙ্গার অপর পার্শ্বস্থ হাজীপুর নগর অধিকার অভিলাষ করিয়া আলমখাঁকে প্রেরণ করেন, রাজা সমরসিংহ এক সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ও তিনিই সেই

নগর হস্তগত করিবার প্রধান কারণ ছিলেন। তাঁহার বীরত্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দিল্লীশ্বর এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, কিছু দিন পরে পাটনা হস্তগত করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমনের সময়ে আমার স্বামীকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন ও রাজা উপাধি দেন। তাহার অনতিবিলম্বেই সাগরতরঙ্গের ন্যায় মোগল সৈন্য বঙ্গদেশ প্লাবিত করিল। তরীয়াঘড়ী জয় করিয়া পরে বঙ্গদেশের রাজধানী তণ্ডা নগর হস্তগত করিল। তথা হইতে মনাইমখাঁকে ও টোডরমল্লকে অল্প সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়নপর দায়ুদখাঁর পশ্চাতে প্রেরণ করিলেন,—রাজা সমরসিংহ সানন্দ-চিত্তে টোডরমল্লের সহিত শত্রুপরিপূর্ণ বঙ্গদেশে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইলেন। তণ্ডা হইতে বীরভুমি, বীরভূমি হইতে মেদিনীপুর, মেদিনীপুর হইতে কটক—টোডরমল্ল যেখানে যেখানে গিয়াছিলেন, সর্ব্বত্রই আমার স্বামী তাঁহার দক্ষিণ হস্তের মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। যে যে যুদ্ধে টোডরমল্ল জয়লাভ করিয়াছিলেন, রাজা সমরসিংহ সেই সেই যুদ্ধে আপনার নৈসর্গিক বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে বীরত্ব ও সাহসের কি এই পুরস্কার?

"পরে কটকের নিকট যে মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে মনাইমখাঁ স্বয়ং বর্ত্তমান ছিলেন। মোগলেরা প্রায় পরাস্ত হইয়াছিল। মনাইমখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বেগে পলায়ন করিয়াছিলেন। আলমখাঁ যুদ্ধে নিহত হন; কিন্তু রাজা টোডরমল্ল ও রাজা সমরসিংহ ভয় কাহাকে বলে, জানিতেন না। রাজা টোডরমল্ল বলিলেন, 'আলমখাঁর মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি; মনাইম খাঁ পলায়ন করিয়াছেন, তাহাতেই বা আশঙ্কা কি; সাম্রাজ্য আমাদের হস্তে আছে, আমাদের হস্তে

থাকিবে।' এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে সমর-সিংহ সিংহের মত লম্ফ দিয়া শত্রু-ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, মোগলসৈন্য বঙ্গদেশীয় জমিদারের সাহস দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল, দায়ুদখাঁ পরাস্ত হই-লেন। তৎপরেই যে সন্ধিস্থাপন হইল, সেই সন্ধি সংস্থাপনের সময়ে মনাইমখাঁ দায়ুদখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, প্রায় এক বৎসর আপনি আমা-দের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, আমাদের কোন্ সেনা-পতি যুদ্ধে অধিকতর সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, আপনি অবশ্যই বলিতে পারেন।' পাঠানরাজ উত্তর করিলেন, 'প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমীদার রাজা সমরসিংহ।' এই কথা উচ্চারিত হইতে হইতে সমগ্র দরবার জয়ধ্বনি ও কোলাহলে প্লাবিত হইল; সেই জয়ধ্বনি বায়ুমার্গে আরোহণ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করিল; চতুর্বেষ্টিত দুর্গে—যথায় আমি একাকিনী উপবেশন করিয়া যুদ্ধে স্বামীর বিপদ আশঙ্কা করিতেছিলাম,—প্রবেশ করিয়া আমার শরীর কণ্টকিত করিল! অদ্য কি না সেই সমরসিংহের বিদ্রোহ অপবাদে শিরশ্ছেদন হইল। দেবদেব মহে-শ্বর! ইহার কি ইহকালে প্রতিহিংসা নাই, পরকালে বিচার নাই?"

ছিন্ন-তার বীণার মত সহসা মহাশ্বেতার গম্ভীর শব্দ থামিয়া গেল। শিখণ্ডিবাহন বলিলেন, "ভগিনি! পূর্ব্ব কথা স্মরণে যদি কষ্ট হয়, তাহা হইলে বলিবার আবশ্যক কি? বিশেষ রাজা সমরসিংহের যশোবার্ত্তা বঙ্গদেশে কে না অবগত আছেন,— সমরসিংহের পত্নীর সে কথা বিবরণ করিয়া হৃদয়ে ব্যথা পাইবার আব-শ্যক কি?"

"সমরসিংহের পত্নী নহি, এককালে সমরসিংহের রাজমহিষী ছিলাম, এক্ষণে নিরাশ্রয় বিধবা!—আমার আর অধিক বলিবার নাই, শ্রবণ করুন।"

শিখণ্ডিবাহন আবার নিস্তব্ধ হইলেন। মহাশ্বেতা বলিতে লাগিলেন,—

"এক পাপাত্মা জমীদার, আমি তাহার নাম করিব না, এই যুদ্ধে দায়ুদখাঁর সহিত যোগ দিয়া সমরসিংহের প্রাণ বধ করিতে যত্ন করিয়াছিল। টোডরমল্ল আমার স্বামীকে এত ভাল বাসিতেন যে, যুদ্ধের পর সেই জমীদারের প্রাণসংহারের আদেশ দিলেন। জমীদার ভয়ে আমার স্বামীর চরণে লুটাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল,—উদারচেতা রাজা সমরসিংহ শত্রুকে ক্ষমা করিলেন; রাজা টোডরমল্লের নিকট আবেদন করিয়া নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ জমীদারকে বাঁচাইয়া দিলেন। সেই পাষণ্ড সেই অবমাননাবার্ত্তা স্মরণ করিয়া রাখিল,—আমার স্বামীর বিস্তীর্ণ জমীদারি দেখিয়া তাহার লোভ হইল। টোডরমল্ল বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান করিতে না করিতে, সেই জমীদার সুযোগ পাইয়া কতকগুলি জাল কাগজ প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ করিল যে, রাজা সমরসিংহ বিদ্রোহী, পাঠানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন! এই মিথ্যা অপবাদে স্বামীর প্রাণদণ্ড হয়,—সেই জমীদার ব্রাহ্মণতনয়—চণ্ডাল-তনয়—সুবাদারের প্রিয়পাত্র রাজাধিরাজ দেওয়ান হইলেন।"

শিখণ্ডিবাহন বিস্মিত হইলেন, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "তবে কি বঙ্গদেশের দেওয়ান রাজাধিরাজ সতীশচন্দ্র রায় পাপিষ্ঠ নরহত্যাকারী!" বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন। মহাশ্বেতা বলিলেন, "জানি,

যে কথাটী বলিবার মানস করিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই।

"আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল, আমার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। সেই ঘটনার দুই বৎসর পরে টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আর একবার আসিয়াছিলেন। রাজমহলের মহাযুদ্ধে দায়ুদখাঁকে পুনরায় পরাস্ত ও নিহত করিয়া বঙ্গদেশে পাঠান রাজ্যের নাম লোপ করিলেন। যুদ্ধের পরেই পামর দেওয়ানকে আমার স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পামর সত্য বলিতে ভয় পাইয়া বলিল, 'রাজা সমরসিংহ সর্প-দংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।' সে সত্য কথা, কিন্তু সাধারণ সর্পের এত খলতা নাই। মানবদেহাবলম্বী কাল সর্প নহিলে এত বিষ ধারণ করিতে পারে না। আমি স্বামীর নিকট বিষম অঙ্গীকারে বদ্ধ আছি। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি আপন অদৃষ্ট জানিতে পারিয়াছিলেন। এক দিন আমাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া সন্ধ্যার সময় তথায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, 'প্রাণেশ্বরি! তোমার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে, দিতে স্বীকার করিবে?' আমি বলিলাম, 'নাথ! রমণীর স্বামীকে অদেয় কি আছে?' তখন তিনি আমাকে গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে বলিলেন। ঘোর অন্ধকার, সন্ধ্যাকালে প্রবল প্রবাহিণী গঙ্গার সৈকতে উপবেশন করিয়া উভয়েই অনেকক্ষণ গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া রহিলাম। পরে প্রভু তরঙ্গ অপেক্ষা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আমি শুনিয়াছি, সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আমার বিনাশ সঙ্কল্পে সফল হইয়াছে। যোদ্ধার মরণে ভয় নাই, কিন্তু পাপিষ্ঠকে দণ্ড দিবার কেহ রহিল না, এই জন্য দুঃখ হয়। ভ্রাতা কি সন্তান নাই, কেবল শিশু কন্যা। আর তুমি স্ত্রীলোক।

অঙ্গীকার কর. স্ত্রীলোকের যতদূর সাধ্য, তুমি বৈরনির্য্যা-তনে যত্নবতী হইবে।' আমি অঙ্গীকার করিলাম, 'স্ত্রী-লোকের যতদূর সাধ্য, বৈরনির্য্যাতনে যত্নবতী হইব।' সে সময় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম না, কেননা হৃদয়ে এখনও ক্রোধাগ্নি কালাগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল,—সে কালাগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই,—সে ব্রত এখনও সফল হয় নাই।"

শিখণ্ডিবাহন দেখিলেন. মহাশ্বেতার ব্রত ভঙ্গের চেষ্টা করা বৃথা। অগ্নিরাশিতে জলবিন্দু নিক্ষেপ করা মাত্র। বলিলেন,—

"তবে আমি ধর্ম্মপিতাকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিব।" মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "হাঁ বলিবেন; আরও বলিবেন যে, পক্ষিশাবক ব্যাধ কর্ত্তৃক আহত হইলে আপনার যাতনায় ক্রন্দন করিয়া প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু মানিনী ফণিনী পদাহত হইলে, আঘাতকারীকে দংশন করিয়া হর্ষে—হেলায় প্রাণত্যাগ করে।"

বলিতে বলিতে মহাশ্বেতা আসন ত্যাগ করিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, প্রদীপ স্তিমিতপ্রায়, মহাশ্বেতার সমস্ত শরীর কম্পিত ও কণ্টকিত। শিখণ্ডিবাহনের বোধ হইল যেন, তিনি সে প্রকার উন্নতকায় গম্ভীরাকৃতি রমণী কখন দেখেন নাই। অন্ধকারে তাঁহার হৃদয়ে যেন কিছু কিছু ভয় সঞ্চারও হইতে লাগিল। মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। প্রভাতের আলোকচ্ছটা সহসা তাঁহার কুঞ্চিত ললাটে পতিত হওয়ায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন; দেখিলেন, বৃক্ষের অগ্রভাগ তরুণ অরুণ কিরণে সুবর্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, ডালে ডালে নানা পক্ষী নানা রঙ্গে গান করিতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সরলা ও অমলা।

We Hermia, like two artificial gods,
Have with our needles created both one flower,
Both on one sampler, sitting on one cushion,
Both warbling of one song, both in one key;
As if our hands, our sides, voices and minds
Had been incorporate. So we grow together,
Like to a double cherry seeming parted,
And yet a union in partition;
Two lovely berries moulded on one stem.

Shakespeare.

বৃক্ষশাখা হইতে পক্ষিগণ শব্দ করিবার অনেক পূর্ব্বেই সরলা গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইল। ঘর, দ্বার, প্রাঙ্গণ, সকল পরিষ্কার করিল। পাঠক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিবেন, রাজকুমারীর কি এ সকল কাজ সাজে? সরলা যে রাজকুমারী, তাহা সে জানিত না। পিতার মৃত্যুর সময় সে অল্পবয়স্কা বালিকা ছিল,—তখনকার কথা প্রায় একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাহার মাতাও এ কথা তাহাকে কখন বলেন নাই। প্রতিদিন কৃষক-কুমারীদিগের কর্ম্ম করিতে করিতে আপনাকেও কৃষক-কুমারী বলিয়া মনে করিত। তাহার বালিকা হৃদয়ে অহঙ্কার, উচ্চাভিলাষ বা অভিমানের লেশ মাত্র ছিল না। চিরকাল কুটীরে বাস করিয়া মাতাকে ভাল বাসিবে, কৃষক-পত্নীদিগের সহিত আলাপ, সহবাস করিবে, সামান্য কর্ম্ম করিয়া আপন ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চ অভিলাষ তাহার অন্তঃকরণে কখন স্থান পাইত না।

গৃহাদি পরিষ্কার করিয়া সরলা মৃৎকলস লইয়া নদীতে স্নান করিতে চলিল। প্রতিদিনই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার স্নান সমাপন হইত। পথিমধ্যে এক কুটীরপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "সই!" কেহ উত্তর দিল না। পুনরায় ডাকিল, "সই অমলা!" "যাই লো!" এই বলিয়া ঘরের ভিতর হইতে কে উত্তর দিল। ক্ষণেক পরে এক ষোড়শ বর্ষীয়া, প্রখরনয়না, চঞ্চলহৃদয়া রমণী বাহিরে আসিল। তাহার পরিধান এক রাঙ্গাপেড়ে শাটী, কক্ষে কলস, হাতে শাঁকা, পায়ে মল। আসিয়াই সরলার চুল ধরিয়া টানিয়া [illegible]টিয়া বলিল, "তোর যেমন আক্কেল, আমারি ঘরে স্বামী, তাতে আবার বৃদ্ধ স্বামী, আমাকে কি এত ভোরে আসিতে দেয়? তোর কি বল, মা বিবাহ দিলেন না, সমস্ত রাত্রি ভাবনায় নিদ্রা হয় না; প্রভাত না হইতে হইতে ঘর হইতে বাহির হইতে পারিলে বাঁচিস্।" এই বলিয়া সরলাকে আবার চিম্‌টী কাটিল ও হাসিতে হাসিতে গাল টিপিয়া দিল।

সরলা বলিল, "তা, মার কেন সই, তুমি আমাকে আসিতে বল, তাই আমি ডাকিতে আসি।"

অম। "তা না হইলে আসিতে না?"

সর। "আসিতাম।"

অম। "কেন আসিতে?"

সর। "তা জানি না, কিন্তু তুমি আসিতে না বলিলেও আসিতাম।"

অম। "কেন সই, কারণ বলিতে হবে।"

সর। "সত্য বলিতেছি, কারণ আমি জানি না, কিন্তু তুমি না বলিলেও আসিতাম। সকালে উঠিয়াই তোমার মুখ[illegible] ড। যদি এক দিন তোমায় না দেখি, সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মে মন থাকে

না। রোজ দেখি কি না, অভ্যাসের জন্য বোধ হয়, এরূপ হয়।”

অমলা স্থিরলোচনে সরলার মুখখানি নিরীক্ষণ করিল,—সরলা প্রেমরাশিতে টল মল করিতেছে,—হঠাৎ মুখ ফিরাইল। সরলা বলিল, “তোমার চক্ষুতে জল কেন সই?”

অম। “ও কিছু নয়,—একটা পোকা পড়িয়াছিল বুঝি। আর শুনিয়াছ,—জমীদারের কাছারির নূতন খবর শুনিয়াছ?”

সর। “না; কি খবর?”

অম। “আমাদের জমীদার, কোন বড় ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর ছেলের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন; মেয়ে নাকি বড় রূপসী, রূপ যেন বিদ্যুতের মত, আর চক্ষু দুটী যেন,—যেন,—যেন সই, তোর চক্ষুর মত।”

সর। “তামাসা কর কেন সই, তার পর?”

অম। “তার পর সম্বন্ধ স্থির হইলে আমাদের জমীদারের ছেলে নাকি বলিলেন, আমি ও মেয়েকে বিবাহ করিব না।”

সর। “কেন?”

অম। “কেন, তা জানি না, শুনিয়াছি, কোন পল্লীগ্রামে কোন এক গরিব ব্রাহ্মণীর মেয়েকে দেখিয়া মন হারাইয়াছেন। তা, সেই মেয়ে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। আমার সইকেই বা দেখিয়া থাকিবেন?”

সর। “আবার তামাসা! আচ্ছা, বাপ বল্‌ছেন এক জনকে বিবাহ করিতে, ছেলে আর এক জনকে বিবাহ কর্‌বেন?”

[illegible]ত হইয়া কল্ বল্

অম। “তা যার [illegible] মানে; গ্রাম্য সুন্দরীরাও

বিবাহ করতে বলেন, তাহাকে যদি মনে না ধরে?”

সর। “কেন ধরবে না?”

অম। “তুই যেমন টেবু, তোকে আর কত শিখাব। বলি, মাকে বল বিবাহ দিতে, তাহা হইলে সব শিখ্‌বি।” এই বলিয়া আবার সরলার গাল টিপিয়া দিল।

এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নদীর ঘাটে উপস্থিত হইল। নদীর তীরে যাইয়া এক অপরূপ-দর্শন দৃষ্ট হইল। নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘায়ত, ছিন্নবসন এক স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান আছে। তাহার গলদেশে অস্থি-মালা, হস্তে দণ্ড, শরীরে ভস্ম, চক্ষু রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়-মান। দেখিয়া দুই জনই বিস্মিত হইল। অমলা জিজ্ঞা-সিল, “তুমি কে গা?”

সে উত্তর করিল, “আমার নাম বিশ্বেশ্বরী পাগ-লিনী।” অমলা বলিল, “হাঁ হাঁ, আমি বিশু পাগলীর নাম শুনিয়াছি। তুমি আগে এ গ্রামে একবার আসিয়া-ছিলে না?”

বিশ্বে। “আসিয়াছিলাম।”

অম। “তুমি না হাত দেখিতে জান?”

বিশ্বে। “জানি।”

অম। “আচ্ছা, আমার হাত দেখ দেখি।”

পাগলিনী হাত দেখিয়া ক্ষণেক পর বলিল;—“তুমি দেওয়ানের গৃহিণী হইবে।”

অম। “দূর পাগলী, আমার স্বামী বর্ত্তমান; বলে কি না দেওয়ানের স্ত্রী হবে। আমার দেওয়ান উজিরে কাজ নাই, আমার বৃদ্ধ স্বামী বাঁচিয়া থাকুক। এখন বল [illegible]য়ের কবে বিবাহ হবে? বিবাহ হব

পাগলিনী অনেকক্ষণ সরলার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, আবার হস্ত দেখিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর বলিল ;—

"তোমার ভবিষ্যৎ আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন; কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ও ঘোর অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। সম্প্রতি তুমুল প্রলয় উপস্থিত, তাহার পর কি আছে, বলিতে পারি না। তিন দিন মধ্যে ভীষণ ঝড় আসিবে, অদ্যই এ গ্রাম হইতে পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!"

সরলা ভীতচিত্তা হইল। অমলা প্রিয় সখীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পাগলিনীকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "ধান ভানিতে শিবের গীত,—আমি কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সইয়ের বিবাহ হইবে কবে, উনি আকাশ, মেঘ, প্রলয়ের কথা আনিলেন। দাঁড়া তো, আমি মাগীকে জব্দ করি।"

এই বলিয়া অমলা পাগলিনীর গায়ে জল দিতে লাগিলে, পাগলিনী ধীরে ধীরে দূরে চলিয়া গেল। দূরে যাইয়া পুনরায় সরলার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "পলায়ন কর, পলায়ন কর, পলায়ন কর!" অনন্তর অদৃশ্য হইল।

এদিকে অন্যান্য কৃষকপত্নীগণ আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল রামী, বামী, শ্যামী, নৃত্যের বৌ, হরির মা ইত্যাদি অনেক গ্রাম্য সুন্দরী আসিয়া ঘাট আলো (অন্ধকার?) করিয়া বসিল। নানা প্রকার কথা বার্ত্তা, ও রঙ্গরস ঘাট জমকাইয়া তুলিল। ইচ্ছামতী নদী এত সৌন্দর্য্যের ছটা দেখিয়া আনন্দে স্ফীত হইয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল; গ্রাম্য সুন্দরীরাও

আনন্দে কল্ কল্ শব্দে গল্প আরম্ভ করিলেন। গল্পের মধ্যে অল্পবয়স্কারা স্বামীর কথা ও প্রাচীনারা পর-নিন্দার কথা আনিলেন। সরলা ও অমলা কলসে জল লইয়া নিজ নিজ গৃহে আসিল।

অমলার স্বামীর সহিত পাঠক মহাশয় অগ্রেই পরিচিত হইয়াছেন। নবীন দাস সে গ্রামের একজন মহাজন ছিল, ও অনেক প্রকার ব্যবসায়ও করিত। তাহার স্বভাব অতি শান্ত ও সরল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে সঙ্গতিও ছিল। ৪০।৫০ বিঘা জমী, ২০।২৫ টা গরু, ৪।৫ খান লাঙ্গল ও বাটীর ~~সাত আট~~ দশটা গোলা ছিল। আর লোকের মুখে ~~শুনা~~ যাইত যে, নগদ কিছু টাকা মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ভিন্ন আপন পত্নীকে অনেক গহনাও দিয়াছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সের সময় দশম বর্ষীয়া অম-লাকে বিবাহ করে। এখনও বৃদ্ধ হয় নাই, কিন্তু অমলা উপহাস করিয়া তাহাকে "বৃদ্ধ স্বামী," বলিয়াই ডাকিত। অমলা স্নেহবতী ভার্য্যা, কিন্তু অত্যন্ত রসিকা। "বৃদ্ধ স্বামীর," সেবা শুশ্রূষা করিত, কিন্তু দিবা রাত্রি উপহাস করিতেও ক্ষান্ত থাকিত না। তথাপি "বৃদ্ধ-স্বামী," বলিয়া অমলার চিত্তে কোন প্রকার অসন্তোষ ছিল না, যাহা কপালে ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিল। এ প্রকার পত্নী পাইয়া "বৃদ্ধ স্বামীরও" স্নেহের ও সুখের সীমা ছিল না।

সরলার রুদ্রপুরে আগমন অবধি অমলা তাহাকে আপন সোদরা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিত, প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত। দুঃখের সময়ে সরলার নির্মল বালিকা-মুখখানি দেখিয়া সকল দুঃখ একেবারে ভুলিয়া যাইত, সুখের সময়ে সরলার প্রেমপূর্ণ চক্ষু হই

দেখিতে পাইলে সুখ দ্বিগুণ হইত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাদের স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ভাল বাসার শেষ ছিল না। সরলা সময় পাইলেই অমলার নিকট যাইত, অমলা অবকাশ পাইলেই সরলার নিকট যাইত। কত দিন তাহারা দুই জনে মধ্যাহ্নে একত্র একটী বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত, কত দিন নিশি দুই প্রহর পর্য্যন্ত সরলা অমলার সহিত নিভৃত স্থানে বসিয়া গল্প শুনিত, দুই জনের বিচ্ছেদ হইবার ইচ্ছা নাই, সুতরাং সে গল্পেরও শেষ নাই। ফলতঃ তাহাদিগের শরীর বিভিন্ন হইলেও একই মন, একই প্রাণ, একই হৃদয় ছিল।

সরলা বাটী আসিয়া দেখিল, মাতা ও ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইলেন। সরলা বলিল, "মা, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাও নাই?"

মহাশ্বেতা। "না মা, ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতে-ছিলাম, কথায় কথায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তোমার আজ ঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে,—সূর্য্য উঠিয়াছে।"

সরলা। "হাঁ মা, আজ ঘাটে বিশু পাগলী নামে এক স্ত্রীলোক আসিয়াছিল," এই বলিয়া সরলা সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। তাহার মাতা শুনিয়া শিহরিয়া উঠি-লেন। বিশুপাগলিনীর জন্য অনেক অন্বেষণ করাই-লেন, কিন্তু তাহাকে আর দেখা গেল না। মহাশ্বেতা বিমর্ষ হইয়া রহিলেন।

সরলা পাকশালায় যাইয়া স্বহস্তে অন্ন ও অন্যান্য সামগ্রী খাদ্য প্রস্তুত করিল। কর্ম্ম লাঘব করিবার জন্য দুই বেলার অন্ন একবারেই প্রস্তুত করিত। এক মাত্র

দাসী—দাসীর নাম চিন্তা; রুদ্রপুরে আসিয়া অবধি মহাশ্বেতা এই দাসীকে রাখিয়াছিলেন।

মহাশ্বেতা ব্রহ্মচারীকে সম্মান পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন। তাহার পর বাটীর সকলে ভোজন করিলে মহাশ্বেতা শয়নাগারে গমন করিলেন, সরলা দৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইল। দৈনিক কার্য্য কি? অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা জাতি মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া যে কার্য্য করিতে পারেন, সরলা তাহাই করিত। গ্রাম হইতে দুই তিন ক্রোশ অন্তরে হাট হইতে চিন্তা তুলা ক্রয় করিয়া আনিত, সরলা তাহাতে সুতা কাটিয়া হাটে পাঠাইয়া দিত। মাতার নিকট সরলা অতি সুন্দর চিত্র ও সূচিকার্য্য শিখিয়াছিল, তদ্দ্বারা অনেক প্রকার অতি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত করিত। প্রস্তুত হইলে সরলা অমলাকে দিত, ও অমলা স্বামীর দ্বারায় নগরে পাঠাইয়া দিয়া বিক্রয় করাইত। অমলা অতিশয় স্নেহবতী ও অতিশয় চতুরা; কোন দ্রব্য বিক্রয় না হইলে, বা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইলে, অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া, অধিক মূল্য সরলাকে দিত। সরলা তাহা কিছুই জানিতে পারিত না। এতদ্ভিন্ন গৃহের নিকটবর্ত্তী দুই চারিটী আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল ও অন্যান্য ফলের গাছ ছিল, তাহার ফল বিক্রয় করিয়াও কিছু কিছু পাওয়া যাইত। রাজা সমরসিংহের দুহিতা সানন্দচিত্তে এই সকল সামান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত,—এত যত্নের সহিত করিত যে, তাহাতে যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তিন জন স্ত্রীলোকের অনায়াসে জীবন ধারণ হইত। সরলার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও কর্ম করিত, ও হাটের দিন চিন্তা হাটে যাইয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিত।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। মহাশ্বেতা দৈনিক রীত্যনুসারে

স্নানার্থ গমন করিলেন। চিন্তাও অনেক রাত্রি না হইলে হাট হইতে রুদ্রপুরে পঁহুছিতে পারিত না। কুটীরে সরলা একাকিনী কাজ করিতেছে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি বশতঃই হউক বা অনেক-ক্ষণ একাকিনী বলিয়াই হউক, সরলার মুখমণ্ডল যেন কিছু ম্লান বোধ হইতেছে, সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সরলার হৃদয়ে ছায়া গাঢ়ভূত হইতেছে। চিন্তা কিছুই নাই, দুঃখ কিছুই নাই, তথাপি হৃদয়-আকাশ যেন অল্প অল্প মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে। পাঠক মহাশয় কখন সায়ংকালে দূর হইতে দুঃখধ্বনিত সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সহসা আপন অন্তঃকরণ দ্রবীভূত বোধ করিয়াছেন? সরলার হৃদয় সন্ধ্যাকালে যেন আপনা হইতেই সেই প্রকার দ্রবীভূত হইতেছিল। কখন প্রবাসে, বন্ধুশূন্য বিজনে পাঠক মহাশয় নির্জন নিঃশব্দ প্রান্তরাভিমুখে বিমর্ষভাবে অবলোকন করিয়া বসিয়াছেন? সরলার অন্তঃকরণ সেইরূপ বিমর্ষভাবে আচ্ছন্ন হইতেছিল। ভবিষ্যতে কোন ভয় নাই, স্মৃতিতে কোন পরিতাপ নাই, অথচ হৃদয় আপনা হইতেই পরিশ্রান্ত ও ভারগ্রস্ত। সম্মুখে অনবরত চরকা ঘুরিতেছে, ললাটে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু দেখা যাইতেছে,—সরলা একাকিনী বসিয়া কার্য্য করিতেছে ও অতি মৃদুস্বরে এক এক বার গান করিতেছে। অতি মৃদু গুন্ গুন্ শব্দে গীত একটী খেদের গান এক বার, দুই বার, তিন বারে সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"সরলা!"

যিনি ডাকিলেন, তিনি ব্রাহ্মণতনয়, বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর হইবে। মুখমণ্ডল অতি সুশ্রী ও ঔদার্য্য-ব্যঞ্জক; কিন্তু ঈষৎ গম্ভীর ও ম্লান। কেশবিন্যাসে কিছুই

যত্ন নাই; সুতরাং নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল অধুনা মালিন্য প্রাপ্ত হইয়া মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ আচ্ছন্ন করিতেছে। চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃপূর্ণ, কিন্তু দারিদ্র্য, অথবা দুঃখ, অথবা চিন্তায় চতুষ্পার্শ্বে কালিমা পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, উচ্চ, বক্ষঃ আয়ত, বাহুযুগল দীর্ঘ, শরীর গম্ভীর ও শান্ত, অথচ তেজঃ-ব্যঞ্জক; আকৃতি দেখিলে সহসা বীরপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ গান গীত হইতেছিল, আগন্তুক নিস্পন্দ শরীরে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলেন ও অনিমিষ লোচনে সরলার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বোধ হয়, যেন সরলার শোকাবহ গানে আগন্তুকের হৃদয়ে কোন শোক-চিন্তার উদ্রেক করিয়াছিল; ললাট কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইতেছিল; এক এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। আগন্তুকের সহিত পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই পরিচিত আছেন। তাঁহার নাম ইন্দ্রনাথ। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইন্দ্রনাথ সরলার নাম উচ্চারণ করিলেন,—

"সরলা!"

সরলা হঠাৎ পশ্চাতে দেখিয়া বলিল, "কে ও, ইন্দ্রনাথ?" ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—

"সরলা! তোমার সংসারে কি এত বৈরাগ্য হইয়াছে যে, এরূপ শোকাবহ গান গাইতেছ,—ইহার কারণ আছে বটে?"

সরলা আরও কুণ্ঠিত হইল, বলিল,—

"না, আমি মনে কিছুই ভাবি নাই,—আমার মনে কোন ভাবনাই নাই, তবে আমি ঐ একটী ভিন্ন আর গান জানি না, সেই জন্য আমি ঐটী বার বার গাইতেছিলাম। অমলা আমাকে অনেক গান শিখাইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার কেবল ঐটী মনে লাগে, ঐগান

একাকিনী থাকি, তখন বসিয়া বসিয়া গাই। আমি কি জানি যে তুমি লুকাইয়া শুনিতেছ?” এই বলিয়া সরলা মুখ নত করিল।

ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, সরলা লজ্জিত হইয়াছে, অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন,—

“একাকিনী এতক্ষণ কায করিতেছ কেন?” সরলা বলিল,—“আজি চিন্তা হাটে গিয়াছে, সেই জন্য দুই জনের কায আমিই করিতেছি। তুমি বস, মা পূজা করিতে গিয়াছেন, দুই প্রহর রাত্রির আগে আসিবেন না।” এই বলিয়া সরলা ইন্দ্রনাথকে আসন আনিয়া দিল।

এতক্ষণ একাকিনী থাকিয়া সরলা যেরূপ ম্লান হইয়াছিল, চিরপরিচিত বন্ধুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া সেইরূপ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। সরলার কি কথা? সরলচিত্ত বালিকার যে কথা, সরলা সেই কথাই কহিতেছিল। কখন মাতার কথা কহিতেছিল; কখন আপন কার্য্যের কথা কহিতেছিল; কখন আপনি যে সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছিল, তাহাই ইন্দ্রনাথকে দেখাইতেছিল; কখন ক্ষুদ্র উদ্যানে লইয়া গিয়া আপনি যে পুষ্পচারা রোপণ করিয়াছিল, তাহাই দেখাইতেছিল। ইন্দ্রনাথ আগ্রহপূর্ব্বক তাহাই শুনিতে ও দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে নিবিড় বৃক্ষাবলীর ভিতর দিয়া পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইল। প্রথমে আকাশ স্বর্ণ বর্ণ হইয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে বৃক্ষপত্রের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল পূর্ণ চন্দ্রের আলোক দেখা যাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চন্দ্র উচ্চে আরোহণ করিয়া নীল আকাশে স্বর্ণ-আলোক বিস্তার করিলেন। সে আলোকে সরলার সুগোল শরীর প্লাবিত করিল

সুন্দরীর বদনমণ্ডলের কিশোর ভাব বর্দ্ধন করিল; সুহাস-পরিপূর্ণ ওষ্ঠদ্বয় আরও মধুরিমাময় করিল; শান্ত-জ্যোতিঃ নয়নদ্বয় স্নেহরসে আপ্লুত করিল। সরলা কখনও পুষ্প চয়ন করিয়া ইন্দ্রনাথকে দিতেছে, কখন বা আনন্দোৎফুল্ল নয়নে চন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ও সেই সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছে। কতকগুলি সুগন্ধ পুষ্পচয়ন করিয়া এক ছড়া সুন্দর মালা রচনা করিল। "দেখ দেখি, কেমন সরস মালা গাঁথিলাম!" বলিয়া লীলা ক্রমে সেই মালা ইন্দ্রনাথের মস্তকে জড়াইয়া দিল। মালা স্রস্ত হইয়া গলায় পড়িল। ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা, আমাকে কি মাল্য দান করিলে?" সরলা কুণ্ঠিত হইল, চক্ষুর পাতা দুখানি ধীরে ধীরে পতিত হইল, মুখে আর কথা সরিল না। ইন্দ্রনাথেরও মুখে কথা নাই, সস্নেহ নয়নে সেই সুবর্ণ পুত্তলীর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, সেই নিবিড় কৃষ্ণ কুন্তল, সেই সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল, সেই প্রেমপ্লাবিত নয়ন, সেই স্মিতমধুর ওষ্ঠাধর, সেই মোহন মুখমণ্ডল, সেই বালিকার সরল হৃদয় আলোচনা করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "সরলা!"

ইন্দ্রনাথের গম্ভীর ভাবে সরলা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, তাঁহার ম্লান মুখ আরও ম্লান হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "সরলা! বোধ হয়, তোমার সহিত আমার এই শেষ দেখা।" সরলার প্রফুল্ল নয়নে এক বিন্দু জল আসিল, বলিল, "কেন, তুমি কি আর রুদ্রপুরে থাকিবে না?"

ইন্দ্র। "না; আমি আর রুদ্রপুরে থাকিব না; কারণ বোধ হয়, তুমি পরে জানিতে পারিবে।"

সর। "কেন, সই কি তোমাকে বাড়ীতে রাখিতে পারে না? তুমি কেন আমাদের বাড়ী থাক না? আমি মাকে বলিলে মা সম্মত হবেন। আমরা যাহা উপার্জ্জন করি, তাহাতে তোমার এখানে কোন কষ্ট হবে না, সচ্ছন্দে থাকিবে। তুমি আমাদের বাড়ী থাক।"

ইন্দ্রনাথের চক্ষু জলে প্লাবিত হইল। মুখ ফিরাইলেন, অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিলেন; কহিলেন, "সরলা! তোমার দয়ার শরীর, তোমার স্নেহ অসীম।—আমার খাইবার কষ্ট কিছু নাই। তোমার সই আমাকে বিশেষ যত্ন করেন; না করিলেও আমার অন্য স্থানে খাইবার সংস্থান আছে, আমি অন্য কারণে গ্রাম ত্যাগ করিতেছি।"

সর। "নিতান্তই কি গ্রাম ত্যাগ করিতে হইবে?"

ইন্দ্র। "সরলা, আমি চলিয়া গেলে কি তোমার মনে কষ্ট হইবে?"

সর। "কষ্ট হইবে না? আমাদের আর কে আছে, বল?"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় মুখ ফিরাইলেন। রাজা সমরসিংহের দুহিতার বান্ধবের মধ্যে এক কৃষকপত্নী অমলা, আর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। ইন্দ্রনাথ অতি কষ্টে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিলেন এবং পুনরায় কহিলেন, "সরলা, তোমার মনের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু আমি কোন প্রকারে আর এ গ্রামে থাকিতে পারি না সরলা, বিদায় দাও, যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়, পুনরায় দেখা করিব, না হয়, এই শেষ।"

ইন্দ্রনাথের মুখ হইতে আর কথা বাহির হইল না, সরলার প্রশান্ত নীলোৎপল সদৃশ চক্ষুতে অশ্রু টল্ টল্ করিতে লাগিল। প্রথমে একটী দুইটী বড় অশ্রুবিন্দু

বদনমণ্ডলে পড়িল, শীঘ্রই দরবিগলিত অশ্রুধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। সরলা ইন্দ্রনাথকে ভ্রাতার মত ভালবাসিত, তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভালবাসা আপন হৃদয়কোরকে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিত না; বিদায় দিতে এমন যাতনা হইবে, তাহা জানিত না। বলিল, "যাইবে?" যে কাতর স্বরে এই কথাটী উচ্চারিত হইল, সে কেবল রমণীকণ্ঠ হইতেই সম্ভবে। স্নেহার্দ্র প্রেমপরিপূর্ণ রমণীহৃদয় হইতে সেই স্বর বহির্গত হয়। সরলা সেই স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "যাইবে?" ইন্দ্রনাথ আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরলার অশ্রুপরিপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া, স্বর্গীয় প্রেমময় মুখমণ্ডল দেখিয়া, স্নেহমাখা কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় একবারে দ্রবীভূত হইল। দুইটী হাতে সরলার দুইটী হাত ধরিয়া রহিলেন; দুই জনেরই শরীর কম্পিত হইতে লাগিল; হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল; অশ্রুধারায় মুখমণ্ডল ভাসিতে লাগিল।

সেই পৌর্ণমাসী রজনীতে, সেই নিভৃত উদ্যানে, চন্দ্রালোকে উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া—উভয়ের হস্ত ধারণ করিয়া, পরস্পরের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—পরস্পর-দর্শন-সুধা পরস্পর যেন সতৃষ্ণ নয়নে পান করিতে লাগিলেন;—পরস্পরের বদনমণ্ডল দেখিয়া যেন হৃদয়ের যাতনা কিছু কিছু শান্ত হইতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ স্নেহভরে সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

"সরলা, আমি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য, পাপের দণ্ডের জন্য যাইতেছি; ভগবান অবশ্যই আমাকে সাহায্য করিবেন। যদি তিনি সাহায্য করেন, তবে বাঁহাকে

ভয়? অবশ্যই কৃতকার্য্য হইয়া আবার তোমারই নিকট আসিব।"

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, "যদি আইস, কবে আসিবে?"

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "ছয় মাসের মধ্যে আসিব। আজি পূর্ণিমা, আজ হইতে সপ্তম পূর্ণিমা তিথিতে আবার তোমার সহিত দেখা হইবে। যদি না হয়, তবে জানিবে ইন্দ্রনাথ আর এ জগতে নাই।"

"যদি না হয়, তবে জানিবে, সরলাও আর এ জগতে থাকিবে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে দ্বারদেশে শব্দ হইল, সরলা বুঝিল, চিন্তা আসিয়াছে। দ্বার খুলিয়া দিতে গেল। ইন্দ্রনাথ অনিমেষ লোচনে তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ও মনে মনে বলিলেন,—

"ভগবান, সহায় হও, যেন এই রমণীরত্ন লাভ করিতে পারি। যদি না পারি, এই পূর্ণচন্দ্র সাক্ষী রহিলেন, অদ্য হইতে সপ্তম পূর্ণিমাতে আত্মবিসর্জ্জন করিব।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রুদ্রপুর পরিত্যাগ।

And there were sudden partings, such as press
The life from out young hearts, and choking sighs
That ne'er might be repeated. Who could guess,
If e'er again should meet those mutual eyes,
Since upon a night so sweet such awful morn could rise!

Byron.

ইন্দ্রনাথ যে যথার্থ প্রেমের দাস, তাহা পাঠক মহাশয় অবগত হইয়াছেন। তাহা ভিন্ন আর কিছু বিশেষ পরিচয় দিতে আমরা অভিলাষ করি।

রাজা সমরসিংহ বঙ্গদেশীয় সমস্ত হিন্দু জমীদারদিগের সম্পদকালে পরমবন্ধু ও বিপদকালে এক মাত্র অবলম্বন এবং আশ্রয় ছিলেন। তিনি নিজ সাহস ও বাহুবলে যে খ্যাতি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মাবলম্বী জমীদারদিগের বঙ্গদেশে গৌরব বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ বিপদকালে তাঁহার নিকট উপকার প্রাপ্ত হন নাই, এপ্রকার জমীদার প্রায় বঙ্গদেশেই ছিল না। ইচ্ছাপুরের প্রজারঞ্জন জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রাজা সমরসিংহের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন। নগেন্দ্রনাথও রাজা সমরসিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবৎ শ্রদ্ধা করিতেন, ও তাঁহার আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিতেন না।

রাজা সমরসিংহের মৃত্যুর পর নগেন্দ্রনাথ বিধবা রাজ্ঞী ও রাজকুমারীর জন্য অনেক অনুসন্ধান করি-

পলায়ন করাতে কেহই তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইল না। বিশেষতঃ রাজা সমরসিংহের অপত্যের নিমিত্ত অধিক স্নেহ প্রকাশ করিলে রাজাধিরাজ সতীশচন্দ্রের ক্রোধভাজন হইতে হইবে, এই বিবেচনায় আন্তরিক স্নেহও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংবৃত রাখিতে হইয়াছিল। মানবহৃদয়ে স্নেহরজ্জু অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী, স্বার্থপরতা যৎপরোনাস্তি প্রবল। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে নগেন্দ্রনাথ আপনার উন্নতি-পথে ধাবিত হইতে লাগিলেন; যাহাতে আপনার ধন, মান, ক্ষমতা বর্দ্ধন হয়, যাহাতে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ও দেওয়ান মহাশয়ের প্রণয়ভাজন হইতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে অভাগা বিধবা ও অনাথা কন্যার কথা বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বৎসর মধ্যেই সে দুঃখের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলেন। রাজা সমরসিংহের যে বিধবা স্ত্রী ও অনাথা কন্যা আছে, তাহা নগেন্দ্রনাথের স্মরণপথ হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

পাঠক মহাশয় নগেন্দ্রনাথকে কৃতঘ্ন পামর বলিয়া মনে করিবেন। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, যদি নগেন্দ্রনাথ কৃতঘ্ন হয়েন, তবে এই বিপুল সংসারে ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন লোক কৃতঘ্ন। পাঠক মহাশয়! এই অখিল ভূমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করুন। ইহার মধ্যে কয় জন উপকারের প্রত্যুপকার করিবার জন্য আপন পথে কাঁটা দেন,—কয় জন পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণে আপন স্বার্থসাধনে বিরত হন? স্নেহ, দয়া, মায়া, এ সকল স্বর্গীয় পদার্থ। কিন্তু স্বার্থপরতা প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে স্নেহ কতদিন থাকে,—মায়ার পাত্র নয়নের

বহির্গত হইলে মায়া কতদিন থাকিতে পারে ? আমরা যদি নগেন্দ্রনাথের প্রতি রাগ করিয়া থাকি, তবে নগেন্দ্রনাথকৃত অপরাধ হইতে আপনি নিরস্ত থাকিতে চেষ্টা করি। বোধ করি, অনেক দরিদ্র আত্মীয় কুটুম্ব আমাদিগের মুখ চেয়ে আছে, তাহাদিগকে যেন আশ্রয় দান করি ; বোধ করি, অনেক অনাথা বিধবা যাতনায় ও কষ্টে কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে, স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহায়তা দানে যেন ধাবমান হই। এ দুঃখপূর্ণ সংসারে চারিদিকে যে দুঃখরাশি দেখিতে পাই তাহা সমস্ত নিবারণ করা মনুষ্যের অসাধ্য ; কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতে পারি, একজন তৃষার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তুষ্ট করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে এ কার্য্যক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্ম ধারণ করি নাই।

নগেন্দ্রনাথের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ এ জগতে বৃথা জন্ম ধারণ করেন নাই। স্বার্থসাধনে এতদূর বিমুখ, যে অনেক সময়ে লোকে তাঁহাকে পাগল বলিত,—স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেই লোক জগতে বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিগণিত হয়। ধনবান্ জমীদারের পুত্র হইয়াও ধনে তাঁহার আদর ছিল না;—উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভাল বাসিতেন;—কখন কখন কৃষকদিগের সহিত বাস করিতেন;—সদাই কৃষকদিগের পরম বন্ধু ছিলেন। কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময়ে গো-শালায় গাভী সকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটি

বলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতায় দোষশূন্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতেন, দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে যুগ যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্ত্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন। কতবার প্রজাদিগের সামান্য বিষয়ের কথা বার্ত্তা শুনিতেন,—অমুক গ্রামে একটা পুষ্করিণী খনন হইতেছে;—অমুক গ্রামে ধান্য দুর্মূল্য হইতেছে;—এস্থানের মহাজন বড় শিষ্ট লোক;—ওস্থানের গোমস্তা বড় অত্যাচারী; সুরেন্দ্রনাথ এই সকল কথাই আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এরূপ সময়ে তিনি আপন ধনমর্য্যাদা বিস্মৃত হইতেন; আপন কুলগৌরব বিস্মৃত হইতেন;—সেই ধান্যক্ষেত্রবেষ্টিত, আম্রকাননশোভিত কুটীরাবলিনিবাসিদিগকে আপন ভ্রাতা জ্ঞান করিয়া ভ্রাতার মত তাহাদিগের সাহায্যে তৎপর হইতেন। এরূপ লোককে সকলেই পাগল বলিবে না ত কি?

যখন মহাশ্বেতা বালিকা কন্যা লইয়া চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সুরেন্দ্রনাথ আপন পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া অনেক দিন অন্বেষণের পর তাঁহার সন্ধান পাইলেন। তৎকালে মহাশ্বেতা ইচ্ছামতী-তীরে মহন্ত চন্দ্রশেখরের নিকট মহেশ্বর-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয় দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অভিমানিনী মহাশ্বেতা দরিদ্রাবস্থায়ও গর্ব্বিতা ছিলেন, সহায়তা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সুরেন্দ্রনাথ বার বার উপরোধ করিলেন, কিন্তু মহাশ্বেতা বার বার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "রাজা সমরসিংহের

বংশ এই দরিদ্রাবস্থায়ও মাননীয়,—পরের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করে না।” এ কথায় সুরেন্দ্রনাথ অগত্যা উপরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন। অবশেষে বলিলেন, “আপনার স্বামীর নিকট আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অনেক বিষয়ে ঋণগ্রস্ত আছি, এই অ-সময়ে যদি কোন প্রত্যুপকার না করিতে পারিলাম, তবে চিরকাল আমার জন্ম বিফল মনে করিব। অতএব যদি অর্থ গ্রহণ না করেন, বলুন, আর কি প্রকারে আপনার উপকার করিতে পারি?” মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, “তবে তোমার জমীদারির মধ্যে আমাকে থাকিবার স্থান দান কর, আমি বৎসরে বৎসরে তাহার খাজনা দিব, আর কোন নদীতীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেও, তথায় এই শিবপ্রতিমা প্রতিরাত্রে পূজা করিব। ইহা ভিন্ন আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই।” সুরেন্দ্রনাথ রুদ্রপুর গ্রামে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং সেই অবধি মহাশ্বেতা ও তাঁহার কন্যা তথায় থাকিতেন।

যে-সময় সুরেন্দ্রনাথ চন্দ্রশেখরের নিকট গিয়াছিলেন; তখন তাঁহার ছদ্মবেশ—তখনই তিনি ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশেই তিনি দেশে দেশে অনুসন্ধান করিয়া মহাশ্বেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, ছদ্মবেশেই তাঁহার সহিত সেই নিস্তব্ধ আশ্রমে সরলার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইচ্ছামতী-তীরে কতবার তিনি বালিকাকে খেলা দিয়াছেন; কতবার তাহাকে গল্প বলিয়াছেন; কতবার তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছেন। এইরূপে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ও সরলার মধ্যে সোদর সোদরার প্রেম জন্মিয়াছিল। তাহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ভাব অন্তরে উদয়

হইয়াছে, তাহা অদ্যকার এই পূর্ণিমা রজনীর পূর্ব্বে কেহই জানিতে পারেন নাই।

প্রেমের কি প্রবল পরাক্রম! যে সরলার বালিকা-হৃদয়ে কখনও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই, আজি সেই সরলার হৃদয় চঞ্চল হইল। বাল্যকালাবধি সুরেন্দ্রনাথ যে পরোপকারব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন,—আজি তাহা ত্যাগ করিয়া প্রেমব্রত অবলম্বন করিলেন। আজি তিনি পরোপকারী সুরেন্দ্রনাথ নহেন, ঘোর স্বার্থপর ইন্দ্রনাথ।

প্রেমপরায়ণতা আর স্বার্থপরতা কি এক? যে পবিত্র প্রেমের উপরোধে লোকে প্রণয়িনীর উপকারার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়, সে পবিত্র প্রেম কি স্বার্থপরতার অঙ্গবিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে?—কবিগণ যাহাই বলুন, প্রণয়িগণ যাহাই বলুন, আমাদের অভিপ্রায় এই, সেই পবিত্র প্রেম স্বার্থ-পরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ভাব অবলম্বন করিয়া তুমি জগতের উপকার হইতে বিরত হইলে;—যে ভাবে অন্ধ হইয়া তুমি সমগ্র জগতে কেবল আপন প্রণয়পাত্রের প্রতিকৃতি দেখিতে পাও,—যাহার প্রভাবে তুমি বিবেচনা কর যে, এই সুন্দর নভোমণ্ডল, সুন্দর বৃক্ষলতাদি, নয়নরঞ্জন পুষ্পচয়, কেবল তোমাদের প্রণয় ও সুখবর্দ্ধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে,—যে ভাবের প্রভাবে তুমি আত্মসুখ ও আপন প্রণয়িনীর সুখ ভিন্ন আর সকলই ভুলিলে,—সে ভাব স্বার্থপরতা নয় ত কি?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় মহাশ্বেতা পূজা সমাধা করিয়া গৃহে আসিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট বিদায় লইবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্র-নাথ বলিলেন;—

"আপনি যে দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সতীশচন্দ্রের নিধন সাধন না করিলে বোধ হয়, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পাইব না।"

মহাশ্বেতা। "পাইবে না।"

ইন্দ্র। "আশীর্ব্বাদ করুন,—আমি অদ্যই সেই অভিপ্রায়ে যাত্রা করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, অবশ্যই মনোরথ সিদ্ধ হইবে।"

মহা। "আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেবদেব মহেশ্বর তোমার যত্ন সফল করুন। কিন্তু তুমি বালক,—সেই চতুর বুদ্ধিকুশল পামরকে কিরূপে পরাস্ত করিবে, আমার বুদ্ধির অগোচর।"

ইন্দ্র। "অধুনা আমারও বুদ্ধির অগোচর, দেখা যাউক কি হয়।"

মহা। "অবশ্যই তোমার জয় হইবে,—ধর্ম্মের যদি জয় না হয়, তবে এ সংসার ছারখার হইবে,—কেহ আর দেবদেবীর আরাধনা করিবে না।"

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের যদি সর্ব্বদা জয় হইত, তবে আপনার স্বামী নিধন প্রাপ্ত হইতেন না, সতীশচন্দ্রও বঙ্গদেশের দেওয়ান হইতেন না, মানবজাতি কখন ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিত না। যখন চারিদিকে পাপের গৌরব দেখিতেছি,—যখন অত্যাচারী ও কপটাচারিগণ ধন, মান, ঐশ্বর্য্য লাভ করিতেছে; যখন পরমধার্ম্মিক, পবিত্রচেতা, পরোপকারিগণ নিষ্পীড়িত ও পদদলিত হইতেছেন;—তখন আর সংসারের ছারখার হইবার বাকী কি? যদি সদাই ধর্ম্মের জয় থাকিত, তাহা হইলে পাতক ও কপটাচারী এ সংসার হইতে একবারে দূরীভূত হই-

তথাপি কেন যে অধর্ম্মের জয় হয়, কে বলিবে? ভগবানের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে?”

পরে মহাশ্বেতা বিশ্বেশ্বরী পাগলিনীর কথা ইন্দ্রনাথকে বলিলেন। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, “এই পাগলিনী মানুষী কি যোগিনী কি প্রেতকন্যা, বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার কথা কখন মিথ্যা হয় নাই।”

মহাশ্বেতা। “কখন মিথ্যা হয় নাই। আমার স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিয়াছিল। আমি স্বামীকে সবিশেষ অবগত করাইয়া সপরিবারে পলাইবার উপদেশ দিলাম। সেই বীরপুরুষ যে উত্তর দিলেন, তাহা আমার স্মৃতিপথে অদ্যাপি জাগরিত রহিয়াছে। বলিলেন, ঘোর সংগ্রামস্থলে হিন্দু কি মুসলমান, মোগল কি পাঠান, কেহ কখন সমরসিংহকে পলায়ন করিতে দেখে নাই,—আজি পামর সতীশচন্দ্রের ভয়ে পলায়ন করিব? মরিতে হয় মরিব, যোদ্ধার তাহাতে ভয় কি? সুরেন্দ্রনাথ। পূর্ব্ব কথা আর তোমাকে কেন বলি? যে হুতাশন আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে, তাহা অন্তরেই থাক।”

ইন্দ্রনাথ বলিলেন, “সেইবার ভিন্ন আরও দুই তিন বার ঐ পাগলিনী যে যে কথা বলিয়াছে, তাহাই সত্য হইয়াছে। আমার পরামর্শে আপনাদিগের এই গ্রাম হইতে পলায়ন করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।”

মহাশ্বেতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। উক্ত পাগলিনী দুই তিন বার এই প্রকার সহসা দেখা দিয়া যে যে ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিল, কখন মিথ্যা হয় নাই। তিনি অন্তরে নিশ্চয় জানিলেন যে, সেই পামর সতীশচন্দ্র আবার সমরসিংহের নিরাশ্রয় বিধবার অনিষ্ট চেষ্টা

করিতেছে, পাগলিনী মানুষী হউক বা প্রেত-কন্যা হউক জানিতে পারিয়া সতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছিল। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "অদ্যই পলায়ন করা শ্রেয়ঃ—উপায়ান্তর নাই।"

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন,—আমার আলয়ে আপনাকে আহ্বান করিতে আর ভরসা করি না?"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "মহেশ্বরমন্দিরের মহন্ত চন্দ্রশেখরের নিকট পুনর্ব্বার যাইব।" ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন, কোন উত্তর করিলেন না। তৎক্ষণাৎ গ্রাম পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগে গমন করিলেন।

মহাশ্বেতা সরলাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া সবিশেষ বলিলেন। সরলার বালিকা-মুখ-মণ্ডল গম্ভীর হইল। রুদ্রপুর গ্রামে ছয় বৎসর কাল থাকিয়া সকল দ্রব্যে মায়া হইয়াছিল। সেই পরিপাটী কুটীর, সেই উদ্যান, সেই স্বহস্তরোপিত পুষ্পচারা, সকলই ত্যাগ করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া আর রুদ্রপুরের পক্ষিদিগের সুললিত-গান শুনিতে পাইবে না, দুই প্রহরে সেই আম্র-বৃক্ষের নিস্তব্ধ স্নিগ্ধ ছায়াতে উপবেশন করিয়া আর কার্য্য করা হইবে না,—সন্ধ্যায় অমলার সেই সুমধুর হাস্যবিকসিত মুখ আর দেখিতে পাইবে না। অমলার কথা স্মরণ হওয়াতে চক্ষুতে জল আসিল, বলিল,—

"মা, আমি সইয়ের নিকট বিদায় লইয়া আসি।" মহাশ্বেতা বলিলেন, "যাও মা, কিন্তু শীঘ্র আইস।"

সরলা বিদায় লইতে চলিল।

অমলার গৃহের নিকট যাইয়া ডাকিল, "সই"। প্রফুল্লবদনা অমলা গৃহের বাহিরে আসিল।

তামাসা করিবে, বলিয়া তাহার অধরোষ্ঠ হাসিতে বিস্ফারিত ; বলিল, "এত রাত্রিতে ?" আর কথা বাহির হইল না। সরলার মুখপানে চাহিয়া অমলার প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল ; অধরের হাসি শুকাইয়া গেল, দেখিল সরলার নয়নযুগল জলে ছল্ ছল্ করিতেছে, টস্ টস্ করিয়া বক্ষঃস্থলে জল পড়িতেছে। অমলা নিকটে আসিয়া স্নেহভরে হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি সই, কি হইয়াছে ?"

সরলা উত্তর করিল, "মা বলিয়াছেন, আমরা এই গ্রাম হইতে অদ্যই চলিয়া যাইব,—তোমার সঙ্গে বোধ হয়, এই শেষ দেখা," বলিয়া সরলা অমলার বক্ষঃস্থলে আনন মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত ধারায় রোদন করিতে লাগিল। দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সহসা এই কথা শুনিয়া অমলার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হইল। প্রথমে সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না, কিন্তু সরলার স্বর-ভঙ্গীতে সন্দেহেরও স্থল থাকিল না। অমলা কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু মনে মনে প্রতীতি হইল, প্রিয় সখীর সহিত চিরবিচ্ছেদ অনিবার্য্য। তখন অমলাও চিত্ত সংযম করিতে পারিল না। সরলচিত্তা সরলাকে অমলা কনিষ্ঠ সোদরা অপেক্ষাও স্নেহ করিত। ছয় বৎসর কাল একত্র থাকিয়া তাহাকে সোদরা অপে-ক্ষাও অধিক ভাল বাসিত। এখন, সহসা সেই প্রিয় সখীর সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল। সহসা ছয় বৎসরের প্রণয়ের কথা মনে উদয় হইতে লাগিল। অমলা অশ্রু-বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, চক্ষুজলে সরলার কেশ সিক্ত করিল। কিন্তু সরলাকে রোদন করিতে দেখিয়া শীঘ্রই আপন চিত্ত সংযত করিল, সরলাকে বলিল, "আমার সঙ্গে আবার শেষ দেখা ? তুমি যেখানে

থাকিবে, আমি সেই খানে যাইয়া তোমার সহিত দেখা করিব, তাহার জন্য চিন্তা কেন? এক্ষণ এ গ্রাম হইতে তোমরা কেন যাইবে, বল দেখি?”

সরলা কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিল, “তাহা আমি জানি না; মা তাহা বলেন নাই। কিন্তু আমরা ইচ্ছামতী-তীরে মহেশ্বরমন্দিরে যাইতেছি।”

অম। “কেন যাবে, জান না?—আমি বলিব?”

সর। “বল।”

অম। “তোমার মা তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন!”

সরলা অগত্যা দুঃখ ভুলিয়া গেল, একটু হাসিল। অমলা পুনরায় বলিল,—

“তা মহেশ্বরমন্দির আর চন্দ্রপুর ত এপাড়া ওপাড়া, প্রত্যহ যাইয়া তোমায় দেখিয়া আসিব। দেখিও বিবাহের সময় আমি উপস্থিত হইয়া ‘উলু’ দিব।”

এই প্রকারে অনেক ক্ষণ কথোপকথন হইতে লাগিল। কেহ আর কাহাকেও ছাড়িতে চাহে না,—ছাড়িলে যেন দুই জনেরই হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। অথচ অমলার কথায় সরলার হৃদয় কিছু শান্ত হইয়াছে;—অমলার অধরে হাসি, চক্ষে ক্রন্দন,—হৃদয়ে কি তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল, পাঠক মহাশয় বুঝিবেন।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল, দাঁড়াও সই, আমি শীঘ্রই আসিতেছি,—বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। যখন পুনরায় বাহিরে আসিল, সরলা দেখিল, তাহার বসন সিক্ত হইয়াছে ও চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। আসিয়া সরলার কাপড়ের অঞ্চলে কি বাঁধিয়া দিল। সরলা জিজ্ঞাসা করিল, “কি দিলে, সই?” —অমলা উত্তর করিল, “ও কিছু নহে, পথে ক্ষুধা

পাইবে, সেই জন্য কিছু মুড়ী আর ফুট্ কড়াই আঁচলে বাঁধিয়া দিতেছি ;—আমার মাথা খাও, ফেলিয়া দিও না।” এই বলিয়া কাপড়ে ২০ টী রৌপ্য মুদ্রা বাঁধিয়া দিল। অমলা আবার বলিল, “স্বামী পাইলে আমাকে মনে থাকিবে ত ?”

সরলা উত্তর করিতে পারিল না, চক্ষে জল আসিল, কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায় হইল। অমলা বলিল, “কাঁদিও না সই, আমি জানি, তুমি সইকে ভুলিবে না, কিন্তু পাছে ভুলে যাও, তাই আমার একটী চিহ্ন তোমার গায়ে রাখিয়া দি।” এই বলিয়া আপন গলদেশ হইতে সোণার চিক লইয়া সরলার গলায় পরাইয়া দিতে গেল। সরলা বাধা দিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে অমলা বলিল, “যদি না লও, তবে আমি জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ ;—যদি আমাকে কখন ফিরাইয়া দিতে চাহ, তবে জানিব, আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ।” সরলা নিরুত্তর হইল। অমলা তাহাকে সেই চিক পরাইয়া দিতে লাগিল।

পরাইয়া দিতে দিতে অমলা সেই পূর্ণচন্দ্রের আলোকে সরলার বালিকামুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সেই নিবিড় কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলবেষ্টিত মুখখানি দেখিতে লাগিল, সেই নীলোৎপল সদৃশ প্রেমবিস্ফারিত নয়ন দুটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, সেই সুমধুর ঈষৎ বিভিন্ন ওষ্ঠ দুই খানি দেখিতে লাগিল। মনে মনে ভাবিল, এই প্রেমপুত্তলীকে কি আর কখন হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পাইব না ? মনে এই ভাবনা উদয় হওয়ায় আর চিত্তসংযম হইল না।

চিক পরাইবার ছলে অমলা সরলাকে আপন হৃদয়ের উপর আনিল, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিল,

নয়নের নিকট নয়ন লইয়া আসিল, কম্পিত অধরৌষ্ঠে কম্পিত অধরৌষ্ঠ স্পর্শ করিল। সরলা দেখিল, চিক পরান আর শেষ হয় না, দেখিল, আপনার কাপড় জলে ভাসিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "সই কাঁদিতেছ?" অমলা বলিল, "আমি কাঁদিতেছি না, তুমি কাঁদিতেছ?—আমার ঘুম পাইয়াছে, আমি শুইগে যাই"—এই বলিয়া বেগে গৃহের ভিতর চলিয়া গেল। সরলা ধীরে ধীরে আপন কুটীরাভিমুখে চলিল। অল্প দূর যাইয়া অমলার গৃহের দিক হইতে অতি মৃদু ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইল। রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত হৃদয়বিদারক মৃদু রোদনধ্বনি শুনিতে পাইল। সরলা কিছু বুঝিতে পারিল না, ভাবিল, সই ত ঘুমাইতে গেল, ক্রন্দন করে কে? ভাবিতে ভাবিতে দ্রুতপদে আপন গৃহাভি-মুখে গমন করিল।

এদিকে ইন্দ্রনাথ নৌকা ঠিক করিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও ইন্দ্রনাথ সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন, দ্রব্যাদির মধ্যে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত শিবপ্রতিমা, আর দুই একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য ভিন্ন কিছুই লইলেন না। নৌকা ধীরে ধীরে ইচ্ছামতী নদী দিয়া চলিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে নদী প্রশস্ত হইয়াছে, উভয় পার্শ্বে প্রান্তর, অটবী ও গ্রামস্থ বৃক্ষলতাদি চন্দ্রালোকে অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে নদী এমন সংকীর্ণ হইয়াছে যে, উভয় পার্শ্বস্থ বংশশাখা লম্বিত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে। তাহার নিবিড় পত্ররাশির মধ্যদিয়া চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে ইচ্ছামতীর স্বচ্ছ সলিল উজ্জ্বল করিতেছে। ইচ্ছামতীর নীল জল কল্ কল্ করিতেছে ও তাহার উপর দিয়া ক্ষুদ্র তরী তর্ তর্ করিয়া ভাসিয়া যাই-

তেছে। সরলা এই প্রকার শোভা সন্দর্শন ও শ্রুতি-মধুর শব্দ শ্রবণ করিতে করিতে শীঘ্রই নিদ্রিত হইল। ইন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিয়া আপন অঙ্কে সরলার মস্তক স্থাপন করিলেন, সমস্ত রাত্রি আপনি অনিদ্র হইয়া সেই নির্ম্মল চন্দ্রালোকদীপ্ত সেই নির্ম্মল মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। চক্ষুর জ্যোতিঃ এক্ষণে স্তিমিত; নিবিড় কৃষ্ণপক্ষযুক্ত পত্রগুলি নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। প্রাতঃকালে নৌকা ইচ্ছামতী-তীরস্থ এক ক্ষুদ্র গ্রামে লাগিলো। সেই গ্রাম প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূর ও চারি দিকে কাননে বেষ্টিত। মন্দিরের মহন্ত চন্দ্রশেখর ও অন্যান্য পূজক সময়ে সময়ে মন্দির হইতে আসিয়া এই গ্রামে বাস করিত সেই জন্য ইহাকে বনাশ্রম বলিত। আরোহীগণ নামিলেন। ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিয়া চন্দ্রশেখরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসীগণ আগ্রহপূর্ব্বক রমণীগণকে আহ্বান করিলেন। ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন, "আজি হইতে সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যদি তোমার সহিত না সাক্ষাৎ করি, তবে জানিবে, ইন্দ্রনাথ এজগতে নাই;—সে পর্য্যন্ত আমাকে মনে রাখিও।" সরলার কোন উত্তর নাই, অতি কাতর সজল নয়নে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার অর্থ এই, "শরীরে যত দিন জীবন থাকিবে, তুমি স্মৃতি-পথে জাগরিত থাকিবে।" দেখিতে দেখিতে ইন্দ্রনাথ দৃষ্টির অগোচর হইলেন। সরলা অনেকক্ষণ শূন্য হৃদয়ে, সজল নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল, অনেক-ক্ষণ পর শূন্য হৃদয়ে আশ্রমাভিমুখে ফিরিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিমলা।

Now naught was heard beneath the skies,
The sounds of busy life were still,
Save an unhappy lady's sighs,
That issued from the lonely pile.

Mickle.

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর ভীমকান্তি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ ও প্রাসাদ দেখা যাইতেছে। যমুনা নদী চতুর্দ্দিকে দুর্গ বেষ্টন করিয়া কল্ কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। দুর্গের চারিদিকের দৃশ্য অতি রমণীয়। সম্মুখে যতদূর দেখা যায়, মনোহর হরিৎ প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। সূর্য্য অস্ত গিয়াছেন, কিন্তু এখনও পশ্চিম মেঘে রক্তিমার আভা দেখা যাইতেছে। দুর্গপদচারিণী শান্তপ্রবাহিনী নদীর নির্ম্মল বক্ষে সেই আভা প্রতিফলিত হইতেছে। সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে অবতরণ করিতেছে; অবতরণ করিয়া সায়ংকালীন নিস্তব্ধতাকে অধিকতর মনোহর করিতেছে। দূরস্থ দুই একটী বটবৃক্ষের ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে; সন্ধ্যাকালের রমণীয় নীলিমা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অধিকতর রমণীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে। প্রান্তরে শব্দমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে বায়ুহিল্লোলে দূরস্থ পল্লীর ক্রমশঃ মন্দীভূত রব শ্রুত হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরিশ্রান্ত গৃহাভিমুখগামী কৃষকদিগের শ্রমাপনোদন গীত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে।

দুর্গের পশ্চাৎভাগ এরূপ নহে। তথায় একটী প্রশস্ত আম্রকানন; উহা এত প্রশস্ত যে দুর্গ হইতে সেই আম্রবৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। সায়ং-কাল যেমন ক্রমশঃ ঘোরতর হইতে লাগিল, সেই আম্র-বৃক্ষের ভিতর পুঞ্জপুঞ্জ খদ্যোতমালা দেখা দিতে লাগিল; নিকটে, দূরে, উচ্চে, নীচে সেই খদ্যোতমালা খেলা করিতে লাগিল। উদ্যানের ভিতর সুন্দর সরোবর, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে, সরোবরের চারি দিকে নানা প্রকার কীট পতঙ্গ স্ব স্ব রবে সায়ংকালের কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে।

বাহির হইতে দেখিলে দুর্গের উচ্চ প্রাসাদ সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত,—কেবল একমাত্র গবাক্ষ হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। সেই গবাক্ষপার্শ্বে এক অল্পবয়স্কা রমণী আসীনা,—হস্তে গণ্ডদেশ স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন।

রমণী গগনমণ্ডলের ললাটস্থ এক মাত্র উজ্জ্বল তারার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহারও সুন্দর সীমন্তে এক মাত্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ড ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

রমণী কি চিন্তা করিতেছেন;—কে বলিবে, কি চিন্তা করিতেছেন? একি প্রেমের চিন্তা? প্রেমের চিন্তাতে বদনমণ্ডল ম্লান হয়, নম্র হয়,—এরূপ গর্ব্ব-বিস্ফারিত হয় না।

রমণীর বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ হইবে,—যৌবনে সর্ব্ব অঙ্গ অনুপম অসাধারণ সৌন্দর্য্যে বিকসিত হইয়াছে; কিন্তু এ সাধারণ নারীজাতির সৌন্দর্য্য নহে,—অলৌ-কিক উদার স্বভাব ও চিত্তোন্নতিব্যঞ্জক। সে রূপ-

রাশির সম্মুখে দাঁড়াইলে সহসা প্রেমের সঞ্চার হয় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঞ্চার হয়। শরীর কিঞ্চিৎ ক্ষীণ, উন্নত ও দীর্ঘায়ত, অথচ কোমলতা-পরিপূর্ণ। ললাট অতি সুন্দর, সুবঙ্কিম, অথচ উচ্চ ও প্রশস্ত; সেরূপ প্রশস্ত পরিষ্কার ললাট পুরুষের কদাচিৎ দেখা যায়, স্ত্রীলোকের কখনই সম্ভবে না। নয়নের স্থির উজ্জ্বলতা, ওষ্ঠের সুচিক্কণতা, সমস্ত বদনের উন্নত ও গম্ভীর ভাব, হৃদয়ের মহত্ত্ব ও চিত্তের ঔদার্য্য ও মহাশয়ত্ব প্রকাশ করিতেছে; সমস্ত অবয়বের ভাব ভঙ্গী দেখিলে হঠাৎ প্রতীয়মান হয় যে, এ তীক্ষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়ী তন্বঙ্গী মানুষী নহেন,—কোন যোগপরায়ণা স্বর্গবাসিনী মানবজাতির উন্নতি সাধনার্থ এই মর্ত্ত্য জগতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

সেই নিস্তব্ধ সায়ংকালে গবাক্ষপার্শ্বে বসিয়া রমণী সেই সুন্দর নির্ম্মল আকাশপথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রমণীর বদনমণ্ডলও অপরূপ সুন্দর ও নির্ম্মল। রজনী গভীর হইতে লাগিল; আকাশের বিস্তীর্ণ নীলবর্ণ ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল;—রমণীর হৃদয়েও যেন চিন্তারজনী গভীর হইতে লাগিল, তাঁহার প্রশস্ত ললাটও যেন ক্রমশঃ ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে লাগিল; সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল অধিকতর কুঞ্চিত হইতে লাগিল; নয়ন হইতে তীক্ষ্ণতর উজ্জ্বলতর জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে এক জন পুরুষ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "বিমলে!" বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা সতীশচন্দ্র আসিয়াছেন।

যে পুরুষ কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে না; কিন্তু আকার দেখিলে সহসা

ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ বলিয়া ভ্রম হয়। মস্তকের অধিকাংশ কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, শরীরের চর্ম্ম শিথিল, সর্ব্ব অঙ্গ ক্ষীণ, তথাপি চক্ষুর্দ্বয় জ্যোতির্ম্ময় ও মুখমণ্ডলে চিন্তাদেবী সততই অধিষ্ঠান করিতেছেন। ধীর আচরণ, ধীর গমনাগমন, ধীর অথচ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসঞ্চালন। নানারূপ বহুদূরদর্শিনী বহুদূরব্যাপীনী কল্পনাতে তাঁহার জীবন ও অন্তঃকরণ চিরকালই পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে ঈষৎ হাস্য সহকারে ডাকিলেন, "বিমলে!"

বিমলাও পিতাকে দেখিয়া আপন গভীর ভাবনা কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইলেন। বদনমণ্ডলে গম্ভীর ভাব ক্রমে অপনীত হইয়া পবিত্র পিতৃস্নেহের আবির্ভাব হইল। পিতা কক্ষে আসিয়াছেন, অনবধানতা বশতঃ এতক্ষণ দেখিতে পান নাই, মনে হইয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। সতীশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "বিমলে! এত কি দুঃখ হইয়াছে যে, মৌনভাবে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছ?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "আপনি কল্য দুর্গ ত্যাগ করিবেন,—কত দিন আপনাকে দেখিতে পাইব না, কত দিন এই প্রকাণ্ড দুর্গ শূন্য থাকিবে;—সে চিন্তায় আমার মন অস্থির হইয়াছে,—আমি আপন মন শান্ত করিতে পরিতেছি না।"

পিতা উত্তর করিলেন, "সে কি বিমলা, কেন মিথ্যা ভাবনা করিতেছ? আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব; আমি কি তোমাকে ছাড়িয়া অধিক দিন থাকিতে পারি?"

বিমলা। "পিতা, আপনি যে আমাকে অতিশয় স্নেহ

করেন তাহা জানি,—পিতা কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে পারে না।”

সতী। “তবে চিন্তা করিতেছ কেন? আমি ত প্রতি বৎসরই একবার রাজধানী যাইয়া থাকি, এবার তোমার বিশেষ চিন্তা কেন?”

বিম। “প্রতি বৎসর আমার এ প্রকার ভাবনা হয় না; এবার সহসা হৃদয়ে ভয় হইয়াছে, কেন জানি না। পিতা, আপনি গৃহে থাকুন, কোথাও যাইবেন না।”

শেষ কথা গুলি অতি অর্দ্ধস্ফুট মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইল—শুনিয়া সতীশচন্দ্রের হৃদয়ও যেন আহত ও কিঞ্চিৎ ভীত হইল। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন—

“বিমলা কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ, আমাকে যাই-তেই হইবে, যাইবার সময় রোদন করিও না।”

বিমলা উত্তর করিলেন, “পিতা, মিথ্যা ভয় নহে, কল্য রজনীযোগে আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, বোধ হইল যেন স্বর্গীয় মাতা দেখা দিলেন,—সাশ্রুলোচনে যেন অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ‘পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই’ বলিয়াই সহসা অন্তর্হিত হইলেন। এখনও বোধ হইতেছে, তাঁহার শুষ্ক মুখখানি,—তাঁহার অশ্রু-পূর্ণ লোচন দুইটী দেখিতে পাইতেছি। কি পাপ করি-য়াছি, বলিতে পারি না; কি পাপে স্নেহময়ী মাতাকে হারাইলাম, জানি না;—আবার কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত সমাগত, ভগবান্‌ই জানেন। পিতা, ক্ষমা করুন। আমার ভাবনা হইতেছে, আপনি প্রস্থান করিলে আর এ আলয়ে প্রত্যাগমন করিবেন না।”

এই বলিয়া বিমলা বাষ্পাকুলিত লোচনে পিতার নিকট যাইয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন বদনমণ্ডল লুকাই-

লেন। বিমলার যদি স্থিরভাব থাকিত, দেখিতে পাইতেন যে, পিতারও মুখমণ্ডল সহসা বিকৃতি ধারণ করিয়াছিল। স্বপ্নকথা শুনিয়া সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন,—যেন ভয়াবহ কোন পূর্ব্বকথা হৃদয়ে সহসা জাগরিত হইল, যেন কোন গূঢ় পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই ক্ষণেই আরম্ভ হইল। যখন বিমলা পিতার হৃদয়ে মুখ রাখিয়া রোদন করিতেছিলেন, পিতার সান্ত্বনা করিবার আর ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই সতীশচন্দ্র আপন চিত্ত সংযম করিয়া স্থিরভাবে বলিতে লাগিলেন—

"বিমলা, এ সকলই তোমার মিথ্যা ভয়। দিবাযোগে তুমি কেবল মিথ্যা চিন্তা কর, তাহাতেই রজনীযোগে সেই প্রকার ভয়ের স্বপ্ন দেখ। আমি দেখিয়াছি, গত কয়েক দিন অবধি তুমি কেবলই চিন্তামগ্ন রহিয়াছ, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, সে মহাচিন্তার কারণ কি?"

বিমলা ধীর ভাবে উত্তর করিলেন, "পিতা, আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি অবশ্যই তাহার উত্তর করিব, আপনার নিকট লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই। আপনিই সে মহাচিন্তার কারণ। অদ্য প্রায় এক মাস হইতে আপনাকে কোন গভীর দুঃখে বা চিন্তায় মগ্ন দেখিতেছি, দিন দিন সেই চিন্তা গাঢ়তর হইতেছে। আপনার আহারের সময় খাদ্যদ্রব্যে মন থাকে না, রজনীকালে আপনার নিদ্রা হয় না, যদি নিদ্রা হয়, সে কুস্বপ্ন-পরিপূর্ণ। আমি কতবার দিবাযোগে লুকাইয়া আপনার কক্ষে গিয়াছি; যতবার যাই, দেখি আপনি সেই চিন্তায় মগ্ন। নিশিযোগে আমি কতবার আপনার শয়নঘরে গিয়াছি, যখন যাই দেখি কোন কুস্বপ্নে আপনার ললাট কুঞ্চিত ও সমস্ত বদন

বিকৃত হইয়া রহিয়াছে। কি ঘোর চিন্তায় আপনাকে এ প্রকার যাতনা দিতেছে? সামান্য জমীদার, সামান্য কৃষকও দৈনিক শ্রমের পর রজনীতে বিশ্রাম লাভ করে, বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের কি সে বিশ্রামে অধিকার নাই?"

বিমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন, দেখিলেন, পিতা স্থিরভাবে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিতেছেন,—পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"গত একমাস অবধি আপনার নিকট এত চর আসিতেছে কেন? চর এত গুপ্তভাবে আসিয়া এবং গুপ্তভাবে চলিয়া যায় কেন? দিবারাত্রি আপনিই বা কোন্ গুপ্ত পরামর্শে ব্যস্ত আছেন? বঙ্গদেশের দেওয়ানের কার্য্যের ভার অতি গুরুতর সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের সুশাসন ও প্রজার মঙ্গল যে কার্য্যের উদ্দেশ্য, সে কার্য্য ও সে পরামর্শ রজনী দ্বিপ্রহরের সময় গৃহের কবাট রুদ্ধ করিয়া কতকগুলি নিভৃত চরের সহিত সিদ্ধ হয় কেন? বালিকার এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নহে, যদি আমি অপরাধ করিয়া থাকি, পিতা মার্জ্জনা করুন; কিন্তু আপনি বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, কপটাচারী খলস্বভাব সর্পেরই বক্র গতি; উদারচিত্ত মনুষ্যের গতি সরল। যাঁহার চরিত্র সরল, যাঁহার উদ্দেশ্য সরল, তাঁহার গতি বক্র হইবে কেন? পিতা, বালিকার কথায় অবধান করুন, কপট লোকের পরামর্শ ত্যাগ করুন, ধর্ম্মের পথ,—সরল পথ অবলম্বন করুন, তাহা হইলে কাহাকেও ভয় থাকিবে না, কোন চিন্তা থাকিবে না। পাপপথে সর্ব্বদাই ভয়, ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক।"

বলিতে বলিতে বিমলার উদার ললাট ও বদনমণ্ডল

অধিকতর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন-যুগল হইতে উজ্জ্বলতর আভা বহির্গত হইতে লাগিল। বিমলা অতিশয় পিতৃবৎসলা কন্যা, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নৈসর্গিক গৌরব ও ধর্ম্মবল বিরাজ করিত। সেই গৌরবের আবির্ভাব হইলে জনাকীর্ণ রাজসভায় যিনি শত শত বার বাকপটুতার জন্য প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, সপ্তদশ বর্ষীয়া বালিকার কথায় তিনি নিরুত্তর হইতেন।

"পাপ পথে সর্ব্বদাই ভয়, সরল ধর্ম্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক" এই কথা অর্দ্ধস্ফুট বচনে উচ্চারণ করিতে করিতে সতীশচন্দ্র সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাপিষ্ঠে পাপিষ্ঠে।

Try what repentance can: What can it not?
Yet what can it when one cannot repent?
O wretched state! O bosom black as death!
O limed soul that struggling to be free,
Art more engaged. Help angels, make assay!
Bow stubborn knees! and hearts with strings of steel,
Be soft as sinews of the new born babe,
All may be well.

Shakespeare.

সতীশচন্দ্র বাহিরে আপন কক্ষে যাইয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "শকুনিকে ডাকিয়া দে," ভৃত্য অগ্রে প্রভুর সেবা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সতীশচন্দ্র

তাহাকে মুষ্টি প্রহার করিয়া বলিলেন, "আগে শকুনিকে ডাক," ভৃত্য বেগে প্রস্থান করিল।

বাহিরের কক্ষ অতি প্রশস্ত ও অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহতল অতি সুচারু চিত্রশোভিতবস্ত্রে মণ্ডিত; প্রতি দ্বারে, প্রতি বাতায়নে সুগন্ধ পুষ্পমালা লম্বিত রহিয়াছে; স্থানে স্থানে স্তূপাকারে পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে; সম্মুখে সুগন্ধ তৈলপূর্ণ দীপ জ্বলিতেছে; দীপের চতুষ্পার্শ্বে আবার পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে। সতীশচন্দ্রের উপবেশন স্থানমহার্হরক্তবস্ত্রে মণ্ডিত,—সেই সুন্দর কক্ষে, সেই মহার্হ আসনে উপবেশন করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত, মহাধনসম্পন্ন রাজাধিরাজ দেওয়ান সতীশচন্দ্র আজি বিষন্নবদন কেন? পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

পাঠক মহাশয় যদি "বিষয়ী" লোক হয়েন, বলুন দেখি, লোকে আপনাকে যেরূপ সুখী মনে করে, আপনি কি যথার্থই সেইরূপ সুখভোগ করেন? বলুন দেখি, জগৎ সংসারে সুখবর্দ্ধন করিয়া উদারচরিত্র লোকে যেরূপ সুখসম্ভোগ করেন, আপনার ধনসঞ্চয়ে কি সেই প্রকার নির্ম্মল সুখ লাভ হয়? প্রেমপাত্রের মুখাবলোকন করিয়া প্রেমিকের হৃদয় যেরূপ উল্লাসিত হয়, প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিলে কবির অন্তঃকরণ যেরূপ আনন্দিত হয়, উচ্চপদ লাভে কি আপনার মন সেইরূপ উল্লাস প্রাপ্ত হয়?—কাব্যরসে বা বান্ধব-সদালাপে অন্তঃকরণ যেরূপ প্রফুল্ল হয়, কেবল ধনসঞ্চয়ে হৃদয়ের কি সেরূপ জন্মে? যদি না হয়, তবে দিনে দিনে, সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে কেবল ধনসঞ্চয়ে কেন বিব্রত রহিয়াছেন?—তদপেক্ষা মহত্তর সুখে কেন একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন? আর যদি

হয়, তবে বলুন, আমরাও "বিষয়ী" লোক হইবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

পাঠক মহাশয় যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড় লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন, যদি কখন অর্থের আবাসস্থানকে সুখের আবাসস্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি,—লোভ দূর করি।

সেই কক্ষে একাকী বসিয়া কিছুক্ষণ সতীশচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সতীশচন্দ্রের হৃদয় পাপে কলুষিত, পাপান্ধকারে আবৃত, সেই পাপ রাশির মধ্যে একটী মাত্র পুণ্য ছিল,—বিমলার প্রতি নির্ম্মল অপত্যস্নেহ সূক্ষ্ম আলোক রেখার ন্যায় সেই পাপান্ধকারের মধ্যে দেখা যাইত। কন্যাকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কন্যাকে অতি স্নেহের সহিত লালনপালন করিতেন, স্ত্রীবিয়োগের পর অবধি কন্যার সহিত অনেক সময়ে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন,—বিষয় কর্ম্মেরকথাও কন্যার সহিত আলোচনা করিতেন, এই জন্যই কন্যাও কখন কখন পিতাকে বন্ধুর মত উপদেশ দিতে সাহস করিতেন। বিমলাও অতিশয় স্নেহবতী কন্যা, পিতার সুখবর্দ্ধন ভিন্ন তাঁহার আর কোন লালসা ছিল না। কিন্তু নিতান্ত স্নেহবতী হইয়াও বিমলা উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা ও মানিনী—পিতাকে কপটাচারী দেখিলে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইতেন। আলোকের উদয়ে অন্ধ-

কার লীন হয়, সত্যের ও সরলতার সম্মুখে পাপ ও কপটতা স্বভাবতঃ ভীত হয়, সরলা বিমলার সম্মুখে সতীশচন্দ্র নিরুত্তর হইতেন। সতীশচন্দ্রের চরিত্র কতদূর পাপে কলুষিত, তাহা বিমলা জানিতেন না; ভক্তিভাজন পিতার চরিত্রে যে অধিক পাপ আছে, তাহা বিমলার নির্ম্মল অন্তঃকরণে একবারও স্থান পায় নাই; তথাপি পিতার আচার ব্যবহার দেখিয়া সম্প্রতি বিমলার চিত্ত সন্দেহদোলায় দুলিত হইয়াছিল ও সেই সন্দেহ তাঁহার যার পর নাই যাতনার কারণ হইয়াছিল।

কখন কখন একটী ঘটনাতে, বা একটী কথাতে বা একটী সঙ্গীতে সহসা আমাদের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া যায়, সাগরতরঙ্গের ন্যায় অনন্ত চিন্তালহরীতে সহসা হৃদয় প্লাবিত হয়; বহুকালের বিস্মৃত কথা সহসা স্মরণপথে উদয় হয়। স্নেহবতী কন্যার সস্নেহ তিরস্কার বচনে যেন সেই প্রকার হইল। সতীশচন্দ্রের হৃদয়কেন্দ্র ব্যথিত হইল, সহস্র চিন্তায় প্লাবিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল। শৈশবকালে যে খেলা করিয়াছিলেন, বাল্যকালে যে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। যে বিদ্যালাভ তাঁহার পক্ষে বিষময় ফল ধারণ করিয়াছিল, সেই বিদ্যালাভের আরম্ভ কথা মনে জাগরিত হইতে লাগিল। সমবয়স্কদিগের সহিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, অধ্যয়নের পর সেই বয়স্যদিগের সহিত নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্তে ক্রীড়া রহস্য করিতেন। আজি তিনি বঙ্গদেশের একজন প্রধান লোক,—লক্ষ লক্ষ মুদ্রার অধিপতি। সেই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিলে কি এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই নিষ্পাপ নিশ্চিন্ত চিত্ত ফিরিয়া পাওয়া যায়?

বাল্যকাল অতীত হইল, যৌবনকাল সমাগত। সেই যৌবনকালে তাঁহার স্মৃতিপথে কি গভীর পাপরেখা অঙ্কিত হইয়াছে! বিদ্যাদর্প, তাহার পর ধনদর্প, তাহার পর প্রবল দুর্দ্ধর্ষ উচ্চাভিলাষ! উচ্চাভিলাষ মনুষ্যের গৌরবের কারণ হয়, অনিষ্টেরও কারণ হয়, তাঁহার পক্ষে সেই কাল উচ্চাভিলাষ কি ভয়ানক বিষময় ফল ধারণ করিয়াছে।

তাহার পর সেই প্রজারঞ্জন মহানুভব বীরপুরুষ রাজা সমরসিংহের কথা সতীশচন্দ্রের পামর হৃদয়ে উদিত হইল। যে মহাত্মা বঙ্গদেশের গৌরবস্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, প্রজাদিগের পিতাস্বরূপ ছিলেন, জমীদার-দিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বরূপ ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রাণ সংহার করিবার জন্য যত্নবান হইয়াছিলেন। সে যত্ন বিফল হইল, মহানুভব বীরপুরুষ পামরকে মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু অচিরাৎ আপন শোণিতে সেই মহৎ পুণ্য কর্ম্মের প্রতিফল পাইলেন। সমরসিংহের শোণিতা-প্লুত ছিন্নশির দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল, সতীশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন, যেন সেই শোণিতাপ্লুত ছিন্নমস্তক বিকৃতি ধারণ পুরঃসর তাঁহার দিকে তীব্রদৃষ্টি করিতেছে, যেন বলিতেছে "পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিলম্ব নাই।" সতীশচন্দ্র পুনরায় শিহরিয়া উঠিলেন, সম্মুখে আর চাহিতে পারিলেন না, দীপ নির্ব্বাণ করিলেন। রে মূর্খ! স্মৃতিদীপ অত শীঘ্র নির্ব্বাণ হয় না। ঘোর অন্ধকারে বসিয়া সতীশচন্দ্র কি চিন্তা করিতেছেন? কাহার সাধ্য সে চিন্তা অনুভব করে। সহস্র-বৃশ্চিক দংশনাপেক্ষা সে চিন্তা ক্লেশদায়িনী। যাতনায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এ পাপের কি প্রায়-শ্চিত্ত নাই? যদি থাকে, হৃদয়ের শোণিত দিয়াও তাহা

করিব। ভগবন্ সহায় হও, এখনও বালিকার কথা শুনিয়া কার্য্য করিব, এখনও ধর্ম্মপথে ফিরিতে চেষ্টা করিব। সত্য কথা স্বীকার করিব, পুনরায় ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি ক্ষমা না পাই, আমার অকিঞ্চিৎকর শোণিত দিয়া সমরসিংহের রক্তপ্রবাহ বর্দ্ধন করিব।”

পরক্ষণেই শকুনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, “একি? অন্ধকারে একাকী বসিয়া আছেন কেন?”

সতীশচন্দ্র অতিশয় গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, “আলোক সহ্য করিতে পারি না, হৃদয়ে দুর্ভেদ্য অন্ধকার ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমার জীবনালোকও শীঘ্র অনন্ত অন্ধকারে লীন হইবে, আমার লীলাখেলা সাঙ্গপ্রায়।”

শকুনি এ কথার উত্তর করিতে পারিলেন না, ভৃত্যকে আলোক আনিতে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য শীঘ্র আলোক আনিয়া পুনরায় কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “শকুনি! তোমার পরামর্শেই আমি এতদূর কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে কি ফল হইল? আমার পরকাল অনেক দিনই গিয়াছে এক্ষণে ইহকালেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এই পাপরাশিতে, এই বিপদরাশিতে তুমিই আমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ, এক্ষণে আর কি করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন উন্নতিশালী লোকের সর্ব্বনাশ কল্পনা কর; আমিও, এ ঘোর পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তাহাতে প্রবৃত্ত হই।”

শকুনি প্রভুর গম্ভীর স্বর শুনিয়া চমকিত হইলেন। বুঝিলেন, প্রভুর হৃদয়ে সামান্য ক্রোধ ও ক্ষোভের উদ্রেক হয় নাই; দুই চারি কৈতব অশ্রুবিন্দু দেখাইয়া শকুনি উত্তর করিলেন।

"প্রভুর গৌরবকালে তাঁহারই স্নেহভাজন হওয়া ভিন্ন আমার অন্য অভিলাষ ছিল না,—যদি সর্ব্বনাশ যথার্থই উপস্থিত হয়, প্রভুর সর্ব্বনাশের ভাগী হওয়া ভিন্ন, আমার দ্বিতীয় অভিলাষ নাই।"

সতী। "শকুনি! তোমার কথা অতি মিষ্ট,—বিধাতা এমন বিষপাত্র ক্ষীর দ্বারা আবৃত করিয়াছেন?"

শকু। "আমি পাপিষ্ঠ বটে, তা না হইলে প্রভু-ভক্তির এই ফল ফলিবে কেন?" এই বলিয়া শকুনি আর দুই চারিটী অশ্রুবিন্দু বাহির করিলেন। সতীশ-চন্দ্র দেখিয়া কিছু মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন—

"তুমি আমার উন্নতিচেষ্টা কর, তাহা আমি জানি, কিন্তু পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ। শকুনি! সে পথ ভিন্ন কি আর উন্নতির পথ ছিল না?"

শকুনি দেখিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই, কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুভক্তি যদি পাপ হয়, তবে আমি পাপিষ্ঠ বটে, তাহা ভিন্ন পাপ কি, আমি জানি না।"

সতী। "জান না,—বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহকে বিনাশ করিবার পরামর্শ কে দেয়?"

শকু। "রাজাজ্ঞায় তাঁহার দণ্ড হইয়াছে।

সতী। "ভাল, তাঁহার জমীদারী এক্ষণে কে পাই-য়াছে?"

শকু। "সুবাদার স্নেহবশতঃ যাহাকে যে দ্রব্য দান করেন, তাহা সর্ব্বদাই শিরোধার্য্য।"

সতী। "শকুনি! আর আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। অদ্য আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে ও তদ্দারা স্বীয় হৃদয়ে এত অন্ধকার, এত পাপ দেখি-তেছি যে, সে দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারি না। অদ্য

বালিকার নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি।” এই বলিয়া সতীশচন্দ্র বিমলার সহিত কথোপকথন সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিলেন, অবশেষে বলিলেন, “পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্, সেই বিপদ্ আমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে।”

শকুনি উত্তর করিলেন, “বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ানের কি বালিকার কথায় ভীত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ?”

সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, “বালিকা যদি সত্য কথা কহে, তবে সে কথা বালিকামুখনিঃসৃত বলিয়া পরিহার্য্য নহে। পাপপথে সর্ব্বদাই বিপদ্, তাহা আমি এত-দিনে জানিলাম।”

শকু। “যদি আজ্ঞা করেন, তবে বলি, আপনার বিপদ্ কি, আমি দেখিতে পাইতেছি না।”

সতী। “আজি ছয় বৎসর হইল, যখন রাজা টোডর-মল্ল প্রথমবার বঙ্গ ও বিহারদেশ জয় করিয়া কটকের নিকট দায়ুদখাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া দিল্লী প্রত্যা-গমন করেন, তাহার অনতিবিলম্বে পুণ্যাত্মা সমরসিংহ আমা কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; সে কার্য্যে তুমিই পরামর্শ দিয়াছিলে।”

শকু। “দিল্লীশ্বরের অধীনস্থ বঙ্গ ও বিহারদেশের সেনাপতি মনাইম খাঁর আজ্ঞায় সমরসিংহের দণ্ড হয়।”

সতী। “সত্য, কিন্তু সে আমাদেরই পাপ ষড়যন্ত্রে। তাহার দুই বৎসর পর, যখন রাজা টোডরমল্ল রাজ-মহলের যুদ্ধে দায়ুদখাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করেন, তখন সমরসিংহের মৃত্যুর বিষয়ে কি মিথ্যা কহিয়া পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম, বোধ হয় বিস্মৃত হও নাই।”

শকু। “তাহার পর।”

সতী। “তাহার পর বঙ্গদেশে দুইজন সুবাদার হইয়া-

ছেন. তন্মধ্যে হোসেনকুলীখাঁর নিকট অনেক যত্নে সত্য গোপন ছিল,—মজফ্‌ফর খাঁ আপন কার্য্যেই ব্যস্ত, এই জন্যই এতদিন পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে টোডরমল্ল পুনরায় সেনাপতি ও সুবাদার হইয়া মুঙ্গেরে আসিয়াছেন, আর নিস্তার নাই।"

শকু। "যে কৌশলে এতদিন কথা গুপ্ত ছিল, সে কৌশল এক্ষণে ব্যর্থ হইবে কেন?"

সতী। "যে কৌশলে হোসেনকুলী ও মজফ্‌ফর পরাস্ত হইয়াছিলেন, দূরদর্শী টোডরমল্ল তাহাতে পরাস্ত হইবেন না,—তুমি রাজা টোডরমল্লকে জান না।"

শকু। "কিন্তু এই দূরদর্শী রাজাই একবার এই কৌশলে পরাস্ত হইয়াছিলেন।"

সতী। "সত্য, কিন্তু সে বার দুই এক মাসের জন্য আসিয়াছিলেন,—এবার সুবাদার হইয়া আসিয়াছেন, অনেক দিন বাস করিবেন। শকুনি! আমাকে নিবারণ করিও না, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব,—তিনি একবার আমাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, পুনরায় ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। তাহার পর আমি আর এ পাপ সংসারে থাকিব না—যোগী হইয়া এই ঘোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিব।"

শকু। "তাহা হইলে আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিতে হইবে না। প্রিয়সুহৃদ্ সমরসিংহের হত্যাকারককে রাজা টোডরমল্ল অতি শীঘ্রই জল্লাদ-হস্তে সংসার ত্যাগ করাইবেন।"

এই ব্যঙ্গ বাক্যে সতীশচন্দ্র মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, শকুনির কথাই সত্য! গুপ্তকথা অপ্রকাশ থাকার

সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রকাশ হইলে প্রাণরক্ষার কিছুই সম্ভাবনা নাই। অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"শকুনি! তুমি আমা অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি মূর্ত্তিমান্ পাপ হও, তথাপি তোমার পরামর্শ অবলম্বন ভিন্ন আমার আর গতি নাই। তোমার তর্ক অলঙ্ঘনীয়।"

শকু। "আপনার সহিত তর্ক করা আমার সম্ভবে না। কিন্তু কাহার মাথার উপর মাথা আছে যে, বঙ্গদেশের দেওয়ানের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করিতে যাইবে? প্রভু! আমার কথা অবধারণা করুন, যে কথা ছয় বৎসর গুপ্ত আছে, তাহা প্রকাশিত হইবে না। আমি আপনার নিকট পণ করিতেছি, যদি এ কথা না গুপ্ত রাখিতে পারি, তবে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।"

আশার প্রভাব অতি চমৎকার! যে আশা মনুষ্যকে কত সুখ ও সান্ত্বনা প্রদান করে;—সেই আশাই আবার কত দুঃখের কারণ হয়। দুঃখের সময় আশা কুহকিনী-রূপে আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করে, সুখের সময় সেই আশা আবার কত দুঃখের কারণ হয়। মানব-হৃদয়ও অতি চমৎকার, আশার কুহকে কতই খেলা করে। বিপদের সময়, পীড়ার সময়, দুঃখের সময় হৃদয়ে ধর্ম্মভয় প্রবল হয়,—বিপদের শান্তি হইলে, পীড়া আরোগ্য হইলে, দুঃখের অবসান হইলে ধর্ম্ম-ভয়ও ক্রমে ক্রমে দূর হয়। ইতিপূর্ব্বে সতীশচন্দ্র বিপদা-শঙ্কা করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা ও ধর্ম্মভয় মনে জাগরিত হইয়াছিল। ক্রমে কুহকিনী আশা কাণে কাণে বলিতে লাগিল, "ভয় কি? বিপদ কোথায়? মিথ্যা ভাবনা কেন?" সতীশচন্দ্রও সেই

কুহকে মুগ্ধ হইলেন, ভাবিলেন, বিপদ্ না আসিলেও না আসিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে বিপদভয় অন্তর্হিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভয়ও চলিয়া গেল। মানবহৃদয়ে বিপদভয় যত প্রবল, ধর্ম্মভয় যদি সেইরূপ প্রবল হইত, তাহা হইলে কি পৃথিবীতে এতাদৃশ দুঃখ থাকিত ?

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সতীশচন্দ্র বলিলেন, "শকুনি তোমার উপরই আমি নির্ভর করিব। আশু বিপদের কি কোন সম্ভাবনা আছে ?"

শকুনি সময় বুঝিয়া উত্তর করিলেন, "আশু কি বিলম্বে, গুপ্তকথা প্রচারের কোন সম্ভাবনা নাই; আর যদিই বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে, ভবাদৃশ মহাপুরুষের পক্ষে কি বিপদের সময় কাতরতা যুক্তিসিদ্ধ? বঙ্গদেশে আপনার যশ, আপনার সাহস কে না প্রশংসা করে? আপনার ক্ষমতার মত ক্ষমতা কাহার? আপনার গৌরবের মত কাহার গৌরব? আপনার অধিকারের মত কাহার অধিকার? বালিকার বাক্য অবলম্বন করিয়া এ সমস্ত সহসা ত্যাগ করা কি বঙ্গদেশের রাজাধিরাজ দেওয়ান মহাশয়ের পক্ষে উচিত কর্ম্ম? আপনাকে পরামর্শ দিব আমার কি সাধ্য, আপনিই বিবেচনা করুন, আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে, এরূপ পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই।"

সতীশচন্দ্র ঐ কথার কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "যথার্থই কি আমি বাতুল হইয়াছিলাম,—বালিকার কথায় ভীত হইয়াছিলাম!" এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন। শকুনি তাঁহার মুখ দেখিয়া আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হাঁ!

শকুনি শর্ম্মার হাত হইতে এখনই নিস্তার পাইবে? এখন হইয়াছে কি?' প্রকাশ্যে বলিলেন, "রুদ্রপুরে যে চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সংবাদ শুনিয়াছেন কি?"

সতী। "না, সেই এক বিষয়ে এখনও ভাবনা আছে, সমরসিংহের বিধবা শুনিয়াছি ভয়ানক স্ত্রীলোক, টোডরমল্ল দেশে আসিলে হয়ত সেই একটা কাণ্ড করিয়া বসিবে।"

শকু। "সে ভয় করিবেন না। টোডরমল্ল আসিবার অগ্রেই সমরসিংহের বংশের সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে।"

সতী। "তবে কি আমরা যে চর রুদ্রপুরে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিয়া আনিতে পারিয়াছে?

শকু। "না, এখনও পারে নাই, কিন্তু সে কার্য্য শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে।"

সতী। "পারে নাই কেন?"

শকু। "শুনিলাম, তাহারা দুই এক দিন পূর্ব্বেই সমাচার পাইয়াছিল, সেই পাগলিনী সমাচার দিয়াছিল।"

সতী। "পিশাচী! আমার সকল কর্ম্মেই বাধা দেয়, তাহাকে ধরিয়া আনাইতে পার না?"

শকু। "চেষ্টার ত্রুটি নাই কিন্তু তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাই নাই। বোধ হয়, তাহার যথার্থই পৈশাচিক বল আছে, তাহা না হইলে আমাদিগের সকল গুপ্ত অনুসন্ধান জানিতে পারে কিরূপে, না হইলে একশত চরেও তাহার অনুসন্ধান পাইতেছে না কেন?"

সতী। "তবে এক্ষণে উপায় কি?"

শকু। "চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই সকলেরই মুখ বন্ধ হইবে। আর অধিক রাত্রি নাই, আপনি বিশ্রাম করুন, শকুনি শর্ম্মার মন্ত্রণা হইতে কাহারও নিস্তার নাই।"

এই বলিয়া শকুনি আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় দুই একবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভাবিলেন—"তোমারও নিস্তার নাই।"

সতীশচন্দ্রও শয়নকক্ষে গমন করিলেন। সন্ধ্যাকাল অবধি মনে যে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। উন্নতচরিত্র বিমলার তিরস্কার, আপন হৃদয়ের ভীরুতা, পূর্ব্বকথা স্মরণ, শকুনির সান্ত্বনা, সমরসিংহ, সমরসিংহের বিধবা, পাগলিনী, ইত্যাদি সমস্ত কথা আন্দোলন করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধূর্ত্তে ধূর্ত্তে।

> Curse on his perjured arts! dissembling smooth!
> Are honor, pity, conscience, all exiled? - ..
> Is there no pity, no relenting truth!
>
> *Burns.*

পরদিন প্রাতে দেওয়ানজী মহাসমারোহে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। কন্যার নিকট বিদায় লইবার সময় বিমলা বলিলেন, "পিতা, আপনি চলিলেন, অনুমতি করুন, আমি প্রসিদ্ধ মহেশ্বর-মন্দিরে যাইয়া আপনার মঙ্গলার্থ পূজা দিব। তথায় আমাকে তিন দিন অবস্থিতি করিতে হইবে।" পিতা সম্মত হইলেন, ও অনেক স্নেহগর্ভ বচনে, কন্যার নিকট বিদায় লইলেন। কন্যার চক্ষুজলে বস্ত্র সিক্ত হইল, পিতা চলিয়া যাইবার সময়, সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া বিমলা মনে মনে

বলিতে লাগিলেন, "এই বিপুল সংসারে আপনি ভিন্ন এ হতভাগিনীর আর কেহ নাই, আপনি না থাকিলেও সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। ভগবান্ আপ-নাকে নিরাপদে রাখুন, ধর্ম্মপথে আপনার মতি হউক। আপনার নৈসর্গিক চরিত্র ত উদার ও অকপট, কুক্ষণে শকুনির সহিত মিলন হইয়াছিল।"

শকুনির সহিত বিদায় লইবার সময় শকুনি বলিল, "আপনি অগ্রসর হউন, আমিও সমরসিংহের বিধবাকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া ও অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিয়া আপনার নিকট যাইতেছি।" সতীশচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যাহা উচিত হয় কর, আমি তোমারই তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপর নির্ভর করি।" শকুনি বলিল, "ভৃত্যের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর সম্ভবে, প্রভুর কার্য্য সমাধা করিতে ত্রুটি করিবে না।" সতীশচন্দ্র যখন বহির্গত হইলেন, শকুনি মনে মনে বলিতে লাগিল, "বুদ্ধিখানা তীক্ষ্ণ কি না, হাতে হাতেই টের পাইবে, বড় বিলম্ব নাই।"

শকুনির সহিত সতীশচন্দ্রের আজ আট বৎসর পরিচয়। যখন প্রথমে পরিচয় হইয়াছিল, তখন শকু-নির বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, সতীশচন্দ্রের বয়ঃক্রম চত্বারিংশৎ বর্ষ। শকুনি দেখিতে সুশ্রী ছিল ও অল্প বয়সে অনাথ ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া সতীশচন্দ্রের দ্বারে শরণাপন্ন হইয়াছিল। সতীশচন্দ্র সুকুমার নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন,—সেই দিন অবধি হৃদয়ে কালসর্প ধারণ করিয়াছিলেন।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি শকুনি শীঘ্রই সতীশচন্দ্রের হৃদয় বুঝিয়া-ছিল, সতীশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ লক্ষ্য করিল; সেই ভীষণ অগ্নিতে দিন দিন আহুতি দিতে লাগিল; আহুতি পাইয়া আরও জ্বলিয়া উঠিল; শিখা দিনে

দিনে গগনস্পর্শী হইতে চলিল। এই ঘোর মদে মত্ত হইয়া সতীশচন্দ্র দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান হারাইলেন, একে বারে অন্ধপ্রায় হইলেন।

শকুনি সুযোগ পাইল। অন্ধকে কুটিল পথে লইয়া যাওয়া দুরূহ নহে, সৎপরামর্শ হইতে কুপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিল; প্রভুকে সৎপথ হইতে কুপথে লইয়া চলিল। অবশেষে এমন ঘোর পঙ্কে নিমগ্ন করিল যে, তথা হইতে উদ্ধার হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তখন সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, ক্রমে ক্রমে ভ্রম দেখিতে পাইলেন: কিন্তু তখন পশ্চাৎ তাপ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শকুনির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, প্রভুকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিল।

শকুনিকে আশ্রয় দিবার অনতিবিলম্ব পরেই, সতীশচন্দ্র তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শকুনির বিনীতভাবে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পরামর্শে চমৎকৃত ও প্রীত হইয়াছিলেন। দিন দিন তাহাকে অধিকতর স্নেহ করিতেন, আপনার পুত্র নাই বলিয়া শকুনিকে পুত্রের মত ভাল বাসিতেন। কখন তাহাকে পোষ্য-পুত্র করিবার কামনা করিতেন, কখন বা তাহাকে আপন দুহিতার সহিত বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিতেন। কিন্তু নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিলে মানহানি হইবে, এই ভয়ে শকুনিকে গৃহজামাতা করিতে পারেন নাই। ক্রমে কন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু কুলীনকন্যার বয়ঃক্রম অধিক হইলে ক্ষতি কি? বিশেষ সতীশচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, কন্যার প্রতি স্নেহ দ্বিগুণ হইয়াছিল, কন্যার বিবাহ দিলে গৃহশূন্য হইবে, এই জন্য বিবাহের বিলম্ব

হইতে লাগিল, এই জন্য শকুনিকে জামাতা করিয়া গৃহে রাখিবার সঙ্কল্প হইতে লাগিল।

পরে যখন পাপপঙ্কে পতিত হইয়া সতীশচন্দ্রের চক্ষু উন্মীলিত হইল, তখন এই সঙ্কল্প আবার দূর হইল; পাপ এরূপ ঘৃণার পদার্থ যে, এক জন পাপী অন্য জনকে ভালবাসিতে পারে না, সতীশচন্দ্র শকুনিকে আর ভালবাসিতে পারিলেন না। উন্নতচরিত্রা ধর্ম্ম-পরায়ণা দুহিতাকে, কুটিলস্বভাব, কপটাচারী শকুনির হস্তে অর্পণ করিবেন, এ ভাবনা সতীশচন্দ্র সহ্য করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি পাপিষ্ঠ বটে, কিন্তু পাপেরও সীমা আছে। ধর্ম্মপরায়ণ সমর-সিংহকে হত্যা করিয়াছি, কিন্তু আমার স্নেহের পুত্তলি বিমলাকে নরকে ফেলিতে পারিব না। আমার যাহা হইবার হইয়াছে, বিমলা ধর্ম্মপথে থাকুক।" সতীশচন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতেন, কিন্তু শকুনিকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শকুনি সুবাদারের নিকট একটী কথা জানাইলে সতীশচন্দ্রের শিরশ্ছেদন হইবে, তাহা তিনি জানিতেন, সুতরাং তিনি শকুনির একরূপ হস্তগত হইলেন।

শকুনি যে ঘোর পাপিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। সতীশ-চন্দ্রও পাপিষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পাপের সীমা ছিল,—তাঁহার চরিত্রে দুই একটী সদ্‌গুণও ছিল, তাঁহার হৃদয়ে দুই একটী মহানুভব লক্ষিত হইত। পাপের প্রায়-শ্চিত্ত স্বরূপ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। শকুনির এসমস্ত কিছুই ছিল না, কেবল ঘোর স্বার্থপরতা ও দুর্ভেদ্য কুটিলতা।

সতীশচন্দ্রের মত তাহার দুর্দ্দমনীয় বেগবতী মনো-বৃত্তি একটীও ছিল না; তাহার হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তিই

শান্ত;—সকল প্রবৃত্তিই ঘোর স্বার্থপরতার অনুচারী। সুতরাং তাহার গভীর মন্ত্রণা প্রকাশ বা নষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, কিছুতেই বিচলিত হইত না। ঊর্ণনাভ যেরূপ বৃক্ষপত্রগুলি দেখিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে জাল পাতিত করে, শকুনি সেইরূপ অন্য লোকের মনোবৃত্তির বেগ বুঝিয়া অতি ধীরে ধীরে আপন সূক্ষ্ম জাল বিস্তার করিত। সে মন্ত্রণাজাল এমন সূক্ষ্ম, এমন দুর্লক্ষ্য ও এমন দুর্ভেদ্য যে, কাহার সাধ্য ভেদ করে। প্রেম, বন্ধুত্ব, দয়া, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি যে সকল সুকুমার মনোবৃত্তি দ্বারা জগৎ বদ্ধ ও মানবজাতি একীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শকুনি সে সকল হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। যশে অভিরুচি, উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি যে সকল দুর্দ্দম মনোবৃত্তি অনেককে বিচলিত করে, তাহা হইতেও শকুনি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিল। সুতরাং আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও গূঢ় মন্ত্রণার দ্বারা আপন স্বার্থ-সাধনে কখনও নিষ্ফল হইত না।

সতীশচন্দ্র শকুনিকে পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু স্বার্থপর বলিয়া জানিতেন না। মনে ভাবিতেন, শকুনি যতই পাপ মন্ত্রণা করুক না কেন, কেবল আমারই উন্নতিসাধন উহার উদ্দেশ্য। এই মহাভ্রান্তি বশতঃই সতীশচন্দ্র এখনও শকুনিকে অল্প পরিমাণে ভাল বাসিতেন, এ মহাভ্রান্তি তাঁহার শীঘ্রই দূর হইবে।

শকুনি সতীশচন্দ্রকে বলিয়াছিল যে, চরেরা সমরসিংহের বিধবাকে ধরিতে অক্ষম হইয়াছে,—সেটী মিথ্যাকথা। শকুনির যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,—যেরূপ অসঙ্খ্য চর, মহাশ্বেতাকে ধরা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য কার্য্য নহে; সে কেবল সতীশচন্দ্রের সহিত শকুনিকে মুঙ্গেরে না যাইতে হয়, এই জন্য। তবে যে এত দিন তাঁহাকে

ধরা হয় নাই তাহা শকুনির বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালের এক অংশ। সে মন্ত্রণাজাল ভেদ করি, আমাদের কি সাধ্য? পাঠক মহাশয়! চলুন, শকুনি যথায় বসিয়া চিন্তা করিতেছে, তথায় যাইয়া দেখা যাউক, যদি কিছু জানা যায়।

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের প্রশস্ত কক্ষে শকুনি একাকী পদচারণ করিতেছে, চারিদিকে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র অবলোকন করিতেছে, দুর্গপদসঞ্চারিণী কল্লোলিনী যমুনার কল কল শব্দ শ্রবণ করিতেছে,—মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত দুর্গের শুদ্ধান্তঃপুর দিকে অবলোকন করিতেছে। তাহার মুখমণ্ডলে আনন্দের লক্ষণ, স্বার্থসাধন হইলে স্বার্থপর লোকের যেরূপ আনন্দ ও উল্লাস হয়, সেইরূপ আনন্দের লক্ষণ। মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতেছে।—

"এই সুবিস্তীর্ণ জমীদারি, এই প্রশস্ত দুর্গ, ঐ অন্তঃপুরবাসিনী সপ্তদশ বর্ষীয়া সুন্দরী, শীঘ্রই নব স্বামী গ্রহণ করিবে, সমরসিংহের প্রজাগণ, সতীশচন্দ্রের প্রজাগণ, শীঘ্রই শকুনির নাম উচ্চারণ করিবে; কল্লোলিনী যমুনা শীঘ্রই শকুনির গৌরবগীত গান করিবে। আর তুমি বিমলে! তুমি আমাকে ঘৃণা কর জানি, কিন্তু ঘৃণার দিন শেষ হইল; তোমার ইচ্ছা থাকুক আর নাই থাকুক, আমাকে স্বামী বলিয়া আলিঙ্গন করিতেই হইবে; তথাপি যদি ঘৃণা কর, এই পতঙ্গের মত তোমাকে পদে দলিত করিব; এই দলিত মৃতপতঙ্গের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করিব। প্রেমের জন্য বিবাহ করিতেছি না, প্রেম বালক বালিকার স্বপ্ন মাত্র! তোমার রূপলাবণ্যের জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি না;—আমার নিকট রূপ লাবণ্যের আদর নাই; যদি থাকিত, লক্ষপতির রূপ লাবণ্যের অভাব কি? তবে তোমায় দলিত না করিব

কেন? সতীশচন্দ্র, সাবধান! আজি তোমাকে যম-মন্দিরে প্রেরণ করিলাম;—যেরূপ চর নিযুক্ত করিয়াছি, গুপ্তকথা নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে;—অধিকন্তু শকুনির দোষও তোমার উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহার পর? তাহার পর নিঃসন্তান সতীশচন্দ্র গত হইলে তাহার জামাতা ভিন্ন আর কে উত্তরাধিকারী? তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিরকালই জয় হউক।”

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি দেখিল, অন্তঃপুরে গবাক্ষপার্শ্বে বিমলা এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। পিতা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পিতার গমন-পথ দিকে অনিমেষলোচনে নিরীক্ষণ করিতেছেন। ক্রন্দন করাতে সেই উন্নত প্রশস্ত ললাটের শিরা স্ফীত হইয়াছে; চক্ষুদ্বয় এখনও জলে ঢল ঢল করিতেছে; অধরোষ্ঠ বিস্ফারিত ও কম্পিত, উন্নত বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে; বস্ত্র অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়াছে। বিমলার উন্নত আকৃতি বিষাদে অধিকতর উন্নত দৃষ্ট হইতেছে, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন না,—তাঁহার হৃদয়ের যে গম্ভীর বিষণ্ণ ভাব, তাহা বালিকার উচ্চ রোদনে প্রকাশ পায় না,—নিঃশব্দ, অলক্ষিত, অবারিত অশ্রুজলে কথঞ্চিৎ প্রকাশ পায়, কথঞ্চিৎ শান্ত হয়।

দেখিয়া শকুনি আপন চক্ষে দুই এক বিন্দু জল আনিয়া আপনিও বাহিরের ঘরের গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইল। দুঃখের সীমা নাই, অশ্রুবিন্দুতে বদনমণ্ডল ভাসিয়া যাইতেছে। বিমলা চক্ষু উঠাইয়া দেখিলেন, শকুনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ক্রোধে, ঘৃণায় ভ্রুকুটী করিয়া গবাক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। বিমলার মন হরণ করিবার জন্য শকুনির এই প্রথম উদ্যম, নিষ্ফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

উপাসকে উপাসকে

Enamoured, yet not daring for deep awe
To speak her love :— and watched his nightly sleep,
Sleepless herself, to gaze upon his lips
Parted in slumber, whence the regular breath
Of innocent dreams arose : then when red morn
Made paler the pale moon, to her cold home
Wildered and wan and panting, she returned.

Shelly.

চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে ৫।৬ ক্রোশ দূরে ইচ্ছামতী-তীরে প্রসিদ্ধ মহেশ্বরমন্দির ছিল। সন্ধ্যার সময় বিমলা শিবিকা আরোহণ করিয়া চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই চারি জন প্রাচীনা স্ত্রীলোক ও অনেক সংখ্যক দাস দাসী চলিল। বঙ্গদেশের দেওয়ানজীর একমাত্র দুহিতার যেরূপ সমারোহে যাওয়া উচিত, সেইরূপ সমারোহে বিমলা মহেশ্বরমন্দিরে চলিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল নিভৃতে দুই একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোকের সহিত যাইবেন, কিন্তু পিতার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। মহেশ্বরমন্দির অতি-সমৃদ্ধিশালী। অনেক দূরদেশ হইতে অনেক লোক এই মন্দিরে দিন দিন সমাগত হইত। বৃদ্ধাগণ পুত্রকন্যার কুশল কামনা করিয়া পূজা দিতে আসিতেন, যুবতীগণ পুত্র আকাঙ্ক্ষায় মহেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিতেন; চিররোগীগণ রোগশান্তি কামনায় এই মন্দিরে আসিতেন, যোদ্ধাগণ জয়াকাঙ্ক্ষায়, কৃপণগণ ধনা-কাঙ্ক্ষায়, যুবকগণ বিদ্যাকাঙ্ক্ষায়, নানাবিধ প্রকারের লোক নানাকাঙ্ক্ষায় এই মন্দিরে সমবেত হইত। বহু-

কালের ধন সঞ্চিত হইয়া এই মন্দিরে রাশীকৃত হইয়াছিল, মন্দিরের অট্টালিকাসমূহ দিন দিন দীর্ঘায়ত হইতেছিল। মধ্যে উচ্চ মন্দির, তাহার চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধ উজ্জ্বল উন্নত সৌধমালা শোভা পাইত। আগন্তুকগণ এই সৌধমালায় বাস করিত, তাহা হইতে যে আয় হইত, তাহাও দেবসেবায় অর্পিত হইত।

এই অট্টালিকাশ্রেণী প্রকাণ্ড চক্রাকৃতিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যবর্ত্তী স্থান অতি বিস্তীর্ণ। তাহার মধ্যস্থানে উন্নত মহেশ্বরমন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং মন্দিরের যে কোন দিকে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলে কেবল সৌধমালা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না।

এই চক্রাকৃতি সৌধমালার ভিতর দিয়া মন্দিরাভিমুখে যাইবার জন্য চারিদিকে চারিটী সিংহদ্বার ছিল। শিবিকা কি শকট সেই সিংহদ্বার পর্য্যন্ত আসিতে পারিত, তাহার ভিতর যাইতে পারিত না। সেই সিংহদ্বারের ভিতর প্রবেশ করিলে আর ধনগৌরবজাত কোন প্রকার বিভিন্নতাই স্থান পাইত না। রাজকুমারী ভিখারিণীর সহিত একত্র পদব্রজে সিংহদ্বার হইতে মন্দির পর্য্যন্ত যাইতেন, ভস্ম-বিভূষিত সন্ন্যাসীর সহিত স্বর্ণরৌপ্যালঙ্কৃত মহারাজ একত্রে পথ অতিবাহিত করিতেন। ধর্ম্মের সম্মুখে, মহেশ্বরের সম্মুখে উচ্চ কে নীচ কে? ধনীই বা কি? দরিদ্রই বা কি? সকলই সমান।

যদিচ চারি দিকের সৌধবেষ্টিত মধ্যস্থ ভূমি অতিশয় প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ, তথাপি কখন কখন এত লোকের সমাগম হইত যে, সেই ভূমি লোকে পরিপূর্ণ হইত। তথায় যে কেবল উপাসক আসিত, এমত নহে: নানা প্রকার লোকে নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আসিত।

বালকবালিকার জন্য নানাপ্রকার ক্রীড়াদ্রব্য, যুবক-যুবতীদিগের জন্য নানা প্রকার অলঙ্কার, সকলের জন্যই পরিধেয়, খাদ্য ও অন্যান্য নানারূপ ব্যবহার্য্য-দ্রব্য তথায় দিবানিশি বিক্রয় হইত। ক্রেতৃগণ তথায় দিবা-নিশি ব্যস্ত রহিয়াছে। সে পবিত্র ভূমিতে স্ত্রীলোকে সকলের সম্মুখে আসিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; যুবতীগণ দ্রব্যাদি ক্রয়ার্থ সেই বহুজনসমাকীর্ণ স্থানে বাহির হইতে লজ্জিত হইতেন না; সামাজিক নিয়ম সমুদায় সেই দেবমন্দিরে প্রবল ছিল না।

যখন বিমলা আপন সঙ্গিনীর সহিত মহেশ্বর-মন্দিরে পঁহুছিলেন, তখন রজনী আগত হইয়াছে। বিশ্রাম করিয়া আহারাদি করিতে করিতে রজনী দ্বিপ্রহর হইল। বিমলার সঙ্গিগণ তাঁহাকে সে রাত্রিতে পূজা করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু বিমলার হৃদয় চিন্তা-পরিপূর্ণ। তিনি বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করুন, আমি উপাসনা না করিয়া অদ্য শয়ন করিব না,—যদি করি, নিদ্রা হইবে না," এই বলিয়া বিমলা একাকিনী ধীরে ধীরে মন্দিরাভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রোদয় হইয়াছে, সম্মুখে উচ্চ মহেশ্বর-মন্দির চন্দ্রালোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া গভীর নীল আকাশপটে যেন চিত্রের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। চারি-দিকে উজ্জ্বল শ্বেত সৌধমালা চন্দ্রকিরণে রৌপ্য-মণ্ডিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে,—সেই সৌধমালা হইতে অসংখ্য প্রদীপালোক বহির্গত হইয়া নয়নপথে পতিত হইতেছে। মধ্যস্থ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড প্রায় জনশূন্য হইয়াছে,—যে স্থানে সমস্ত দিন কলরব হইতেছিল, এক্ষণে সেই স্থান প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষপত্রের মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা নয়নরঞ্জন

করিতেছে। শীতল সুগন্ধ সমীরণ রহিয়া রহিয়া বহিতেছে, ও নিকটস্থ উচ্চ ঝাউ বৃক্ষ হইতে সুমধুর, গম্ভীর, সুদূর-সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় ভীমকান্ত রব বাহির করিতেছে। সেই রব ভিন্ন অন্য রব নাই, কেবল স্থানে স্থানে পেচকের শব্দ শুনা যাইতেছে; কেবল কখন কখন দূরস্থ ক্ষেত্র হইতে দুই একটা গাভীর হম্বারব শুনা যাইতেছে;—কেবল দূরস্থ গ্রামবাসীদিগের গীতগান বায়ুপথে আরোহণ করিয়া কখন কখন কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছে। সে সময়ে, সে স্থানে, সেই দূরে গীতগান শুনিতে বড় সুললিত বোধ হয়।

এই নিস্তব্ধ শান্ত পথে যাইতে যাইতে বিমলার হৃদয়ও কিছু শান্ত হইল; চিন্তা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূর হইতে লাগিল; প্রকৃতির গভীর নিস্তব্ধতা দেখিয়া বিমলার হৃদয়েও গভীর ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। সেই দেবায়তনে প্রাতঃকালে দুই একটী করিয়া লোক সমবেত হয়, মধ্যাহ্নে কোলাহলের সীমা থাকে না; সায়ংকালে সেই কলরব ক্রমে হ্রাস হইয়া আইসে; রজনীতে সমস্ত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, শান্ত! বিমলা বিবেচনা করিতে লাগিলেন,—আমাদের জীবনেও এই রূপ। শৈশবে মনের প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; যৌবনে সেই প্রবৃত্তিসমূহের দুর্দ্দান্ত প্রতাপ,—যেন জগৎ সংসারকে গ্রাস করিতে আসিবে; বার্দ্ধক্যে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে; শীঘ্রই শান্ত, নিস্তব্ধ, অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়—বারিবিন্দুর ন্যায় অনন্ত সাগরে লীন হইয়া যায়। তবে এত ধূমধাম কেন?—এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত কৌশল, এত মন্ত্রণা কেন? এত ক্রোধ, এত লোভ, এত অর্থলালসা, এত উচ্চাভিলাষ কেন? কে বলিবে কেন? বিধির নির্ব্বন্ধ কে বুঝিবে?

যে পতঙ্গ মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মসাৎ হইবে, তাহার পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশদিকে ধাবমান্ হওয়া কেন? যে শিশিরবিন্দু মুহূর্ত্ত মধ্যে মনুষ্যপদে দলিত হইবে বা প্রাতঃকালের রবিকিরণ স্পর্শে শুকাইয়া যাইবে, তাহার হীরকখণ্ডের জ্যোতিঃ বিস্তার কেন?

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বিমলা সহসা রজনী দ্বিপ্রহরের ঘণ্টারব শুনিতে পাইলেন, সেই ঘণ্টারব চতুর্দ্দিকস্থ সৌধমালায় প্রতিহত হইয়া দশ গুণ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া বায়ুমার্গে সঞ্চরণ করিতে লাগিল,—নিস্তব্ধ-নৈশ গগণে আরোহণ করিয়া সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ঘণ্টারব শেষ না হইতে হইতে দ্বিপ্রহরের পূজা আরম্ভ হইল। সপ্তস্বরে মিলিত হইয়া মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা গীত হইতে লাগিল;—কাদম্বিনীর গম্ভীর নির্ঘোষবৎ সেই গীত কখন মন্দীভূত, কখন সতেজে উচ্চারিত হইতে লাগিল; উপাসক-দিগের মন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। বিমলা মন্দিরের দিকে দৃষ্টি করিলেন, মন্দিরের উচ্চ চূড়া যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে,—বিমলার হৃদয়ও আকাশের দিকে ধাবমান্ হইল। যে গান গীত হইতেছিল, বিমলা সপ্তস্বরে সেই গীতের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহার হৃদয় পবিত্র প্রেমে ও উল্লাসে প্লাবিত হইতে লাগিল। সেই পবিত্র প্রেম ও উল্লাসই যথার্থ উপাসনা। উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলে উপাসনা হয় না,—প্রকৃতির শোভা দেখিয়া, বা বিশুদ্ধ পবিত্র চিন্তায় মগ্ন হইয়া যদি হৃদয় পবিত্র প্রেম ও উল্লাসে প্লাবিত হয়, তাহাকেই হৃদয়ের উপাসনা বলে,—যদি তাহাতে হৃদয় শান্ত হয়, তাহাকেই হৃদয়ের শান্তি কহে।

বিমলা দ্রুতবেগে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলেন, এক দিকে গায়ক ও বাদ্যকর বসিয়া রহিয়াছে,—তাহারাই গীত আরম্ভ করিয়াছিল। যথার্থ উপাসকের হৃদয় সে গীতের যে অর্থ ও মহিমা গ্রহণ করে, যাহারা গাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে কয় জন সে অর্থ বুঝিতে পারে? অন্য এক দিকে দেবদাসীগণ নৃত্য করিতেছে,—পূর্ণযৌবনসম্পন্না রূপলাবণ্যবিভূষিতা দেবদাসীগণ তালে তালে নৃত্য করিতেছে। সেই পবিত্র দেবমন্দিরের দেবদাসীদিগের কয় জনের হৃদয় পবিত্র? বিমলা এ সকল পশ্চাতে রাখিয়া পূজাস্থানে গমন করিলেন।

মহাদেবের প্রতিমার নিকটেই পূজাস্থান। তথায়ই উপাসকগণ সমবেত হন। যখন বিমলা আসিলেন, তখন আর অধিক উপাসক ছিলেন না, প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছিলেন। যাঁহারা ছিলেন, পুজকগণ তাঁহাদিগের কাহাকে কাহাকেও পূজা করাইয়া দিতেছেন। দেবালয়ের মহন্ত চন্দ্রশেখর সে সময়ে নিকটস্থ বনাশ্রম গ্রামে ছিলেন। বিমলা পূজায় রত হইলেন।

প্রায় এক প্রহরকাল পূজা করিতে লাগিলেন। মুদিত নয়নে, নিস্পন্দ শরীরে বিমলা পূজা করিতে লাগিলেন। হৃদয়ে যে পবিত্র কামনা উদয় হইতেছিল, বিমলার বদনমণ্ডলে তদনুরূপ পবিত্র ভাব অঙ্কিত হইতে লাগিল। বিমলার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, বন্ধু কেহ নাই, পিতাই একমাত্র ভক্তির আধার, পিতাই স্নেহের পাত্র, পিতাই পরম বন্ধু, পিতাই পূজনীয় দেবতা। বিমলার অপার স্নেহস্রোত, অপরিসীম ভক্তিস্রোত, পবিত্র প্রেমস্রোত, অনির্ব্বচনীয় শ্রদ্ধাস্রোত সেই একমাত্র আধারাভিমুখে ধাবমান হইল। পিতার

দুঃখেই দুঃখ, পিতার আনন্দেই আনন্দ, পিতার বিপদে চিন্তা, পিতার সম্পদে ভরসা,—বিমলা পিতার জীবনেই জীবন ধারণ করিতেন। সেই পিতার মঙ্গলার্থ প্রার্থনা করিতে করিতে বিমলার হৃদয়ের দ্বার যে উদ্ঘাটিত হইবে তাহাতে বিস্ময় কি? সেই পিতার মঙ্গলার্থ পূজা করিতে করিতে যে বিমলার হৃদয়ের নিভৃত কন্দর পর্য্যন্ত ভক্তিরসে প্লাবিত হইবে, তাহাতে সংশয় কি? এক প্রহর কাল বিমলা উপাসনা করিলেন। উপাসনান্তে যখন বিমলা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান্ হইলেন, তখন তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য ও শান্ত।

তখন বিমলা একেবারে মন্দির হইতে বহির্গত না হইয়া ঔৎসুক্য-ফুল্ললোচনে মন্দিরের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রফুল্লহৃদয়ে প্রতিমার সুবর্ণরৌপ্যাদির অলঙ্কার দেখিতে লাগিলেন; সম্মুখে স্তবকে স্তবকে সুগন্ধ পুষ্প আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন এ মন্দিরে আইসেন নাই, মন্দিরের সকল দ্রব্যই নূতন বোধ হইতে লাগিল। বিমলা এরূপ সুনির্ম্মিত, প্রশস্ত, চমৎকার অট্টালিকা কখন দেখেন নাই। কখন কখন স্বর্ণমণ্ডিত পুষ্পালঙ্কৃত স্তম্ভসমূহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কখন কখন ভিত্তির উপর সুবর্ণ ও দ্বিরদরদে ভাস্করকার্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; কখন ধীরে ধীরে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে লাগিলেন; কখন দুই এক জন দেবদাসীকে মন্দিরবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। উপাসক আর কেহই নাই, সুতরাং বিমলার এরূপ ঔৎসুক্যে কোন ব্যাঘাত জন্মে নাই।

একপার্শ্বে একমাত্র উপাসক নিদ্রিত রহিয়াছেন, সহসা বিমলার নয়ন সেই দিকে পতিত হইল। তাঁহার

অলৌকিক তেজঃ-পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমলা বিস্মিত হইলেন, নয়ন আর সে দিক হইতে অন্য দিকে ফিরাইতে পারিলেন না। যুবকের ললাট উদার ও প্রশস্ত, কিন্তু নিদ্রাতেও যেন কোন গাঢ় চিন্তায় বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কুঞ্চিত রহিয়াছে। নয়ন মুদিত, বদনমণ্ডল উজ্জ্বল ও বীরদর্প-প্রকাশক। প্রশস্ত স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের উপর দিয়া যজ্ঞোপবীত লুটাইয়া পড়িয়াছে, বাহুযুগল দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। উপাসকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিমলার বোধ হইল যেন কোন বীরপুরুষ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া দূরদেশ যাত্রা করিতেছেন, পথিমধ্যে এই দেবমন্দিরে উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। শ্রান্তিবশতঃ বা অন্য স্থান না থাকাতে উপাসনান্তে এই স্থানেই নিদ্রিত রহিয়াছেন। বিমলার অবলা হৃদয়েও বীর ভাবের অভাব ছিল না; সুতরাং উপাসকের এই অলৌকিক বীর আকৃতি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় সহসা স্তম্ভিত হইল, শরীর সহসা কণ্টকিত হইল। কি কারণে তাঁহার মনে চাঞ্চল্য হইল, বিমলা কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু অনিমেষলোচনে সেই বীর পুরুষের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আরও অগ্নি অভিমুখে পতঙ্গবৎ আকৃষ্ট হইতে লাগিল, শরীর অধিকতর অবসন্ন হইতে লাগিল,—কলের পুত্তলীর মত এক দৃষ্টে সেই উপাসকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পাঠক মহাশয়! কখন কি প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়িয়াছেন? কখন কি কোন রমণীরত্ন দেখিবামাত্র আপনার হৃদয় সহসা চঞ্চল হইয়াছে, শরীর কণ্টকিত হইয়াছে, নয়ন আকৃষ্ট ও নিমেষশূন্য হইয়াছে! কখন চঞ্চল নয়ন দুখানি দেখিয়া আপনার হৃদয় একবারে দ্রবীভূত

হইয়াছে,—অনুরাগপরিপূর্ণ স্মিতপ্রফুল্ল ওষ্ঠ দুখানি দেখিয়া কোন সুন্দরীকে স্নেহের পুত্তলী, প্রেমের পুত্তলী বলিয়া গ্রহণ করিতে মানস করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে বিমলার মনোগত ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। আমাদের ভাগ্যে এ প্রকার কখন ঘটে নাই, সুতরাং আমরা বিমলার হৃদয়চাঞ্চল্যের কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, বিমলাকে অবোধ বালিকা বলিয়া বোধ হইতেছে।

উপাসকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল, গাত্রোত্থান করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। চক্ষু উন্মীলন করিতেই দেখিলেন সম্মুখে উজ্জ্বলনয়না তন্বঙ্গী দণ্ডমান রহিয়াছেন, চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র বিমলার সংজ্ঞা হইল। অপরিচিত পুরুষের দিকে দেখিতেছিলেন জ্ঞান হইলে, লজ্জায় মুখ অবনত করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

নিশা প্রভাতপ্রায় হইয়াছে। প্রাতঃকালের প্রথম রশ্মি বিমলার নয়নোপরি নিপতিত হইল। চারিদিকে দুই একজন করিয়া লোক বাহির হইতেছে। বিমলার লোকের সম্মুখে পদব্রজে যাওয়া অভ্যাস নাই, কুঞ্চিত হইয়া দ্রুতবেগে বাসস্থানাভিমুখে চলিলেন। প্রাচীনাগণ যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, এতক্ষণ কি করিতেছিলেন, তখন বিমলা কি বলিবেন,—এতক্ষণ কি উপাসনা করিতেছিলেন?

বিমলার অন্যান্য চিন্তা হইতে লাগিল। এ বীরপুরুষ কে? কি ব্রতে ব্রতী হইয়া সমস্ত রাত্রি উপাসনা করিতেছিলেন? এমন ভাগ্যবান্ বীরপুরুষের প্রার্থনীয় কি আছে? যদি কিছু থাকে তাহা বিমলা কর্তৃক দত্ত হইতে পারে না? ধন, ঐশ্বর্য্য, ভূমি, বিমলার ত কিছুরই

অভাব নাই, এই বীরপুরুষের কামনা কি বিমলা সিদ্ধ করিতে পারেন না?—রে অবোধ! এ পুরুষ তোমার কে, যে তুমি তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিতে তৎপর হইয়াছ? এ প্রশ্ন সহসা বিমলার হৃদয়ে উদিত হইল, তাহার উত্তর করিতে পারিলেন না, ও চিন্তা দূর করিলেন।

ক্ষণেক পর আবার ভাবিতে লাগিলেন,—আচ্ছা উহার নিবাস কোথায়? উহার পিতামাতা কে, উহার কি বিবাহ হইয়াছে?—রে অবোধ! যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার কি? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিলেন না।

বিমলা যদি আপন হৃদয় বুঝিতে পারিতেন, তবে উত্তর করিতে পারিতেন, তবে বলিতেন, উনি আমার হৃদয়ের হৃদয়।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রেমিকে প্রেমিকে।

> Amid the jagged shadows,
> Of mossy leafless boughs,
> Kneeling in the moonlight,
> To make her gentle vows;
> Her slender palms together prest,
> And heaving sometimes on her breast;
> Her face resigned to bliss or bale,—
> Her face, O! call it fair not pale,—
> And both blue eyes more bright than clear,
> And each about to have a tear.
>
> *Coleridge.*

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করিবার জন্য বিমলা আপন শয়নভবনে গমন করিলেন।

দিনের বেলায় বড় অধিক নিদ্রা হইল না, যে পরিমাণে নিদ্রা হইল, তাহা স্বপ্নপরিপূর্ণ। সেই দেবপ্রাঙ্গন, সেই চন্দ্রালোকে মহেশ্বরগীত, সেই দেবমন্দিরে মহেশ্বরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে সেই উপাসক, এই সমস্ত বিষয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। বার বার সেই উপাসককে দেখিতে লাগিলেন, কখন নিদ্রিত, কখন বা উপাসনায় মগ্ন, কখন উপাসনান্তে দণ্ডায়মান, কখন বীরপুরুষের ন্যায় তরবারি হস্তে গর্জ্জন করিতেছেন। শেষবার যে স্বপ্ন দেখিলেন, সে অতি ভীষণ, বোধ হইল যেন আপনি উপাসনায় মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু মহেশ্বর-চরণে পুষ্প না দিয়া মকরধ্বজ-চরণে পুষ্প দিতেছেন! যতবার মহেশ্বরচরণে পুষ্প দিতে যান, ততবারই সেই পুষ্প কন্দর্পচরণে পতিত হয়। কিছুতেই মহেশ্বর-পূজা করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মহেশ্বর মূর্ত্তিমান হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। বিভূতি-বিভূষিত; কেশে গঙ্গা কল কল করিতেছে; ললাটে চন্দ্র ধক্ ধক্ করিতেছে; ফণীন্দ্র সকল তেজে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। মহেশ্বর আজ্ঞা দিলেন, "রমণী-হৃদয় পাপে কলুষিত, হৃদয় ভেদ কর।" তৎক্ষণাৎ সেই অপরিচিত উপাসক তরবারি দ্বারা রমণীর হৃদপিণ্ড বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। বিমলা চীৎকার শব্দ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন।

জাগিয়া দেখিলেন, গৃহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে; প্রাঙ্গনে লোকের সমাগম হইয়াছে; কলরব শুনা যাইতেছে। নিশি-জাগরণে বিমলার চক্ষে কালিমা পড়িয়াছে; ভয়ানক স্বপ্নবশতঃ তাঁহার স্বাভাবিক গৌর বদন রক্তশূন্য হইয়া, অধিকতর গৌর হইয়াছে; কপোলে, গণ্ডে, বক্ষঃস্থলে ঈষৎ ঘর্ম্ম হইয়াছে। বিমলা

আলুলায়িত কেশ কথঞ্চিৎ বদ্ধ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ভাবিলেন, "পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে; আমি পিতার মঙ্গলার্থ এই মন্দিরে আসিয়া অপরিচিত পুরুষের বিষয় চিন্তা করিয়াছি, সেই জন্যই এই অনিষ্ট-সূচক স্বপ্ন। আমি এ চিন্তা হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিব,—আবশ্যক হয়, হৃদয় সমেত উৎপাটিত করিব।" এই বলিয়া কক্ষ হইতে বাহিরে গমন করিলেন।

সমস্ত দিন বিমলা অন্যমনস্কার ন্যায় হইয়া রহিলেন। স্বপ্নকথা তাঁহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল। চিন্তা করিলেন, "যদি আমি পাপীয়সী হই, সেই মহাত্মা আমার হৃদয় ছেদন করিবেন কেন?" অনেক চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কাহাকে মনের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এমন লোক পাইলেন না। ভবিষ্যতে তাঁহার কপালে কি আছে বুঝিতে পারিলেন না।

সেদিন সন্ধ্যাকালে বিমলা উপাসনার্থ গমন করিলেন। সমস্ত দিন যদিও তিনি অন্যমনস্কা হইয়াছিলেন, উপাসনার সময় তাঁহার চিত্ত স্থির ভাব অবলম্বন করিল। দ্বিগুণ ভক্তির সহিত বিমলা ঈশ্বর আরাধনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে পিতার মঙ্গলার্থ পূজা করিলেন, তৎপরে আপন পাপক্ষয় কামনায় পূজা করিতে লাগিলেন। বিমলার মহেশ্বর প্রতি অচলা ভক্তি, পূজা করিতে করিতে তাঁহার নয়ন হইতে দরবিগলিত শ্রদ্ধাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া উপাসনা শেষ করিলেন।

উঠিবামাত্র পুনরায় সেই অপরিচিত উপাসককে দেখিতে পাইলেন। তিনিও পূজা সমাধা করিয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন। বিমলার চিত্তসংযমের ক্ষমতা ছিল,

অদ্য তিনি চিত্ত কথঞ্চিৎ সংযত করিয়াছিলেন। ক্ষণেক মাত্র বিমলা সেই উপাসকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অবনত মুখে মন্দির হইতে বাহির হইবার উদ্যম করিলেন।

যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। দুই দিনই সেই পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন, দুই দিনই সুন্দরী একদৃষ্টে তাঁহার দিকে ক্ষণেক মাত্র চাহিয়া রহিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই জানিতেন যে, দেবমন্দিরেও কুলটা কামিনী কুকামনায় যাতায়াত করিয়া থাকে, কিন্তু বিমলার আকৃতি ও মুখের ভাব দেখিয়া সেরূপ চিন্তা যুবকের মনে একবারও স্থান পায় নাই। তাঁহার হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত এই হইল যে, এই রমণীর কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে। কিন্তু লজ্জায় অপরিচিত পুরুষের সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না। একবার ইচ্ছা হইল নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, অপরিচিতা, তরুণী, ভদ্রকন্যার সহিত কিরূপে বাক্যালাপ করিবেন। দুই দিনের কথা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া অবশেষে ভাবিলেন, "যদি আমি না জিজ্ঞাসা করি, বোধ হয়, কোন বিশেষ গূঢ় কথা অব্যক্ত থাকিবে,—বোধ হয়, যে কারণে রমণী মন্দিরে আসিয়াছেন, নিষ্ফল হইবে।"

ধীরে ধীরে বিমলার নিকটে যাইয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! অপরিচিত হইয়াও আমার সহিত কথা কহিতেছি ক্ষমা করুন, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে, আপনার কিছু বক্তব্য আছে,—যদি থাকে আজ্ঞা করুন।"

বিমলার কর্ণে অমৃত বর্ষণ হইল, বোধ হইল, এরূপ সঙ্গীতপরিপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে কখন প্রবেশ করে নাই। তাঁহার প্রাতঃকালের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যা-

কালের চিত্তসংযম একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—মুখ অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যুবক দেখিলেন, কোন উত্তর নাই, অথচ রমণী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বলুন, আমি শুনিতেছি,—এখানে আর কেহই নাই।"

বিমলার বিহ্বলতা অধিকক্ষণ স্থায়ী নহে। তিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনার নাম কি?"

যুবক উত্তর করিলেন,—"নাম এক্ষণে অজ্ঞাত থাকিবে,—আমাকে অধুনা ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা বলিয়া জানিবেন।"

পাঠক মহাশয়! আমাদের পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুকে অনেকক্ষণই চিনিয়াছেন। বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উপাসনার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

ইন্দ্র। "সংক্ষেপে বলিতেছি—কোন অনাথা, আশ্রয়-হীনা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।"

বিম। "ধন দ্বারা কোন সাহায্য হইতে পারে?"

ইন্দ্র। "না। কিন্তু আপনাকে অপরিচিতের উপকারার্থ তৎপর দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, ঈশ্বর আপনাকে সুখে রাখুন।"

বিম। "তবে কিরূপে সাহায্য হইবার সম্ভব?"

ইন্দ্র। "বিচার। আমি মুঙ্গের যাত্রা করিয়া বিচার প্রার্থনা করিব। কিন্তু আপনি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনি অবশ্যই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন।"

বিমলা মুঙ্গের নাম শুনিয়া পিতার কথা স্মরণ করিলেন, পিতার বিপদ স্মরণ করিলেন, তখন লজ্জা একেবারে দূরীভূত হইল, সতেজে ইন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় বীরপুরুষ, আপনার ক্ষমতা অপার, প্রতিজ্ঞা করুন দাসীর একটী ভিক্ষা প্রতিপালন করিবেন।"

ইন্দ্র। "রমণি! আমার ক্ষমতা নাই কিন্তু সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞা পালন করিতে যত্নবান হইব।"

বিম। "মুঙ্গেরে আপনি বঙ্গদেশের দেওয়ান সতীশ-চন্দ্রকে দেখিতে পাইবেন। তিনি এক্ষণে বিপদ্‌জালে বেষ্টিত, প্রতিজ্ঞা করুন তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন পাইবেন।"

ইন্দ্রনাথের মুখ গম্ভীর হইল, ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, "এই রমণী আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন;—মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত জানেন; আমার ব্রতের বিষয়ও অবগত আছেন;—সেই ব্রত ভঙ্গ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন।" তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন।

"এ বিষয়ে আপনি চিন্তা করিতেছেন কেন? বিপন্নের বিপদ্ শান্তি করাই বীরপুরুষের কার্য্য, আর যদি কখন তাঁহাকে অসৎলোক বলিয়া শুনিয়া থাকেন, সে জঘন্য মিথ্যাকথা,—শকুনির প্রতারণা।"

ইন্দ্র। "আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন,—শকুনি কে?"

বিম। "শকুনি সতীশচন্দ্রের শনি। সেই পামরই সকল দোষে দোষী,—সতীশচন্দ্রের উদারচরিত্রে কোন দোষ স্পর্শে না। বীরপুরুষ! এই দেবালয়ে অঙ্গীকার করুন, আপনি সতীশচন্দ্রের সহায় হইবেন।"

ইন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন,—কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "যদি যথার্থই সতীশচন্দ্র নির্দ্দোষী হয়েন, তবে আমি আপনার অনুরোধে নিজ শোণিত দিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আপনার নাম কি বলুন। আপনি কে, কিরূপেই বা আমার উপাসনা, আমার প্রতিজ্ঞার কারণ জানিতে পারিলেন।"

বিমলা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! যদি অনুমতি করেন, আপনার প্রশ্নের উত্তর করিবার পূর্ব্বে দাসী একটী প্রশ্ন করিবে। আপনার বংশের পরিচয় দেন নাই, কিন্তু কোন্ বংশে পাণিগ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলিবার কি নিষেধ আছে?"

ইন্দ্র। "এখনও আমি কাহারও দাস হই নাই,—আমি অবিবাহিত।"

বিমলার শরীর সহসা পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কেন হইল,—কে বলিবে কেন হইল,—আশা মায়াবিনী! বিমলা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন।

"আমাকে ভিখারিণী বলিয়া জানিবেন," বলিয়া বিমলা আবার একটু হাসিলেন।

বিমলার সুমধুর হাস্য দেখিয়া ইন্দ্রনাথ অন্য কথা ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন—

"ভিখারিণি! এবার বল দেখি তোমার আবার ভিক্ষা কিসের?

ন রত্নমন্বিষ্যতি, মৃগ্যতেহি তৎ।"

বিমলার মুখ লজ্জায় আরও অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিল,—চক্ষুর পাতা দুখানি পড়িয়া গেল,—মুখ আরক্ত হইল। গদ গদ স্বরে বলিলেন।

"একটী ভিক্ষা ত বলিয়াছি,—সতীশচন্দ্রের রক্ষা,—

বিধাতা যদি সময় দেন, তবে অন্য ভিক্ষাটী অবকাশ-মতে বলিব।"

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিলেন। সে সৌন্দর্য্য ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে অনেক দিন অঙ্কিত রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নাবিক।

How he heard the ancient helmsman
  Chant a song so wild and clear,
That the sailing sea bird slowly
  Poised upon the mast to hear,
Till his soul was full of longing,
  And he cried with impulse strong,—
"Helmsman! for the love of heaven,
  Teach me, too, that wondrous song!"

Longfellow.

গঙ্গানদীর উপর মুঙ্গেরের ভীমকান্ত দুর্গ শোভা পাইতেছে। কল কল শব্দে গঙ্গার তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে, এক একবার দুর্গের উপর বলে আঘাত করিতেছে,—আবার ফেনময় হইয়া দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে ভীষণ আবর্ত্ত দেখা যাইতেছে,—সেই আবর্ত্তে তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু আসিতেছে, বেগে মগ্ন হইয়া যাইতেছে। কোথাও কোথাও পাড়ের মৃত্তিকারাশি ভীষণ শব্দে জলে পতিত হইতেছে,—বারিরাশি কিঞ্চিৎমাত্র কলুষিত ও চঞ্চল হইয়া পুনরায় মুহূর্ত্ত মধ্যে আপন গম্ভীর রূপ ধারণ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে শুভ্র বালুকার চর

দেখা যাইতেছে,—সেই চরে নানাপ্রকার পক্ষী বিচরণ করিতেছে,—কোথাও বা তরীবাসীগণ অবতরণ করিয়া সায়ংকালের ভোজ্য পাক করিতেছে সেই তরী হইতে অসংখ্য দীপ তারকজ্যোতিরূপে বহির্গত হইয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষে ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। আকাশেও ক্রমে ক্রমে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে,—গঙ্গাতীরে দুই একজন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে,—নগর ক্রমে নিঃস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে।

সেই গঙ্গাতীরে একজন যুবাপুরুষ একাকী ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রনাথ।

ইন্দ্রনাথ অদ্যই মুঙ্গেরে পঁহুছিয়াছেন,—নিবিড় চিন্তায় মগ্ন হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার চিন্তা কি, পাঠক মহাশয় অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন।

অনেকদিন হইল গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। যদিও তিনি এইরূপ মধ্যে মধ্যে গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটন করিয়া থাকেন, তথাপি পিতা তাঁহার জন্য কতই চিন্তা করিতেছেন, সন্দেহ নাই। কবে গৃহে ফিরিয়া যাইবেন?—যেরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কখনও কি গৃহে ফিরিয়া যাইবেন? ইন্দ্রনাথের অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ সাহসী,—তিনি সমস্ত জগৎকেই আপন গৃহ বলিয়া মনে করিতেন,—মানবজাতিকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি প্রবাসে আসিয়া পিতৃগৃহের জন্য একবারও চিন্তা হয় না, এমন হৃদয়ই নাই। ইন্দ্রনাথের হৃদয়েও এক একবার চিন্তা হইত।

কি করিতেই বা আসিয়াছেন? এই প্রশ্নেরও সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা সাধন জন্য। সত্য, কিন্তু সে প্রতিহিংসা কিসে

সাধন হইবে? আপনি আশ্রয়হীন সহায়হীন, সম্পত্তিহীন অপরিচিত লোক হইয়া কিরূপে সে প্রতিহিংসা সাধন করিবেন? রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে আছেন, তাঁহার নিকট যাইয়া বিচার প্রার্থনা করিলে হয় না? রাজা টোডরমল্ল এক্ষণে যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে মগ্ন, এক্ষণে কিরূপে তিনি অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন? বঙ্গদেশ এখনও জয় করিতে পারেন নাই,—কিরূপে বঙ্গবাসীদিগের ন্যায় অন্যায় বিচার করিবেন?

আর যদিই বা সে বিচার করিতে এক্ষণেই সক্ষম হয়েন, মানসও করেন,—অপরিচিত লোকের কথায় বিশ্বাস করিবেন কেন? মান্যবর দেওয়ানজীর বিরুদ্ধে একজন অপরিচিত জমীদারপুত্র যাহা বলিবেন তাহা কি বিশ্বসনীয়? রাজা টোডরমল্ল বিচার করিতে সম্মত হইলেও ইন্দ্রনাথ এমন প্রমাণ কোথায় পাইবেন যে, সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ হইবে?

আর সহসা দোষারোপ করা কি উচিত? মহেশ্বরমন্দিরে অপরিচিতা রমণী যাহা বলিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ তাহা বিস্মৃত হয়েন নাই। সে রমণী যে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহাও বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার কথা যদি সত্য হয়, তবে সতীশচন্দ্র নিরপরাধী। সে কি সম্ভবে? যাহা হউক, নিশ্চয় না জানিয়া কি সতীশচন্দ্রের উপর দোষারোপ করা উচিত?

আর সেই রমণী যাহার নাম করিয়াছিল, সে শকুনিই বা কোথায়? ইন্দ্রনাথ যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অধিকতর ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনেকক্ষণ একাকী সেই গঙ্গার তীরে পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া সেই তীরে উপবেশন করিলেন।

ভাবিলেন, "এক্ষণে কোন উপায় দেখিতেছি না। মুঙ্গেরে কিছু দিন অবস্থান করা যাউক, সময় বুঝিয়া কার্য্য করিব।"

এই সকল চিন্তা ক্রমে অবসান হইতে হইতে ইন্দ্রনাথের অন্যরূপ চিন্তা আসিতে লাগিল। বেগপ্রবাহিণী, কল্লোলিনী, অসংখ্য ঊর্ম্মিরাশি-বিভূষিতা গঙ্গানদীর দিকে যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে নব নব ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। শাস্ত্রে এই পাবনী নদীর মহিমা শুনিয়াছেন, কাব্যে গঙ্গার সৌন্দর্য্যবিষয় পাঠ করিয়াছেন, পুরাণে পুরাবৃত্তে সহস্র বার এই সুখদায়িনী, কলুষধ্বংসকারিণী নদীর স্তুতি-পাঠ করিয়াছেন, লোকমুখে ও জনশ্রুতিতে এই নদীর অসংখ্য গুণগান শুনিয়াছেন। যখন এই সমস্ত বিষয় ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, যখন সেই অনন্ত বীচিমালার সুশ্রাব্য গম্ভীরস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, যখন সেই অগাধ, অসীম জলরাশির দিকে তাঁহার নয়ন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, যখন নিশার আগমনে শশধর উদিত হইয়া সুন্দর ঊর্ম্মিশ্রেণীকে নবোঢ়া বধূর ন্যায় সস্নেহে চুম্বন করিয়া সুবর্ণরাশি দ্বারা অলঙ্কৃত করিল, তখন ইন্দ্রনাথের হৃদয় এক অভিনব উল্লাসে স্ফীত হইতে লাগিল, অভিনব আনন্দে দ্রবীভূত হইতে লাগিল। হৃদয়ের সমুদয় নীচাশয়, ক্ষুদ্র ভাব অন্তর্হিত হইতে লাগিল; মহদ্ভাব, মহান আশয় জাগরিত হইতে লাগিল; সেই সায়ংকালীন অগাধ জলরাশির মহত্ত্ব, ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে অভিনব মহত্ত্বের ভাব উদ্রেক করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নিস্পন্দ লোচনে প্রকৃতির শোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন।

সহসা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতে ইন্দ্রনাথের চিন্তা ভঙ্গ হইল,—চাহিয়া দেখিলেন, সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির চন্দ্রালোকোজ্জ্বল বক্ষঃস্থলে একটী ক্ষুদ্র তরী ভাসমান রহিয়াছে,—তাহার একমাত্র আরোহী সেই গান করিতেছে। গান বিশেষ মধুর কি না জানি না, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কর্ণে স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বোধ হইল। তাঁহার হৃদয়যন্ত্র সেই সময়ে প্রকৃতির অনন্ত সঙ্গীতে পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং অনুরূপ ভাবোত্তেজক সামান্য সঙ্গীতকেও তিনি স্বর্গীয় সঙ্গীত বলিয়া বোধ করিলেন। সেই নাবিককে ইঙ্গিত করাতে সে নৌকা তীরে আনিল ও ইন্দ্রনাথ তাহাতে আরোহণ করিয়া, তাহাকে কিছুক্ষণ তরী সঞ্চালন করিতে বলিলেন, আর সেই গীত গাইতে আজ্ঞা করিলেন।

সেই গান একবার, দুইবার, তিনবার, গীত হইল। গঙ্গার অনন্ত গীতের সহিত মিলিত হইয়া বায়ুপথে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে নাবিক জিজ্ঞাসা করিল—

"মহাশয়! আপনাকে অগ্রে কখন এই নগরে দেখি নাই, আপনি কি সম্প্রতি আসিয়াছেন?"

ইন্দ্র। "আমি অদ্যই আসিয়াছি।"

নাবি। "আপনার নাম কি? নিবাস কোথায়?"

ইন্দ্র। "আমাকে ইন্দ্রনাথ বলিয়া জানিবে, নিবাস অনেক দূরে, নদীয়া জিলায়।"

নাবি। "নদীয়া জিলার কোন গ্রামে?"

ইন্দ্র। "ইচ্ছাপুর গ্রামে।"

নাবি। "ইচ্ছাপুর গ্রামে! আপনি কাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

ইন্দ্র। "কেন, তুমি ইচ্ছাপুরে গিয়াছিলে না কি?"

নাবিক ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, যেন কোন কথা লুকাইবার চেষ্টা করিল, পরে বলিল, "আমাদের কার্য্য বশতঃ সকল স্থানেই যাইতে হয়,—বৎসর বৎসর বাদা হইতে চাল আনিতে যাইতাম। আপনার পিতার নাম কি? হইতে পারে আমি তাঁহাকে চিনিলেও চিনিতে পারি।" ইন্দ্রনাথ আপন পরিচয় সকলের নিকট লুকাইয়া রাখিতেন,—গুপ্তভাবেই দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতেন,—কিন্তু নাবিকের নিকট পিতার নাম লুকাইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না,—ভাবিলেন, আমি অনেকদিন পিত্রালয় হইতে আসিয়াছি, যদি এই মাঝি সম্প্রতি সে গ্রাম হইতে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার পিতার কুশল-সংবাদ দিলেও দিতে পারে। বলিলেন, "ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আমার পিতা।" নাবিক শুনিয়া সহসা চমকিত হইল। পুনরায় চিত্তসংযম করিয়া বলিতে লাগিল, "হা নগেন্দ্রনাথ! পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ! তাঁহার অন্নে আমি কতদিন পালিত হইয়াছি।"

ইন্দ্র। "তুমি তাঁহার বাটীতে চাকর ছিলে না কি?"

নাবি। "অদ্য প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল আমি তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিয়াছি,"—কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আপনার কি তখন ইন্দ্রনাথ নাম ছিল?"

ইন্দ্র। "তোমার নিকট আর লুকাইবার আবশ্যক কি? ইন্দ্রনাথ আমার কখনই নাম নহে, চিরকালই আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ, তবে অজ্ঞাতরূপে দেশ-বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয়, এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রনাথ নাম ধারণ করি।"

"সুরেন্দ্রনাথ!" এই কথামাত্র উচ্চারণ করাতে নাবিকের চক্ষে জল আসিল,—বলিতে লাগিল—

"আমি আপনাকে কত খেলা দিয়াছি, কতবার ক্রোড়ে করিয়া চুম্বন করিয়াছি,—যখন আপনার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর, তখন আপনাকে ত্যাগ করিয়া আইসি। আপনার কি আমাকে মনে পড়ে?"

ইন্দ্রনাথের বাল্যাবস্থায় বাড়ীতে যত ভৃত্য ছিল তাহাদের একে একে স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাবিক কখন ভৃত্য ছিল, কি না স্মরণ করিতে পারিলেন না; অথচ নাবিকের মুখ দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতে লাগিল। বলিলেন, "আমি স্মরণ করিতে পারিতেছি না।"

নাবি। "এক্ষণে আমার পূর্ব্ব অন্নদাতার সংসারের বিষয় জিজ্ঞাসা করি। নগেন্দ্রনাথ ভাল আছেন?"

ইন্দ্র। "আছেন।"

নাবি। "তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক্ষণে কোথায়?"

ইন্দ্র। "আমার জ্যেষ্ঠের অনেকদিন হইল কাল হইয়াছে।"

নাবি। "তাঁহার নাম উপেন্দ্রনাথ ছিল না?"

ইন্দ্র। "হাঁ।"

নাবি। "তাঁহার কাল হয় কিরূপে?"

ইন্দ্র। "ইচ্ছাপুরে বড় ব্যাঘ্রের ভয়, আমার জ্যেষ্ঠকে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। আমার জ্যেষ্ঠকে প্রায় স্মরণ নাই। অনেক বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে।"

নাবি। "মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?"

ইন্দ্র। "তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সেই দুঃখে তাঁহার রোগ হয়, সেই রোগে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।"

নাবিক এই কথা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল,—দরবিগলিত অশ্রুধারায় বস্ত্র সিক্ত হইল,—বলিতে লাগিল, "হায় মাতাঠাকুরাণী!—আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন মাতা পুত্রকে কখন সেরূপ স্নেহ করে নাই। হা বিধাতঃ! আমার কি মৃত্যু নাই।"

ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল। ভৃত্য কি কখনও প্রভুর জন্য এত ক্ষুণ্ণ হয়? একবার ভাবিলেন অনেক দিনের ভৃত্য, হইলেও হইতে পারে, আরবার ভাবিলেন, নাবিকের ক্রন্দন সমস্তই প্রতারণা, নাবিক নগেন্দ্রনাথকে কখন জানিত না, অধিক অর্থ পাইবার জন্য কপট কৌশলে সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কপট দুঃখ দেখাইতেছে। কখন বা ভাবিলেন, অধিক অর্থ পাওয়া অপেক্ষাও কোন গভীরতর পাপ অভিসন্ধি থাকিতেও পারে। তৎক্ষণাৎ আবার মনে হইল এ মুখ আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এ স্বর আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি, নাবিক অবশ্যই পুরাতন ভৃত্য হইবে।

নাবিক সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক ভাব কিছু কিছু বুঝিতে পারিল। কিছু কষ্টে আত্মসংযম করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল।

অনেকক্ষণ অন্য কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, নাবিক নীচব্যবসায়ী হইয়াও ভদ্রলোকের মত আলাপ পরিচয় শিখিয়াছে,—অনেক বিষয়ে বিলক্ষণ বুদ্ধিও প্রদর্শন করিতেছে, ও অনেক প্রকার লোকের সহিত সহবাসে বিলক্ষণ সংসারজ্ঞানও লাভ করিয়াছে। দুই এক ঘণ্টা কথোপকথনে মনুষ্য হৃদয়ের তলচারি প্রবৃত্তি সকলের বিশেষ জ্ঞান প্রকাশ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই কথোপকথনে

অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন,—মনে যে সংশয় হইয়াছিল তাহা একেবারে দূর করিলেন, নাবিকের উপর যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন।

নাবিক মধ্যে মধ্যে আপনার বিষয়ও দুই একটী কথা বলিতে লাগিল, মানবজাতির আশা ভরসা, সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্যের কথা বিস্তর বলিতে লাগিল,—সুরেন্দ্রনাথের কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ হইতে লাগিল। নৌকা প্রায় এক ক্রোশ ভাসিয়া গেল, গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝক্‌মক্ করিতেছে, আকাশে দুই এক খণ্ড শুভ্র মেঘ দেখা যাইতেছে, কখন কখন চন্দ্রকে ঈষৎ আবরণ করিতেছে আবার বায়ুতে তাড়িত হওয়াতে চন্দ্রের পুণ্য জ্যোতি নদীর প্রশান্ত বক্ষে পতিত হইতেছে। আকাশ গভীর নীলবর্ণ, দুই একটী তারা লজ্জাবতী নববধূর ন্যায় কখন কখন মুখ দেখাইতেছে। জগতে সমস্ত জীব নিস্তব্ধ, কেবল কখন কখন দূর হইতে একটী গীত বায়ুমার্গে ভাসিয়া আসিতেছে, আর সেই বিস্তীর্ণ গঙ্গা-বারিতে ও পার্শ্বস্থ শুভ্র সৈকতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। গঙ্গায় আর একটী নৌকাও চলিতেছে না। কেবল সুরেন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র তরী তর তর শব্দে ভাসিতেছে।

হঠাৎ নাবিক আপন কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ সেই দিকে দৃষ্টি করিলেন,—দেখিলেন বৃক্ষের মধ্য হইতে একটী আলোক নির্গত হইতেছে। নাবিক অনেকক্ষণ সেই দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল, "ঐ যে আলোক দেখিতেছেন, ঐ আমার গৃহ, আর উহার অনতিদূরে যে নিকুঞ্জ দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমার হৃদয় সংস্থাপিত আছে।"

নাবিকের গম্ভীরভাবে চমকিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন তাহার চক্ষুতে অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে দুঃখের সঞ্চার হইল। স্নেহপূর্ব্বক সেই জল মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাবিক তোমার হৃদয়ের ভাব আমাকে পরিষ্কার করিয়া বল,—যদি আমার সাধ্য থাকে তোমার দুঃখ মোচন করিব। তুমি কে যথার্থ করিয়া বল, সামান্য লোকের হৃদয়ে এরূপ ভাব থাকিতে পারে না,—সামান্য লোকের এরূপ সুবুদ্ধি, এরূপ কথোপকথনের ক্ষমতা সম্ভবে না।"

নাবিক আপন শরীর হইতে উত্তরীয় খুলিয়া ফেলিয়া আপন যজ্ঞোপবীত দেখাইল। বলিল "আমি এক্ষণে দরিদ্র মাঝি বটে কিন্তু আমি ব্রাহ্মণতনয়। যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হইয়া থাকে, অনুগ্রহ বোধে আমার কুটীরে আসুন, আমি সমস্ত কথা আপনাকে নিবেদন করিব।"

সুরেন্দ্রনাথ সম্মত হইলেন। তরী তীরে লাগিল। দুই জনে নিঃশব্দে সেই তরীচালকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নাবিকের পূর্ব্বকথা।

How sweet the days that I have spent,
  In yon sequestered bower,
Those citron trees, still sweet of scent,
  Had then some magic power.
Or some fair spirit did reside,
  In that sweet purling brook,
Which runs by yon green mountain side,
  Now haunted by the rook.
No charm was in the spicy grove,
  No spirit in the stream,
O'was the smile of her I love,
  Now vanished like a dream!

I. C. Dutt.

কোন কোন মর্য্যাদাগর্ব্বী লোক বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের উপর রুষ্ট হইবেন। ভ্রুকুটী করিয়া বলিবেন, "কি, সম্ভ্রান্ত জমীদারপুত্র হইয়া সামান্য জেলেমাঝির সহিত বন্ধুত্ব! এই কি তাঁহার মানসম্ভ্রম, এই কি তাঁহার কুলমর্য্যাদা! কোথায় উন্নতিশালী লোকের সহিত যত্নসহকারে আলাপ পরিচয় করিবেন, কোথায় বড় লোকের সহিত আলাপ করিয়া আপনি দেশের মধ্যে একজন বড় লোক হইতে চেষ্টা করিবেন,—পিতার নাম রাখিবেন, কুলের নাম রাখিবেন, তা নয় কেবল ছদ্মবেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আর যত চাষা মজুরের সহিত আলাপ করিতেছেন! ছোঁড়া অধঃপাতে গিয়াছে। আর যে তাহার চরিত্রের বিষয় লিখিতেছে, সেও অধঃপাতে গিয়াছে।"

এইরূপে তিরস্কার করিলে আমরা যে কি উত্তর দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না, ভয়ে একেবারে নিরুত্তর! অগত্যা স্বীকার করিব আমাদের সুরেন্দ্রনাথের

বিষয়বুদ্ধি কিছু অল্প বটে,—বোধ হয় যথার্থই তিনি মর্য্যাদা রাখিতে জানেন না,—নাম কিনিবার যে সহস্র কৌশল আছে তাহা তিনি জানেন না। বড় লোকের মধ্যে গণ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিয়া বড় লোকের সহিত আলাপ করা, বড় লোকের সভায় উপস্থিত থাকা, আলাপ না থাকিলেও অন্য লোকের নিকট বড় লোকের পরম বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়া, অন্তরে বিদ্যাবুদ্ধি থাকুক বা না থাকুক, মুখে গাম্ভীর্য্য টুকু ধারণ করা, সমমর্য্যাদার লোকের সহিত কথা না কহা, কিম্বা গর্ব্বিতভাবে কথা কহা, অধিক মর্য্যাদার লোকের সহিত লোকের সম্মুখে সমানের মত কথা কহা, অন্তরালে খোসামোদ করা, ক্ষমতা না থাকিলেও লোকের নিকট ক্ষমতা আছে বলিয়া পরিচয় দেওয়া, মান না থাকি-লেও লোকের নিকট মানীর ন্যায় অঙ্গভঙ্গী করা, বিষয় ও ধন না থাকিলেও বিষয়ী ও ধনী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, সতর্কভাবে যথার্থ যে সম্পত্তি আছে তাহা গুপ্ত করিয়া তাহার দশ গুণ সম্পত্তি আছে, আচার ব্যবহার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করা, ৪০ টাকা আয় থাকিলে ১১০ টাকা আয় আছে বলিয়া প্রচার করা, ২৫ টাকার দ্রব্যকে নগদ ৪০ টাকায় ক্রীত দ্রব্য বলিয়া জানান,—এইরূপ সহস্র মহা কৌশল সুরেন্দ্রনাথ জানিতেন না। সে নির্ব্বোধ বালক! ভাবিত সৎকর্ম্ম করিলেই মানবজাতির যথার্থ মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অতি নির্ব্বোধ! যে সৎকর্ম্ম করিত তাহা লোককে জানান চাই—তাহার দশগুণ অধিক করিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করা চাই, তাহা হইলেও কিছু হইত। তা নহে, গোপনে সৎকর্ম্ম করিলে কি হইবে? ছোঁড়া যথার্থ অধঃপাতে গিয়াছেই বটে!

আর আমাদের উপর যে ক্রোধ করিতেছেন সে অসঙ্গত ক্রোধ। সুরেন্দ্রনাথ যদি নির্ব্বোধ হয়েন, আমাদের কি দোষ? সুরেন্দ্রনাথের আচারব্যবহার দেখিয়া আমরা লজ্জিত, কুণ্ঠিত ও অপ্রস্তুত হইয়াছি,— কিন্তু তজ্জন্য যাহা ঘটিয়াছে তাহার অন্যরূপ লিখিব কি রূপে। যাহা যাহা ঘটিয়াছে আমরা কতাহাই লিখিতেছি, সুরেন্দ্রনাথ মাঝির সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই লিখিতে বাধ্য হইলাম। এ যথার্থ ইতিহাস কি আমরা কাল্পনিক কোন কথা বানাইয়া লিখিতেছি? রাম!

সুরেন্দ্রনাথ ও নাবিক এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় জেলেমাঝিদিগের একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কিন্তু গ্রামের অন্যান্য কুটীরাবলী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এই কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাতঃকালের অন্ন ছিল, সেই অন্ন উভয়ে আহার করিলেন, পরে নাবিক আপনার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ কবিলেন;—

"যুবক! আপনার হৃদয়ে যদি ক্রোধ ও দর্প থাকে তাহা ত্যাগ করুন,—এই দর্পেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শৈশবাবস্থা হইতে আমি অতিশয় গর্ব্বী ছিলাম। শুনিয়াছি অতি শৈশবেও আমার কোন বিষয়ে ইচ্ছা যদি না সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে আমি এক দিন, দুই দিন অনাহারে থাকিতাম। এই বিজাতীয় ক্রোধেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

"বাল্যাবস্থায়ও এইরূপ ছিলাম। আমার মন স্বভাবতঃ পাঠাভ্যাসে রত হইত। কিন্তু কখন যদি গুরুমহাশয় আমায় তিরস্কার করিতেন, তাহা হইলে আমার সেই বিজাতীয় ক্রোধের আবির্ভাব হইত;

পুস্তক দূরে নিক্ষেপ করিতাম; সহস্র বেত্রাঘাতেও আমি কথা কহিতাম না; ক্রন্দন করিতাম না। গুরুমহাশয় আমাকে ভাল বাসিতেন, কিন্তু সময়ে সময়ে আমার ক্রোধ দেখিয়া আমার উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন। একদা এরূপ রুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সমস্ত পাঠশালার ছাত্রের সম্মুখে বলিলেন, 'এই বালক বেত্রাঘাতে ক্রন্দন করে না, কিন্তু অদ্য যদি না ক্রন্দন করাই, তাহা হইলে আমি এ কার্য্য পরিত্যাগ করিব।' এই বলিয়া তিনি আমাকে বেত্রাঘাত প্রভৃতি সহস্ররূপে যাতনা দিলেন, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম, মুখ দিয়া বাক্য বাহির হয় নাই, চক্ষু হইতে জল বাহির হয় নাই। অবশেষে গুরুমহাশয় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বলিলেন 'অগ্নি দিয়া উহাকে দাহন কর।' এক খণ্ড অগ্নি আনীত হইয়া আমার শরীরে স্থাপিত হইল, আমি যাতনায় অস্থির হইলাম, তথাপি কথা কহিলাম না,—মুহূর্ত্ত মধ্যে অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তখন গুরুমহাশয়ের সংজ্ঞা হইল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়া ক্রোড়ে করিলেন, জল সেচনের দ্বারা আমি শীঘ্রই চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। সেই অবধি আমার পড়া সাঙ্গ হইল। গুরুমহাশয় আর আমাকে পড়াইলেন না। আমি জন্মের মত মূর্খ রহিলাম।

"আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে কখন নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই। তিনি আমার হৃদয় জানিতেন ও আমাকে এরূপ ভাল বাসিতেন যে, কখনও তাঁহার একটী কথাতেও আমার মনে বেদনা জন্মে নাই। (বলিতে বলিতে বক্তার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল)। আমিও তাঁহাকে যেরূপ ভাল বাসিতাম সন্তানে মাতাকে সেরূপ ভাল বাসে নাই। আমি পিতার অবাধ্য হইয়াছি; গুরুর

অবাধ্য হইয়াছি; কিন্তু কস্মিন্‌কালেও মাতার একটী কথা অবহেলা করি নাই। গৃহের সমস্ত লোকে উপ-রোধ করিলে, ভয় প্রদর্শন করিলে, প্রহার করিলে, আমি যে কার্য্য না করিতাম, মাতা ইচ্ছা প্রকাশ করি-লেই আমি তাহা করিতাম,—হায়! সে স্নেহের প্রতি-মাকে আমি আর দেখিতে পাইব না।” বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, মুখ নত করিয়া অনবরত অশ্রু-বিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তোমার মাতার কাল হইয়াছে?”

নাবিক উত্তর করিল, “শুনিয়াছি তাঁহার কাল হই-য়াছে।”

ক্ষণেক ক্রন্দনের পর হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে পুন-রায় বলিতে লাগিল।—

“আমার পিতাও আমাকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বভাব রুক্ষ ছিল। আমার এ বিজাতীয় ক্রোধ কতক অংশে আমি তাঁহারই নিকট হইতে প্রাপ্ত হই-য়াছি। বিশেষতঃ সংসারচিন্তায় জ্বালাতন হইয়া অনেক সময়ে তিনি মিথ্যা ক্রোধ করিতেন। আমাকে যথার্থ ভাল বাসিতেন; আমার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার লোচন আনন্দে উৎফুল্ল হইত; আমার নিন্দা শুনিলে তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া যাইত; কিন্তু তথাপি তিনি স্বাভাবিক ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এক একবার তাঁহার নয়ন ক্রোধে আরক্ত হইত; শরীর কম্পিত হইত; অনেক সময় অকারণে প্রহার ও তির-স্কার করিতেন। এক দিন আমাকে নির্দ্দোষে নির্দ্দয় হইয়া প্রহার করিলেন ও বলিলেন ‘তোর মুখ আর দেখিতে চাহি না, আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া

যা;' চলিলাম, বলিয়া আমি পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইলাম।

"প্রহারে ও তিরস্কারে অনেক বালক শান্ত হয়, কিন্তু আমি ক্রোধে অন্ধ হইলাম; চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলাম; হৃদয়ে হুতাশন জ্বলিতে লাগিল। সেই হুতাশন পিতৃভক্তি, মাতৃস্নেহ, কনিষ্ঠের প্রতি ভালবাসা সকলই দগ্ধ করিল। সেই হুতাশনে আমার ভাবী সংসার-সুখ, পিতামাতার আশা ভরসা একেবারে দগ্ধ করিল। পিতা আমাকে দূর হইতে বলিলেন, আমি সকল রূপ স্নেহ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া দূর হইলাম। সেই অবধি আমি পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছি। তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

"কেবল ইহাও নহে; পিতৃদত্ত কোন দ্রব্যই আমার সঙ্গে লইব না, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল। রাত্রিকালে ছদ্মবেশে ভিক্ষা করিয়া একখানি ছিন্ন বস্ত্র পাইলাম, তাহাই পরিধান করিয়া আপন বস্ত্র পিতৃগৃহের সন্নিকটে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিলাম। মনে করিলাম পিতার নিকটে আর আমি ঋণগ্রস্ত নহি। রে মূঢ় অন্তকরণ! আশৈশব যত্ন সহকারে, স্নেহ সহকারে, অর্থ সহকারে পিতা যে মানুষ করিয়াছিলেন সে ঋণ কোথায় যাইবে?

"তাহার পর দশ বৎসর আমার জীবন যে কিরূপে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন না। মরুভূমিতে প্রচণ্ড বায়ুর ন্যায় আমার জীবনের দশ বৎসর বহিতে লাগিল। প্রচণ্ডতা আছে কিন্তু ফল নাই, অর্থ নাই, কাহারও উপকার নাই, কাহারও অপকার নাই। নির্জ্জন প্রাণিশূন্য পর্ব্বতপার্শ্বে সমুদ্রগর্জ্জনবৎ আমার হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি সমুদয় গর্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু

সে গর্জ্জনের শ্রোতা নাই ;—সে গর্জ্জনে কেহ ভীত হয় নাই, কেহ আনন্দিত হয় নাই, কেহ বিস্মিত হয় নাই। পাতালপ্রবাহিণী, ভৈরবকল্লোলিনী ভোগবতীর তরঙ্গমালার ন্যায়, পাতাল হইতেও অধিক অন্ধকার-পরিপূর্ণ আমার হৃদয়কন্দরে কত প্রবৃত্তি প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু সে প্রবাহ ভোগবতীর ন্যায় মনুষ্যের অদৃশ্য, অন্ধকার-আচ্ছন্ন।

"দশ বৎসর অতীত হইলে সেই অন্ধকাররাশি সহসা আলোকচ্ছটায় চমকিত ও উদ্দীপ্ত হইল।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বক্তা ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। যে কথা বলিতে হইবে তাহা যেন একবার হৃদয় মধ্যে আলোচনা করিয়া লইল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্পন্দনেত্রে সেই অপূর্ব্ব উন্মত্তপ্রায় লোকের দিকে দেখিতে লাগিলেন, অনন্যমনে তাহার গম্ভীর ও উন্মত্ততার কথা শুনিতে লাগিলেন। সেও ক্ষণেক পর আরম্ভ করিল।

"যে সকল প্রবৃত্তিতে আমার হৃদয় দশ বৎসর কাল ব্যথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রেম সর্ব্বাগ্রগণ্য। (সুরেন্দ্রনাথ অধিকতর আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।) সামান্য স্ত্রীলোকের প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম না, যে প্রেম মানব-হৃদয়কে একেবারে পরিপূর্ণ করিতে পারে,—যে প্রেম জীবনের অংশ স্বরূপ, দেহে আত্মার স্বরূপ, যে প্রেম শেষ হইলেই জীবন শেষ হইবে, সেইরূপ প্রেম আমি আকাঙ্ক্ষা করিতাম। কতবার অন্ধকারে বসিয়া সেই প্রেমের কল্পনা করিতাম ; চিন্তাবলে কতবার শূন্য হইতে অলৌকিক স্নেহ-সম্পন্না প্রেমপ্রতিমাকে জাগরিত করিয়া কখন কখন প্রায় এক প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহারই সহিত কাল হরণ

করিতাম, সে কাল্পনিক জগতে যে অনির্ব্বচনীয় অপরিসীম সুখ তাহা এ জগতে কোথায় পাইবেন? সে সুখে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া আমি উন্মত্তপ্রায় হইতাম; সহসা সে জগৎ সুন্দর জলবিম্বের ন্যায় ভিন্ন হইয়া যাইত; প্রেমপ্রতিমা পুনর্ব্বার শূন্যে লীন হইত; কল্পনা-শক্তি শ্রান্ত হইত; আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া আমি সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতাম।

"দিন দিন এইরূপ কল্পনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিবামানে অর্দ্ধেক সময় আমি এ জগতে থাকিতাম না, কাল্পনিক জগতে বিচরণ করিতাম। সে জগতে উজ্জ্বল আকাশ, উজ্জ্বল ক্ষেত্রবৃক্ষ, উজ্জ্বল অট্টালিকা, উজ্জ্বল গৃহদ্রব্যাদি,—তন্মধ্যে সেই উজ্জ্বল প্রেমপ্রতিমা আসীন রহিয়াছেন। নিবিড় কৃষ্ণকেশে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণকান্তি মুখমণ্ডল বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুটী অল্প প্রেমহাস্যে বিস্ফারিত, ভ্রমর-কৃষ্ণ চক্ষু দুটী প্রেমাশ্রুতে পরিপূর্ণ, সমস্ত মুখমণ্ডল প্রেমে ঢল ঢল করিতেছে। সহসা কল্পনাশক্তি ছিন্নতার বীণাসম নীরব হইত। আমিও মূর্চ্ছিত হইতাম।

"সুরেন্দ্রনাথ! কতরূপ যে কল্পনা করিতাম তাহা বলিতে জীবন শেষ হইবে, অদ্য রাত্রির কথা কি? বলিতে আমার কষ্ট হইবে না, কেননা আমার কল্পনাই জীবন, কিন্তু আপনাকে কি জন্য কষ্ট দিব? একটী-মাত্র কথা বলি,—যত কল্পনা করিতাম, নানারূপ ভিন্ন জগতে, ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন অবস্থায় সেই একই প্রেম-প্রতিমা বিরাজ করিত। ক্রমে আমি উন্মত্তপ্রায় হইলাম।

"একদিন নিশাবসানে ঐরূপ কল্পনা ছিন্ন হওয়াতে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া এবং গঙ্গাতীরে ঐ নিকুঞ্জবনে শুইয়া

রহিয়াছি। কতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলাম বলিতে পারি না,—বোধ হইল মস্তকে ও মুখে কে জল সিঞ্চন ও ব্যজন করিতেছেন; বোধ হইল, তুলারাশিতে আমার মস্তক স্থাপিত রহিয়াছে। ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখি,—আপনি বিশ্বাস করিবেন না,—সেই প্রেম-প্রতিমা! যাঁহাকে সহস্রবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম তিনি আমার মস্তক আপন ক্রোড়ে রাখিয়া আমাকে নিঃশব্দে ব্যজন করিতেছেন।"

উভয়েই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। সুরেন্দ্রনাথ এই-রূপ অসম্ভব কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। যদিও আপনি সরলার প্রেমপাশে বদ্ধ ছিলেন তথাপি এ অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বিবেচনা করিলেন, এই নাবিকের কল্পনাশক্তি যেরূপ উত্তেজিত দেখিতেছি, নিশ্চয়ই পরে যে রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই প্রতিমার সহিত পূর্ব্বকার প্রেমচিন্তার যোগ করিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ এইরূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব পুরুষের গাম্ভীর্য্য ও চিন্তার বেগ দেখিয়া কিছু বলিলেন না। সেও অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল—

"সুরেন্দ্রনাথ! আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না। জিজ্ঞাসায় জানিলাম সেই রমণী ব্রাহ্মণকন্যা, ও অবিবাহিতা। পাণিগ্রহণ করিলাম, তাহার পর দুই বৎসর যেরূপ সুখস্বপ্নে অতিবাহিত হইল, সেরূপ পুর্ব্বেও কখন হয় নাই। কিন্তু সে কথা আর কি জন্য বলি? আপনার যেরূপ পবিত্র হৃদয় অবশ্যই পবিত্র প্রেম কাহাকে বলে জানিয়াছেন,—যদি না জানেন শীঘ্রই জানিবেন,—আপনি ভিন্ন অনেকেই পবিত্র প্রেমের

প্রভাব জানিয়াছেন;—কিন্তু আমার মত গাঢ় প্রেম মানবজাতির মধ্যে কেহ কখন জানেন নাই, জানিবেন না।

"ঐ যে নিকুঞ্জবন দেখিতেছেন, ঐ স্থানে আমরা বাস করিতাম। শরৎকালের ঊষা আকাশে যে পবিত্র বর্ণ বিস্তীর্ণ করে, প্রেম আমাদের হৃদয়-আকাশে তদপেক্ষা পবিত্র বর্ণে চিরকালই রঞ্জিত হইয়া থাকিত। সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার যেরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, আমাদের হৃদয়ে প্রেম তদপেক্ষা নিস্তব্ধ, শান্তভাবে বিরাজ করিত। সেই রমণীকে আমি সন্ধ্যা বলিতাম, কেননা, তাহার প্রকৃতি সন্ধ্যার ন্যায় ম্লান, নিস্তব্ধ ও চিন্তাশীল। আমি তাহাকে প্রেমপ্রতিমা বলিতাম, কেননা তাহাকে দেখিবার অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার প্রতিমা আমার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। আমি তাহাকে কুঞ্জবাসিনী বলিতাম, কেননা, ঐ যে কুঞ্জবন দেখিতে পাইতেছেন, ঐ স্থানে"——

আর কথা সরিল না। সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন নাবিক উন্মত্তের ন্যায় সেই কুঞ্জবনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে,—মুখে কোন ভাবই নাই, সংজ্ঞার কোন লক্ষণই নাই। অনতিবিলম্বেই সেই নিস্পন্দ শরীর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ অনেক যত্নে তাহাকে চৈতন্যদান করিলেন। পরে অন্য কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অনেক হইল। দুই ভ্রাতার মত দুইজন এক শয্যায় শয়ন করিলেন, অচিরে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গবিজেতা।

A combination and a form indeed
Where every god did seem to set his seal
To give the world assurance of a man.

Shakespeare.

মুঙ্গেরের প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী প্রশস্ত গৃহে এক বীরপুরুষ উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ইনি ক্ষত্রিয়-কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল।

তাঁহার নিকটে সে সময়ে অধিক লোক নাই, দুই চারিজন অতি বিশ্বাসী যোদ্ধা আসীন ছিলেন। অতি মৃদুস্বরে যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় এক-জন সৈনিক আসিয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল—

"মহারাজ! একজন অশ্বারোহী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক, অনুমতির জন্য দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন"

টোড। "তাঁহার বক্তব্য কি জিজ্ঞাসা কর।"

সৈন্য। "জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—বলিলেন মহা-রাজের সহিত দর্শন ভিন্ন বলিতে পারি না, বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

টোড। "হিন্দু কি মুসলমান?"

সৈন্য। "ব্রাহ্মণতনয়।"

টোড। "কোন দেশীয়?"

সৈন্য। "জন্ম বঙ্গদেশে।"

টোড। "বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণপুত্র,—অথচ অশ্বারোহী! আসিতে দাও।"

সৈনিক পুরুষ অশ্বারোহীকে আনিতে যাইল।

এই অবসরে আমরা পাঠক মহাশয়কে রাজা টোডরমল্লের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

ক্ষত্রিয়কুলাবতংস টোডরমল্লের মত সর্ব্বগুণবিভূষিত বীরপুরুষ কখন ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিতে অনেক পুণ্যাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বীরপ্রসূ ক্ষত্রিয়কুলে অনেক সময়ে অনেক বীরপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এই তিন গুণেই বিভূষিত ছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, ইতিহাসে তাহার অনেক উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। একদা দিল্লীশ্বর আকবরসাহের সহিত পঞ্জাব গমন করিবার সময় দ্রুত ভ্রমণবশতঃ তাঁহার কতকগুলি দেব-প্রতিমা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। টোডরমল্ল প্রাতঃকালে দেবারাধনা না করিয়া কোন কর্ম্মই করিতেন না, জল-গ্রহণও করিতেন না। সুতরাং দেবপ্রতিমা নষ্ট হওয়াতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কোন কার্য্যই করিবেন না ও কয়েক দিন অনাহারে রহিলেন। আকবরসাহ অনেক অনুরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে লওয়াইতে পারিলেন না। আবুল ফজেল প্রভৃতি আক-বরের মুসলমান অমাত্যগণ টোডরমল্লকে "গোঁড়া" হিন্দু বলিয়া সততই নিন্দাবাদ করিত, কিন্তু মহানুভব দিল্লীশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। যখন টোডরমল্ল বৃদ্ধ হইলেন, যখন তাঁহার যশে ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল, যখন তাঁহার পদ ও গৌরব পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল, তিনি সেই পদ ও সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া

গঙ্গাতীরে মানবলীলা সম্বরণ করিবেন এই অভিলাষে দিল্লীশ্বরের অনুমত্যনুসারে রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হরিদ্বার পর্য্যন্ত গমন করেন। ফলতঃ তাঁহার অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ লোক ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে আর দেখা যায় না।

ক্রমান্বয়ে তিনবার বঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজা টোডরমল্ল সাহস ও যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট প্রমাণ দেন। প্রথমবার মনাইম খাঁর ও দ্বিতীয়বার হোসেনকুলীখাঁর অধীনে আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারই সাহসে দুইবারই জয়লাভ হয়। এমন কি প্রথমবার যখন কটকের যুদ্ধে মনাইমখাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন, রাজা টোডরমল্ল অসম্ভব সাহস প্রকাশ করিয়াই জয়লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার, তিনি স্বয়ংই সেনাপতি হইয়া আসিয়াছিলেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, তিনি যেস্থানে যাইয়াছিলেন, সেই স্থানেই অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুজরাট্ প্রদেশে বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে টোডরমল্ল সিংহের মত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধোলকার-যুদ্ধে সেনাপতি ভিজারখাঁ পলায়নতৎপর হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজা টোডরমল্ল তাঁহাকে নিষেধ করিয়া এরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রকাশ করিলেন যে, বিজয়লক্ষ্মী অগত্যা তাঁহারই অঙ্কশায়িনী হইলেন। আকবরসাহের অসংখ্য সেনাপতি ছিল, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে টোডরমল্ল অপেক্ষা কোন সেনাপতিই অধিক বীরত্ব ও সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

আকবরসাহ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজস্ব স্থিরীকরণভার রাজা টোডরমল্লের উপর ন্যস্ত করেন। সেই দুরূহ কর্ম্ম তিনি যেরূপে সম্পন্ন করেন, তাহাতে তাঁহার

সূক্ষ্মবুদ্ধি ও রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যে যে উপায়দ্বারা বঙ্গদেশের উন্নতিসাধন করিয়াছেন তাহার মধ্যে হিন্দুদিগকে পারস্থ ভাষা শিক্ষা দেওয়াই একটী প্রধান। শাসনকর্ত্তাদিগের ভাষা শিখিলে শাসিতদিগের অবশ্যই উন্নতি হইয়া থাকে, এক্ষণে ইংরাজী শিখিয়া আমাদের যেরূপ উন্নতিসাধন হইতেছে, তৎকালে পারস্থ শিখিয়া অনেকাংশে সেইরূপ ফল হইয়াছিল।

রাজা টোডরমল্ল লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতা দারিদ্র্যজনিত যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিয়াও শিশুকে অতি যত্নে লালন পালন করেন। শিশুও অল্প বয়সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রকাশ করেন, ও প্রথমে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়েন। স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবশতঃ এই নীচ কর্ম্ম হইতে তিনি রত্নপরিপূর্ণ আকবরসাহের সভার মধ্যে প্রধান রত্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সমগ্র জীবনচরিত জানিতে চাহেন তাঁহারা ইতিহাস পাঠ করুন।

তাঁহার বঙ্গদেশে প্রথম ও দ্বিতীয়বার আগমনের বৃত্তান্ত, প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার তৃতীয়বার আগমনের কথা বিবৃত হইতেছে।

যদিও টোডরমল্ল অনেকবার বিপদাকীর্ণ রঙ্গক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি এরূপ বিপজ্জালে কখন বেষ্টিত হয়েন নাই। আরববাহাদুর, শরফুদ্দীনহোসেন, মাসুমী কাবুলী প্রভৃতি অনেক বিদ্রোহী ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী, পঞ্চশত হস্তী ও অনেক

রণপোত ও কামান লইয়া মুঙ্গের বেষ্টন করিয়াছিল। টোডরমল্ল যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতিদিগের মধ্যে অনেকই বিদ্রোহী-দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছিল। টোডরমল্ল যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বহির্গত হইলেই তাঁহার সৈন্যের অধিকাংশই শত্রুর সহিত যোগ দিবেক এরূপ আশঙ্কা করিবার বিশেষ কারণ ছিল। বিশেষ মাসুমী ফরঙ্খুদী নামক একজন সেনাপতি সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিবে, রাজা টোডরমল্ল তাহা জানিতেন। এ অবস্থাতে তিনি অগত্যা দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, ও অতিশয় যত্ন ও বুদ্ধিসহকারে দুর্গের আভ্যন্ত-রিক ও বাহ্যিক শত্রুদিগের আচরণ লক্ষ্য করিতে-ছিলেন। দুর্গের ভিতর প্রচুর খাদ্য ও ছিল না, সুতরাং মধ্যে মধ্যে যৎপরোনাস্তি অন্নকষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু এই বিপদরাশিতে বেষ্টিত হইয়াও রাজা টোডরমল্লের অপূর্ব্ব সাহস ও অসাধারণ বুদ্ধি এক মুহূর্ত্তের জন্যও হীনজ্যোতি হয় নাই, বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দিন দিন দুর্গের প্রাচীর দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন; দিন দিন সৈনিকদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন; দিন দিন আপন নৈসর্গিক বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সৈনিক পুরুষ সেই অপরিচিত ব্রাহ্মণপুত্রকে রাজার সম্মুখে আনয়ন করিল। তিনি পাঠকের অপরিচিত নহেন। টোডরমল্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "যুবক! তোমার নাম কি?" যুবক উত্তর করিলেন, "ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা"।

টোড। "নিবাস কোথায়?"

ইন্দ্র। "নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি ইচ্ছাপুর গ্রামে।"

টোড। "তোমার প্রয়োজন কি?"

ইন্দ্র। "অধুনা আপনার অধীনে সৈনিকের কর্ম্ম করা।"

রাজা টোডরমল্ল কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধভাবে যুবকের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। যুবকের আকারে উদারভাব ভিন্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হইল না। ক্ষণেক পর রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

"তুমি ইহার অগ্রে কোথায় কত দিন কর্ম্ম করিয়াছিলে?"

ইন্দ্র। "অদ্যই প্রথম অসি হস্তে করিলাম," বলিয়া কোষ হইতে একবার অসি বাহির করিয়া পুনরায় কোষে রাখিলেন।

সাদীক খাঁ নামক সেনাপতি বলিলেন, "যুবক! তুমি যেরূপ অসি ধারণ করিলে, আমার স্থির বিশ্বাস, যুদ্ধে তোমার হস্তে অসির অপমান হইবে না।"

তারসনখাঁ নামক অপর একজন সেনাপতি মৃদুস্বরে রাজাকে বলিলেন, "যুবক যে অদ্য প্রথমে অসি ধারণ করিয়াছে, আমার কখনই বিশ্বাস হইতেছে না। মহারাজ! এ শত্রুদিগের গুপ্তচর,—ইহাকে জল্লাদ-হস্তে অর্পণ করুন।"

রাজা টোডরমল্ল কাহারও কথায় উত্তর না দিয়া বার বার যুবকের উপর তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকৃতি বা মুখভঙ্গীতে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইলেন না। বিশেষ পরীক্ষার জন্য পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

"তুমি কখনও সৈনিকের কার্য্য কর নাই, তুমি ব্রাহ্মণতনয়, তবে এ কর্ম্ম প্রার্থনা করিতেছ কি জন্য?"

ইন্দ্র। "আমার একটী ভিক্ষা আছে, আপনাকে

প্রভুভক্তি প্রদর্শনে সন্তুষ্ট করিতে পারি, তবে সে ভিক্ষা করিব, এক্ষণে সে ভিক্ষা করা বৃথা হইবে।”

তারসনখাঁ পুনরায় বলিলেন, “মহারাজ! দেখুন আমার কথা সত্য কি না, আপন কার্য্যের কারণ দর্শাইতে অস্বীকৃত হইতেছে।”

ইন্দ্রনাথের উত্তরে রাজা টোডরমল্লের অন্যরূপ বিশ্বাস হইল। তিনি ভাবিলেন গুপ্তচরের কথায়, বা আপন কার্য্যের কারণ দর্শাইতে কখন ত্রুটী হয় না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

“শত্রুরা আমাদের সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহ উত্থাপন করিবার জন্য অনেক চর প্রেরণ করিতেছে। তুমি তাহাদিগের একজন নহ, আমি কিরূপে জানিব?”

ইন্দ্র। “ভদ্র ব্রাহ্মণপুত্রের সত্য কথার উপর বোধ হয় আপনি নির্ভর করি.. পারেন।”

টোড। “অনেক সম.. অভদ্র লোকও ভদ্র লোকের বেশ ধারণ করে; অনেক সময় ভদ্রবংশীয় লোকও কপটাচারী হয়।”

ইন্দ্র। “আমি অনেক পাপ করিয়াছি, কপটাচরণ কখন করি নাই, আমাদের বংশে সে দোষ নাই।” ক্রোধে ইন্দ্রনাথের স্বর বদ্ধ হইল।

সাদীকখাঁ বলিলেন, “মহারাজ! এ লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তাহা হইলে আমি দায়ী হইব, আর কি বলিব। আমাদিগের শিবিরে মাসুমী ফরখুন্দীর ন্যায় লোক আছে,—আর আপনি ইহাকে লইতে সন্দেহ করিতেছেন?”

রাজা ওষ্ঠের উপর একটী অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া সাদীকখাঁর উপর তিরস্কারদৃষ্টি করিলেন। সাদীকখাঁ লজ্জিত হইলেন। রাজা পুনরায় ইন্দ্রনাথকে বলিলেন—

"যুবক! তোমার কথা উদারচেতা বীরপুরুষের ন্যায়, কিন্তু অনেক সময় গভীর খলতা বাহ্যিক ঔদাস্য অবলম্বন করে।"

ইন্দ্রনাথের মুখ ক্রোধে রক্তিমা ধারণ করিল, চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন," যদি আপনার নিকট কপটাচরণ করিবার জন্য আসিয়াছি বিশ্বাস হয়, তবে বিদায় দিন, আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

টোড। "যাও।"

ইন্দ্রনাথ প্রস্থান করিলেন। টোডরমল্ল অবিলম্বে তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া সম্মানপুরঃসর অশ্বারোহীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—◆—

অদৃষ্টপূর্ব্ব বিপদ।

Brutus—Do you know them ?
Lucius—No Sir: their hats are plucked about their ears
And half their faces buried in their cloaks,
That by no means I may discover them
By any mark of favour.
Brutus—Let them enter
They are the factiou. O Conspiracy !
Sham'st thou to shew thy dangerous brow by night,
When evils are most free ? O then by day
Where wilt thou find a cavern dark enough
To hide thy monstrous visage ?

Shakespeare.

এই সম্মান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রনাথ দিনে দিনে অতি সতর্কতা ও প্রভুভক্তি সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যখন যে কার্য্য করিতে রাজা আদেশ দিতেন,

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করিতেন। আপন কায়িক পরিশ্রম বা বিপদ্ বা সময় অসময় কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। একদা রাজার আদেশানুসারে ছদ্ম-বেশে শক্রর শিবির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইলে রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রনাথের পদবৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকে পঞ্চ-শত অশ্বারোহীর সেনানী করিলেন। পরে কথাস্থলে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বৎস ইন্দ্রনাথ তুমি যে এই বয়সে এরূপ নিঃশঙ্ক হইয়াছ, তোমার কি জীবনে কোন সুখ নাই যে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান কর।"

ইন্দ্র। "মহারাজ! যেদিন সৈনিক হইলাম, সেই দিনই রাজকার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, তবে যদি এ যুদ্ধের পরও জীবিত থাকি, তবে সে আপনার আশীর্ব্বাদে আর পিতার পুণ্যবলে।"

টোড। "তোমার পিতা জীবিত আছেন?"

ইন্দ্র। "আছেন।"

টোড। "তোমার ভ্রাতা ভগিনী কয় জন?"

ইন্দ্র। "আমার একজন জ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার কাল হইয়াছে, এক্ষণে আমিই পিতার একমাত্র সন্তান জীবিত আছি।"

টোডরমল্লের মুখ গম্ভীর হইল, বলিলেন, "বৎস, যদি এই যুদ্ধে তোমার নিধন হয়, তবে তোমার পিতার কি মনঃপীড়া হইবে! আমারও পুত্র আছে, সেই জন্যই এই ভাবনা আসিতেছে। ধারুর বয়ঃক্রম তোমারই মত, তাহার সাহস তোমারই মত, তোমারই মত সে বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করে; মরণকে ভয় করে না। যদি সে যুদ্ধে নিধন প্রাপ্ত হয়, তাহার

পিতার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইবে। তথাপি রাজকার্য্যে মরণাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি আছে? তোমার পিতাকে লিখিও যে ধাতুর পরমায়ু শেষ হইলে সে যুদ্ধেই নিহত হয়, ইহা অপেক্ষা টোডরমল্লের বাঞ্ছনীয় আর কিছুই নাই।"

ইন্দ্রনাথ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। টোডরমল্ল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতা ভিন্ন তোমার আর কে প্রিয় বান্ধব আছেন?"

ইন্দ্রনাথের সরলার কথা মনে আসিল। লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন। একবার ভাবিলেন এই সময়ে সরলার কথা সমস্ত অবগত করাইয়া বিচার প্রার্থনা করি; সে কথা মুখে আনিতেছিলেন এমন সময়ে টোডর-মল্ল অন্য কথা আনিলেন, ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য সফল হইল না।

ক্ষণেক পর রাজা প্রস্থান করিলেন, ইন্দ্রনাথও নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আপন শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

যেদিন এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সেইদিনই সেনাদিগের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের বড় কষ্ট হইয়াছিল। অনেক সৈনিক পুরুষ একেই টোডরমল্লের বৈরাচরণ করিবার মানস করিয়াছিল, তাহাতে আবার এই কষ্ট হওয়াতে সুযোগ পাইবার আশা করিয়াছিল। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল এরূপ সতর্কতা ও বুদ্ধিসহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন, যে উপরি উক্ত সৈনিকগণ আপন স্বার্থসাধনের কোন সুযোগই পাইল না। রাজা টোডরমল্ল দিন দিন সৈন্যাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগি-লেন; দিল্লী হইতে অর্থ আসিলেই সেনাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন;

সদর্পে সকলের সম্মুখেই বলিতেন,—“আমরা কখনই জঘন্য পাঠানদিগকে জয়লাভ করিতে দিব না, দিল্লী-শ্বরের অবশ্যই জয় হইবে।” সেনাপতির এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিয়া সৈন্যগণ উৎসাহপরিপূর্ণ হইত। বিরুদ্ধাচারী সৈনিকগণ শিবির মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাইবার কোন সুযোগই না পাইয়া একে একে শত্রুর নিকট পলায়ন করিবার মানস করিল।

শত্রুরাও নিতান্ত জঘন্য বা হীনবল নহে। প্রথম পরিচ্ছেদেই বলা হইয়াছে বঙ্গদেশের সুবাদার মজফর খাঁর নিধন প্রাপ্তির পর সমস্ত বঙ্গদেশ পাঠানসৈন্যে প্লাবিত হয়। যে দেশ টোডরমল্ল ক্রমান্বয়ে দুইবার জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে দিল্লীশ্বরের কণামাত্র স্থল রহিল না। সেই সমগ্র সৈন্য একীকৃত হইয়া মুঙ্গেরের নিকটে আসিয়াছিল, ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে-ছিল। সাগরতরঙ্গের মধ্যে পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সেই পাঠানসৈন্যের সম্মুখে রাজা টোডরমল্ল মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—কিরূপে সেই ক্ষুধাক্লিষ্ট বিদ্রোহোন্মুখ সৈন্য লইয়া সেই শত্রুরাশিকে পরাজয় করিবেন, তাহা টোডরমল্লের বিশ্বাসী সেনাপতিগণও অনুভব করিতে পারিতেন না। কেবলমাত্র রাজা টোডরমল্লই নিঃশঙ্ক-চিত্তে এই বিপদ্‌রাশি সত্ত্বেও বিজয়লাভের স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বিপদ্‌রাশিতে মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্থৈর্য্যের বৈলক্ষণ্য ঘটাইতে পারে নাই।

ইন্দ্রনাথ শিবিরে আসিয়া নানা বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্র খুলিয়া একবার, দুই-বার, তিনবার পাঠ করিলেন; মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি-লেন না। পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল—

"তোমার বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই তুমি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়াছ। আমরাও ঐ পথ অবলম্বন করিব, কেননা যে পতনোন্মুখ গৃহ অগ্রে ত্যাগ করে, সেই বুদ্ধিমান। অদ্য এক প্রহর রজনীতে শ্মশানঘাটে দেখা হইবে।

এ পত্রের কিছুই অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। "ভারতবর্ষে যাহাকে কেহ কৌশলে পরাস্ত করিতে পারে নাই"—সে কে? বোধ হয় রাজা টোডরমল্ল, কিন্তু তাহার চক্ষে ধূলা কে দিয়াছে? পতনোন্মুখ গৃহ কি? ইন্দ্রনাথের বোধ হইতে লাগিল যে, কোন বিদ্রোহী কর্ত্তৃক এই পত্র লিখিত হইয়াছে,—শ্মশান-ঘাটে যাওয়া কি কর্ত্তব্য? ক্ষণেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, যাওয়ায় কোন হানি নাই, বরং কোন গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পাইতেও পারি। নিরূপিত সময় শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কেহই নাই; অসিই তাঁহার এক মাত্র সহায়।

রজনী ঘোর তমসাচ্ছন্ন, আকাশ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন। নীল মেঘ আকাশে উড়িতেছে; এক একখানি করিয়া সেই মেঘ পশ্চিম দিকে রাশীকৃত হইতেছে; সেই পশ্চিম দিক হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ দেখা দিতেছে; বিদ্যুৎ-আলোকে শ্মশানের ভয়ানক বস্তু সকল এক একবার দেখা যাইতেছে। কোথাও কোথাও সম্প্রতি শবদাহ হইয়াছে, ভস্মরাশির মধ্যে অগ্নি এক এক বার দেখা যাইতেছে; কোন স্থানে বা শব এখনও দাহ হই-তেছে; উজ্জ্বল অগ্নিশিখা চারিদিকের নিবিড় অন্ধ-কারকে কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্ত করিতেছে। সেই আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে নানারূপ অপরূপ ছায়া দেখা যাই-

তেছে, নিকটস্থ বৃক্ষরাশির মধ্য দিয়া বায়ুবেগবশতঃ নানারূপ অদ্ভুত শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে। সেই ছায়া দেখিয়া, সেই পৈশাচিক শব্দ শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রনাথের স্বভাবতঃ সাহসী হৃদয়ও এক এক বার স্তম্ভিত হইতেছিল। যত পদচারণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীর ততই কণ্টকিত হইতে লাগিল। কখন কখন দূরে যেন ভয়ানক আকৃতি দেখিতে লাগিলেন, অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই দিকে গমন করিয়া কখনও বা দেখেন ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে, কখনও বা বোধ হয় যেন সেই আকৃতি ধীরে ধীরে যাইয়া বৃক্ষের অন্ধকারে লীন হইতেছে। গগনমণ্ডল ক্রমশঃই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, বায়ু ক্রমশঃই শ্মশান ও বৃক্ষের উপর দিয়া ভীষণতর শব্দ করিয়া বহিতে লাগিল; গঙ্গার তরঙ্গ ক্রমশঃই ভয়ঙ্কর হইতে লাগিল। আকাশে নক্ষত্র মাত্র দৃষ্টিগোচর হইতেছে না. দূরে শিবাগণ মুহুর্মুহু বিকট শব্দ করিতেছে. যেন দূর হইতে প্রেত ও পিশাচের অট্টহাসি শ্রুত হইতেছে।

যে দিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, সেই দিকে যেন বোধ হইল, দুইটা ভীষণ আকৃতি অন্ধকারে দেখা যাইতেছে। ইন্দ্রনাথ তাহা প্রথমে গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু যত বার সেই দিকে নয়নপাত করেন, তত বারই সেই ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইন্দ্রনাথ অসি নিষ্কাশিত করিয়া সেই দিকে আগমন করিলেন; বোধ হইল, যেন সেই আকৃতিদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইয়া যাইল। ইন্দ্রনাথ সে দিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, বোধ হইল, যেন জঙ্গলের ভিতর হইতে অট্টহাসি শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ আবার

ফিরিয়া দেখিলেন, সেই দুই ভীষণ আকৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

"ভগবান্ সহায় হউন!" এই কথা বলিয়া ইন্দ্রনাথ অসিহস্তে ধীরে ধীরে সেই দিকে পুনরায় গমন করিলেন। অতিশয় সতর্কতার সহিত আকৃতিদ্বয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জঙ্গলের নিকটে আসিতে না আসিতে আবার সেই আকৃতিদ্বয় অদৃশ্য হইল। আবার দূর হইতে সেই পৈশাচিক অট্টহাসশব্দ শ্রুত হইল।

"ভগবান্ সহায় হউন!" বলিয়া সেই জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে স্থানে এরূপ নিবিড় অন্ধকার যে, চারি হস্ত দূরে কোন দ্রব্যই লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রনাথের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়াছে; ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইতেছে। সর্ব্ব অঙ্গ, হস্তের অসি পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। সেই হাসির শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। হটাৎ তাঁহার শরীরের উপর যেন কে হস্ত স্থাপন করিল।

ইন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিলেন, প্রেত নহে, তাহারা দুই জন ছদ্মবেশী মনুষ্য। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে বলিল। ইন্দ্রনাথ তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সেই দুই জন মনুষ্যের সহিত অনেকক্ষণ নীরবে যাইতে লাগিলেন। চতুঃপার্শ্বে নিবিড় জঙ্গল ও নিবিড় অন্ধকার; নিঃশব্দে তিন জনে সেই অন্ধকারময় জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে গঙ্গাতীরে এক নিভৃত স্থানে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয় মুখমণ্ডল হইতে আবরণ তুলিয়া লইল, সেই সময়ে বিদ্যুৎ দেখা দিল। বিদ্যুৎ-

অলোকে ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন। হুমায়ুন ও তর্খান নামক রাজা টোডরমল্লের অধীনস্থ দুই জন সেনাপতি।

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"এত রাত্রিতে এই ভয়ঙ্করবেশে এস্থানে আপনারা কি করিতেছেন।"

হুমায়ুন কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "সেনানী ইন্দ্রনাথের সাহস পরীক্ষা করিতেছিলাম।"

ইন্দ্রনাথ ঈষৎ রুষ্ট হইয়া উত্তর দিলেন, "আমি আপনাদিগের নিকট পরীক্ষা দিতে যদি অসম্মত হই।"

হুমায়ুন সেইরূপ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "তাহা হইলে বোধ করিব, আমরা যে অসমসাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, সেনানী ইন্দ্রনাথ তাহা সমাধা করিতে অক্ষম।"

ইন্দ্রনাথ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "কার্য্যকালে ইন্দ্রনাথ অক্ষম কি সক্ষম তাহা অন্য লোক বিবেচনা করিবেন। ভাল শ্মশানভূমিতে পিশাচের সহিত যুদ্ধ করিলে কি সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়? আপনারা পিশাচের রূপ ধারণ করিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন কিজন্য?"

হুমায়ুন আবার সেইরূপ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "সেনানী ইন্দ্রনাথের যে অসাধারণ সাহস আছে, তাহা আমাদের শিবিরে অবিদিত নাই। তাঁহার পৈশাচিক সাহস আছে কিনা তাহারই পরীক্ষা করিতেছিলাম। পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইলে পৈশাচিক সাহস আবশ্যক হয়।"

ইন্দ্রনাথ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পৈশাচিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি?"

হুমায়ুন বলিলেন, "তাহা কি জানেন না? উপহাস

করিতেছেন কেন? আপনি যে কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছেন, আপনি গূঢ়মন্ত্রণায় ও চমৎকার কৌশলে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন সে কার্য্য কি আবার আপনি জানেন না? আপনার কৌশল ও বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছি, রাজা টোডরমল্লকে কেহ বঞ্চনা করিতে পারে নাই, আপনি তাহা করিয়াছেন। আপনি চিরজীবী হউন, এক দিন বঙ্গদেশের গৌরবস্থল হইবেন।"

ইন্দ্রনাথ, বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তর্খান বলিতে লাগিলেন—

"যথার্থই হুমায়ুন ও আমি কতবার অন্তরালে আপনার কৌশলের ধন্যবাদ করিয়াছি। শিবিরে আমাদের মত অনেক জনই বিদ্রোহোন্মুখী সেনানী আছেন। ত্রিংশৎসহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি মাসুমী ফরাঙ্খুদীও বিদ্রোহতৎপর। কিন্তু রাজা টোডরমল্ল আমাদিগের সকলের অন্তরের ভাব জানিয়াছেন, আমাদিগের সকলেরই উপর এরূপ সতর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, আমরা কামনা সিদ্ধ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনি কি কুহকে, কি মহাকৌশলযন্ত্রে যে রাজা টোডরমল্লকে অন্ধ করিয়াছেন, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ধন্য আপনার বুদ্ধিবল!"

ইন্দ্রনাথ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমি যদি আপনাদিগের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিয়া থাকি।"

তর্খান পুনরায় বলিতে লাগিলেন। আর উপহাস করিতেছেন কেন? আমরা কতবার শিবিরে সমবেত হইয়া আপনার প্রশংসা করিয়াছি; কতবার মদ্যপান করিতে করিতে আপনার জয়ধ্বনি করিয়াছি; কতবার মনে মনে অঙ্গীকার করিয়াছি যে, যেদিন আমরা

বিদ্রোহী হইব, সে দিন ইন্দ্রনাথ আমাদের বিদ্রোহ-সেনাপতি হইবেন।”

তর্খান আরও বলিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

“আমি বিদ্রোহী নহি, আপনারা যদি মনে করিয়া থাকেন, আমি গুপ্তচর, কি কপটাচারী, কি বিদ্রোহকামনা করিয়া রাজা টোডরমল্লের অধীনে কর্ম্ম করিতেছি, তাহা হইলে আপনারা ঘোর ভ্রান্তিতে নিমগ্ন হইয়াছেন। আর আপনারা যদি বিদ্রোহী হয়েন, তবে আমাকে বিদায় দিন। আমার সহিত আপনাদিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমি এইক্ষণেই রাজা টোডরমল্লকে সর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইব। কুক্ষণে আমার হস্তে আপনাদিগের লিপি পড়িয়াছিল।”

হুমায়ুন দিউয়ানা ও তর্খান ফার্ম্মিলীর মুখ গম্ভীর হইল, উভয়েই ভাবিতে লাগিল,—“কি আমরা এতদিন কি ভ্রান্ত ছিলাম, মাসুমী ফরাখুদী কি এই হিন্দুর অন্তর বিশেষ জানেন না?” উভয়েই কোষ হইতে খড়্গ বহির্গত করিবার উদ্যম করিলেন। ইন্দ্রনাথও শস্ত্রবিষয়ে অপটু ছিলেন না, কোষ হইতে অসি বহির্গত করিলেন। এমত সময়ে হুমায়ুন সহসা একটু হাসিয়া বলিলেন,—

“বুঝিয়াছি, আপনি বোধ হয়, এখনও আমাদিগকে বিশ্বাস করেন নাই, এই জন্য আমাদিগের নিকট বিদ্রোহমন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে চাহেন না। তাহা সম্ভব বটে, এতদূর মন্ত্রণা গোপন রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলে, রাজা টোডরমল্লকে পরাস্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমাদিগের নিকট অবিশ্বাসের

কিছুই কারণ নাই; আমাদিগের নিকট মন্ত্রণা গুপ্ত করিবার আবশ্যক নাই; আপনি একর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বাবধি আমরা বিদ্রোহোন্মুখ। এই দেখুন, পাঠান-দিগের নিকট হইতে আমরা কয়েকখানি পত্র পাই-য়াছি।”

ইন্দ্রনাথ ক্রোধে ও বিস্ময়ে অন্ধ হইলেন, বলিলেন, “পামর মুসলমান! কাপুরুষ বিদ্রোহি! তোর পাপের সমুচিত দণ্ড দিব। আমার ইচ্ছা হইতেছে, খড়্গাঘাতে তোর শিরশ্ছেদন করি,—কিন্তু শত্রুর সহিত অন্যায় যুদ্ধ করিব না, তোর অসি বাহির কর।”

দুইজনে তুমুল সংগ্রাম হইল। অসির ঝন্‌ঝনাশব্দ সেই নৈশ অন্ধকার বনমধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; গঙ্গাতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ হুমা-য়ুন অপেক্ষা অনেক বলিষ্ঠ ছিলেন ও অল্প দিন মধ্যে চমৎকার অস্ত্রচালন শিক্ষা করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হুমায়ুনের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল; রক্তে শরীর ভাসিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হুমায়ুন ভূতল-শায়ী হইলেন। তখন ইন্দ্রনাথ সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “পামর! এক্ষণে রাজা টোডরমল্লের নিকট যাইয়া কি ক্ষমা প্রার্থনা করিবি? না এই মুহূর্ত্তে তোর শিরশ্ছেদন করিব?”

এ প্রশ্নের উত্তর প্রাপ্ত না হইতেই, তর্খান হঠাৎ পশ্চাৎ দেশে আসিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিল।

যখন প্রথমে ইন্দ্রনাথ ও হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধ হয়, তখন তর্খান কিছু দূরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমেই যুদ্ধ এরূপ ভয়ঙ্কর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল যে, তর্খান ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তের জন্য। যখন দেখিলেন, হুমায়ুন ভূতল-

শায়ী হইয়াছেন, তখন একেবারে লম্ফ দিয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ ফিরিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিতে করিতে হুমায়ুন উঠিয়া পুনরায় অসিহস্ত হইলেন। তিনি নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু একেবারে অক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং দুই জনে একেবারে ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিলেন।

এবার ইন্দ্রনাথের বিষম সঙ্কট উপস্থিত। দুই জনের সহিত এক জনের অসিযুদ্ধ করা সম্ভবে না। বিশেষতঃ তর্খান ও হুমায়ুন অসিচালনে নিতান্ত অপটু ছিলেন না। কেবল হুমায়ুনের কাতরতা ও রজনীর অন্ধকার বশতঃই কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তায় ভীত হইলেন না। এ সকল চিন্তা করিবার তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার অদ্ভুত অস্ত্র-শিক্ষাবশতঃ অনেকক্ষণ একাকী দুইজনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; আশ্চর্য্য কৌশলক্রমে একবার ইহাকে একবার উহাকে প্রহার করেন; তাঁহারাও প্রহৃত হইলেই কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ যাইয়া পুনরায় সম্মুখীন হয়েন। হুমায়ুন যেরূপ কাতরতার সহিত অস্ত্রচালন করিতে-ছিলেন, তাহাতে তিনি যে আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবেন, এমন বোধ হইল না। তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেই ইন্দ্রনাথের জয়।

কিন্তু সে দূরের কথা। যতক্ষণ হুমায়ুন না ক্ষান্ত হয়েন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করা ইন্দ্রনাথের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিল। সহস্র কৌশল থাকাতেও তিনি একাকী দুই জনের সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে পারিলেন না,—কেহই পারে না। অস্ত্রাঘাতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল; রুধিরে অঙ্গ ও বস্ত্র প্লাবিত হইতে লাগিল। শরীররক্ষার্থ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে

এক এক পা করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। রুধিরাক্ত কলেবরে সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিতে করিতে এক এক পা করিয়া পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে; সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছে; ক্রোধে অধর দংশন করাতে অধর হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে; সর্ব্ব অঙ্গ ও বস্ত্র রক্তে প্লাবিত, নয়নে নিমেষ মাত্র নাই; অস্ত্রচালনে মুহূর্ত্ত মাত্র অবকাশ নাই; সমস্ত অবয়ব দেখিলে বোধ হয়, যেন ক্রোধ মূর্ত্তিমান হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে যুদ্ধ করিতেছে।

বিপদ্ একাকী আইসে না। এই বিপত্তির উপর ইন্দ্রনাথের অন্য বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল। হুমায়ুন ক্রমে অবসন্ন শরীর হওয়াতে, শেষে তর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিলেন। তর্খানও সেই অবসরে সতেজে আক্রমণ করিলেন। এক জন দক্ষিণ দিক হইতে ও অন্য জন বাম দিক হইতে আক্রমণ করিলেন। দুই জনের সমকালীন সতেজ আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ হঠাৎ পশ্চাৎ যাইবার মানস করিলেন, ভাবিলেন হঠাৎ পশ্চাৎ যাইলে তাঁহার দুইজন শত্রু পরস্পরের উপর যাইয়া পড়িবে। তখন তিনি গঙ্গার তীরে দণ্ডায়মান ছিলেন, লম্ফ দিয়া যেই পশ্চাতে যাইবেন, অমনি গঙ্গাসলিলে নিপতিত হইলেন। "মাতঃ পৃথিবি! এই বিপত্তিকালে তুমিও স্থান দিলে না"—এইরূপ মনে ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইলেন। তর্খান ও হুমায়ুন ইন্দ্রনাথের মৃত্যু স্থির করিয়া আপন কার্য্যে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অদৃষ্টপূর্ব্ব উদ্ধার।

Prisoner ! pardon youthful fancies ;
Wedded ? If you *can*, say no !
Blessed is and be your consort ;
Hopes I cherished let them go !

Wordsworth.

হুমায়ুন ও ভর্গীন যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা বড় মিথ্যা নহে; ইন্দ্রনাথ যেরূপ আহত হইয়াছিলেন, তাহাতে উত্থানশক্তি ছিল না। সন্তরণ করা দূরে থাক, উচ্চ পাড় হইতে পড়িয়া একেবারে অচেতন হইলেন। ভাগ্যক্রমে নিকটবর্ত্তী একখানি নৌকায় একটী যুবক জাগরিত ছিলেন। মনুষ্যকে জলে পড়িতে দেখিয়া তিনিও জলে ঝাঁপ দিয়া কথঞ্চিৎ মৃতপ্রায় ইন্দ্রনাথের প্রাণ বাঁচাইলেন।

সেই নৌকায় মাঝি মাল্লা সকলেই সুপ্ত ছিল। সেই যুবক একাকী বাহিরে বসিয়া মেঘের ভয়াবহ সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছিলেন। বিদ্যুৎ ও বাত্যায় তাঁহার হৃদয়ে যেন আনন্দ উদ্রেক করিতেছিল; তাঁহার অন্তরের বিদ্যুৎ ও বাত্যা এই প্রকৃতির গর্জ্জন শুনিয়া যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইতেছিল।

অচেতন ভাসমান শরীরকে জলের উপর টানিয়া লইয়া যাওয়া বড় কঠিন নহে,—যুবক ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথকে নৌকার দিকে লইয়া চলিলেন। শেষে আপনি নৌকায় উঠিয়া ইন্দ্রনাথকে তুলিলেন!

ইন্দ্রনাথের শরীরে রক্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। অতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহার শরীর ধৌত করিয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধান করাইলেন। তাহার পর সেই অস্ত্রাঘাতগুলি একে একে পরীক্ষা করিয়া ঔষধি দিতে লাগিলেন; দেখিলেন, যদিও অনেকস্থানে ক্ষত হইয়াছে, তথাপি কোন ক্ষতই গভীর বা সাঙ্ঘাতিক নহে। তাঁহার স্পষ্টই বোধ হইল, সমস্ত রাত্রি উত্তম নিদ্রা হইলে প্রাতঃকালে শরীরে অধিক বেদনা থাকিবে না।

সমস্তরাত্রি উত্তম নিদ্রা হইল। প্রাতঃকালে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিলেন, পার্শ্বে এক পরম সুন্দর যুবক বসিয়া রহিয়াছেন; অনিমেষলোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, ইন্দ্রনাথের বোধ হইল যেন এই সুপুরুষকে কখন দেখিয়াছেন, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছেন, স্মরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—

"যুবক! আপনি আমার প্রাণ দিয়াছেন, আপনি বোধ হয় আমাকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আপনি কে বলুন, কি করিলে এ ঋণ শোধ করিতে পারিব বলুন? আপনি আমার জীবনরক্ষা করিয়াছেন, রাজা টোডরমল্ল কিছুই দিতে অস্বীকৃত হইবেন না।"

যুবক উত্তর করিলেন, "আপনার নিকট অন্য পুরস্কার চাহি না কেবল একটী প্রার্থনা আছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ, আমাকে কি ইহার মধ্যে বিস্মৃত হইয়াছ?" এই কথা বলিয়া বক্তা একটু হাসিলেন।

সে সুমিষ্ট অধরে সে সুমিষ্ট হাসি এখনও ইন্দ্রনাথ বিস্মৃত হয়েন নাই; সে কোকিলনিন্দিত কণ্ঠধ্বনি তিনি এখনও ভুলেন নাই। কাতরতা সত্ত্বেও একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"রমণীরত্ন! ভিক্ষারিণি! আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে বিস্মৃত হইব না। কিন্তু এ পুরুষবেশ"—

ইন্দ্রনাথ আরও কিছু বলিতেছিলেন, কিন্তু ভিক্ষারিণী (পাঠক মহাশয়ের পূর্ব্ব পরিচিতা বিমলা) ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিলেন—

"আমি স্ত্রীলোক এই নৌকায় কেহ জানে না, জানিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে শ্রবণ করুন।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে প্রায় হতজ্ঞান হইয়া সেই রমণীর বদনমণ্ডলের উপর চাহিয়া রহিলেন। সে বদনমণ্ডলের সহসা ভাবান্তর হইল। যে সুহাসিতে চক্ষুর্দ্বয় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল ওষ্ঠদ্বয় মিষ্টতর হইয়াছিল, সে সুহাসি শুকাইয়া যাওয়া মুখ অতিশয় গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। অতি গম্ভীর স্বরে বিমলা বলিতে লাগিলেন—

"ইন্দ্রনাথ! মহেশ্বরমন্দিরে আপনাকে বলিয়াছিলাম যে, আমার দ্বিতীয় একটী ভিক্ষা আছে। এই ক্ষণেই আমার ভিক্ষা দান করিতে আপনি প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সে ভিক্ষা এই, আপনি আমাকে জন্মের মত বিস্মৃত হউন।"

ইন্দ্রনাথ চমকিত হইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন।

"সে ভিক্ষা এই যে, আমি কখন প্রেমদৃষ্টিতে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহা জন্মের মত বিস্মৃত হউন; আমি কখন আপনার দেবমূর্ত্তিকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তাহা জন্মের মত বিস্মৃত হউন।"

ইন্দ্রনাথ এখনও বিস্মিত ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতি রমণীর প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা

ইন্দ্রনাথ অগ্রেই দুই একবার অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু এতদূর হইয়াছে তাহা জানিতেন না। আর এক্ষণই বা সেই প্রেম উচ্ছেদ করিবার যত্ন করিতেছেন কেন? ইন্দ্রনাথ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিমলা আবার বলিতে লাগিলেন—

"আর আমি অভাগিনী! আমার হৃদয়েও আপনার মূর্ত্তি গভীরাঙ্কিত হইয়াছে তাহাও উৎপাটিত করিতে যত্ন করিব,—না পারি হৃদয় উৎপাটন করিয়া জাহ্নবী-জলে নিক্ষেপ করিব।"

ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ অভিপ্রায় কি জন্য হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

বিমলা উত্তর করিলেন. "আমি আপনার প্রণয়ের পত্নী হইব মানস ছিল, প্রণয়ে কাহারও সপত্নী হইবার আকাঙ্ক্ষা করি না। বিধাতা আমার ললাটে দুঃখ লিখিয়াছেন, অন্যের সুখের পথে কাঁটা দিব কি জন্য?

ইন্দ্রনাথের সরলার কথা মনে পড়িল,—তিনি অবাক হইয়া রহিলেন।

সেই দিন প্রাতে শিবিরে রাষ্ট্র হইল যে, হুমায়ুন ও তর্খান পূর্ব্ব রাত্রিতে শিবির পরিত্যাগ করিয়া সসৈন্যে পাঠানদিগের সহিত যোগ দিয়াছেন।

ইন্দ্রনাথ নৌকা হইতে অবরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমলা।

But hawks will rob the tender joys,
  That bless the little lint white's nest
And frost will blight the fairest flowers.
  And love will break the soundest rest,
* * * *

As in the bosom o' the stream,
  The moon-beam dwells at dewy e'en,
So trembling, pure was tender love,
  Within the breast o' bonnie Jean.
And now she works her mammie's work,
  And aye she sighs with care and pain,
Ye wist na what her all might be,
  Or what wad make her weel again.

Burns.

বিমলা কিজন্য সেই অপরূপ পরিচ্ছদে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছিলেন, জানিতে পাঠক মহাশয় উৎসুক হইবেন, কিন্তু সে কথা বলিতে হইলে আমাদের তাহারও পূর্ব্ব কথা লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। সুতরাং ইন্দ্রনাথ যে আশ্রমে সরলাকে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই আশ্রমের কথা লইয়া আমরা আরম্ভ করিব।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি ইচ্ছামতীতীরস্থ মহেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। মন্দিরের মহান্ত প্রায়ই দেবালয়ে থাকে, কিন্তু চন্দ্রশেখর মধ্যে মধ্যে এই পল্লীগ্রামে আসিয়া বাস করিতে ভালবাসিতেন। দেবালয়ের মহান্ত সচরাচর যেরূপ স্বার্থপর ও বিষয়লুব্ধ হইয়া থাকেন, চন্দ্রশেখর সেরূপ ছিলেন না। তিনি অতিশয় নির্ম্মলচরিত্র ছিলেন, ও অনেক অনাথা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাকে এই পল্লীগ্রামে রাখিয়া

ভ্রাতাভগ্নীর মত ব্যবহার করিতেন। দেবালয়ের কার্য্য অন্যান্য বিশ্বস্ত পূজকের হস্তে সমর্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর আপন আশ্রিত কয়েক ঘর লোক লইয়া এই গ্রামে মহাদেব উপাসনা করিতে ভালবাসিতেন, আবার আবশ্যক হইলে স্বয়ংও মহেশ্বরমন্দিরে কার্য্য করিতেন। কমলানাম্নী একটী অনাথা কন্যাকে আপন কন্যা বলিয়া গৃহে রাখিয়া লালনপালন করিতেন। কমলা রহস্য করিয়া এই গ্রামকে আশ্রম বা বনাশ্রম বলিত, সেই অবধি সকলেই ইহাকে বনাশ্রম বলিত। আমরাও তাহাই বলিব। অধুনা এই স্থানে একটী বৃহৎ গ্রাম হইয়াছে তাহার নাম বনগ্রাম। চন্দ্রশেখর যেরূপ নির্ম্মলচরিত্র সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাকে দেখিলে পুরাকালের মুনিঋষির ন্যায় বোধ হইত, তাঁহার গ্রামটীকেও তিনি যথার্থই পুরাকালের আশ্রমের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি অনেক পুরাতন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন ও পুরাতন ঋষিদিগের ন্যায় থাকিতে অভিলাষ করিতেন। কতকগুলি শিষ্যের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিয়া, অনাথা দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিয়া একাকী যাগযজ্ঞ করিয়া জীবন অতি-বাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ও সেই গ্রামকে সর্ব্বাংশে পুরাকালের আশ্রমের ন্যায় করিয়া তুলিয়া-ছিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত। যে যে আশ্রমবাসিগণ কার্য্যো-পলক্ষে দূরে কোথাও যাইয়াছিলেন. তাঁহারা একে একে আশ্রমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন. আশ্রমের শান্ত লতাপাদপের মধ্য হইতে উত্থিত সায়ং-কালের যজ্ঞধূম দেখিতে পাইলেন; দুই একটী কুটীর হইতে সায়ংকালীন প্রদীপালোক দেখিতে পাইলেন।

আশ্রমের মধ্যে সকলই শান্ত, নিস্তব্ধ। স্বচ্ছমনা ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যার উপাসনা আরম্ভ করিতেছেন, কোন কোন ব্রাহ্মণপত্নী গৃহকার্য্য সমাধা করিতেছেন, কেহ কেহ বা শিশুদিগকে সমবেত করিয়া মহাভারতের পুণ্যকথা গল্প করিতেছেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কেহ বা হরিণশিশু লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বা হরিণীর নয়নের সহিত স্বীয় বয়স্যার নয়নের বিশালতা ও চঞ্চলতার উপমা দিতেছেন। নদীতীর হইতে রমণীগণ কলস পূরিয়া জল লইয়া আসিতেছেন; কুটীর-প্রাঙ্গণে হরিণ-হরিণীগণ রোমন্থন করিতেছে।

সন্ধ্যার শঙ্খঘণ্টা ধ্বনিত হইল। সেই ধ্বনি আশ্রমের সহস্র পাদপে প্রতিহত হইয়া গগনমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। প্রদোষকালীয় শঙ্খধ্বনি অপেক্ষা মানব-হৃদয়ে উপাসনা-উত্তেজক আর কিছুই নাই। সেই পবিত্র ধ্বনিতে যোগীদিগের হৃদয়কবাট উদ্ঘাটিত হইল. তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সামগান করিতে লাগিলেন। রোদনপর শিশুকে ক্ষণেক শান্ত করিয়া ব্রাহ্মণপত্নী সেই গীতে যোগ দিলেন, ক্রোড় হইতে কলস নামাইয়া অর্দ্ধপথে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণকন্যা গীত গাইলেন, চঞ্চল হরিণশিশুকে ধান্য দিয়া ক্ষণেক শান্ত করিয়া কিশোরবয়স্কা সেই আরাধনায় তৎপর হইলেন, ক্রীড়াতৎপর বালক ক্ষণেক ক্রীড়ায় ক্ষান্ত হইয়া সেই গান গাইল,—মাতার ক্রোড়ে শিশুও মাতার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই গীতে যোগ দিল। আবাল বৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠনিঃসৃত সেই অনন্ত গীত সায়ংকালের শঙ্খধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। গীত সাঙ্গ হইলে সমস্ত আশ্রম পুনরায় তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল।

সেই সায়ংকালে দুই জন নদীতীরে আসীন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন আমাদিগের পূর্ব্বপরিচিত সরলা, অন্য জনের নাম কমলা।

কমলা অনেক দিন অবধি এই আশ্রমে বাস করিতেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণকন্যা বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। তিনি কাহার দুহিতা, কাহার বনিতা, তাঁহার স্বামীর কত দিন মৃত্যু হইয়াছে, এ সকল কথা কেহ জানিতেন না, জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ক্রন্দন করিতেন সুতরাং কেহ জিজ্ঞাসাও করিতেন না।

কমলার স্বভাব ও আচরণ দেখিয়া আশ্রমবাসিগণ বিস্মিত হইতেন। কমলা সততই শান্ত, অন্যমনস্কা ও চিন্তাশীলা। যেস্থানে আশ্রমপাদপপুঞ্জ অতিশয় নিবিড় ও অন্ধকারময়, যেস্থানে মনুষ্যের শব্দমাত্র নাই, মধ্যাহ্নকালে লোকালয় ত্যাগ করিয়া কমলা সেই নিভৃত স্থানে একাকী চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন, মধ্যাহ্নে অতি মৃদু-নিঃসৃত ঘুঘুর প্রেমগীত শুনিতে ভালবাসিতেন। যেখানে আম্রবৃক্ষের পদ প্রক্ষালন করিয়া ইচ্ছামতী কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইত, গম্ভীর রজনীতে কমলা সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন; নদীর অনন্ত কুল কুল ধ্বনি শুনিতে ভাল বাসিতেন। সে অনন্ত ধ্বনি শুনিতে শুনিতে কমলা যে অনন্ত চিন্তা করিতেন, সে চিন্তা কিসের? কে বলিবে কিসের? চন্দ্রশেখর কমলাকে আপন গৃহে রাখিয়াছিলেন, আপন কন্যার মত যত্ন করিতেন, কিন্তু কমলা গৃহে থাকিবার সময় সর্ব্বদাই অন্যমনস্কা হইয়া থাকিতেন, অন্যের সহিত কথা কহিতে কহিতে কখন কখন চিন্তায় মগ্ন হইতেন, তাহাতে লোকে হাসিলে আবার লজ্জিত হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিতেন।

সে কথাবার্ত্তা কি মধুর, কি ভাবপরিপূর্ণ! শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত।

কমলা নিরুপমা সুন্দরী। তাঁহার নয়ন দুটি অতিশয় প্রশস্ত শান্তজ্যোতিঃ ও চিন্তাপ্রকাশক, সমস্ত মুখখানি শান্ত ও গাঢ় চিন্তায় ম্লান। দেহ অতি সুকুমার, বিধবার মলিন বস্ত্রে সে সুকুমার দেহ আবৃত হইয়া শৈবাল-বেষ্টিত পদ্মবৎ শোভা পাইত; কিন্তু সে প্রস্ফুটিত পদ্ম নহে,—সায়ংকালে মুদিতপ্রায় পদ্ম যেরূপ জল-হিল্লোলে ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়াতে যেরূপ ধ্যাননিমগ্নের ন্যায় দেখায়, এই কোমলাঙ্গী তপস্বিনী সেইরূপ সতত চিন্তায় মগ্ন, লোকালয়ে সেইরূপ মুদিতপ্রায় হইয়া থাকিতেন। কমলা চন্দ্রশেখরকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন, চন্দ্রশেখরের গৃহকার্য্য সমস্ত তিনিই নির্ব্বাহ করিতেন—কার্য্যে অবসর পাইলেই আবার সেই নিভৃত, নিবিড় পাদপ-আবৃত স্থানে যাইতেন। শিখণ্ডিবাহন তাঁহাকে উপ-হাস করিয়া বনদেবী বলিয়া সম্বোধন করিতেন,—তদনুসারে আশ্রমের অনেকেই কমলাকে বনদেবী বলিয়া ডাকিত। ফলতঃ, তিনি যেরূপ একাকী বনে বনে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তাহাতে তাঁহাকে সেই শান্ত পবিত্র ছায়ান্বিত আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বোধ করা কিছুই বিচিত্র নহে।

অদ্য সন্ধ্যার সময় কমলা সরলাকে লইয়া বনবিচরণ করিতেছিলেন,—এক্ষণে দুই জনে নদীতীরে বসিয়া রহিয়াছেন। কমলা সরলাকে ভালবাসিতেন,—সে সরলচিত্ত বালিকাকে না ভালবাসিয়া কে থাকিতে পারে? সরলাও কমলার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করি-তেন,—আপনার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সেই বিধবার দুঃখে

দুঃখী হইতেন—সুতরাং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের মধ্যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল।

পাঠক মহাশয়, জিজ্ঞাসা করিবেন, সরলার আবার দুঃখ কি? বালিকার হৃদয়ে চিন্তা কিসের? আমরা উত্তর করিব সরলা আর বালিকা নাই,—হৃদয়কোরকে প্রণয়কীট প্রবেশ করিয়াছে।

যেদিন হইতে ইন্দ্রনাথ সরলার নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে প্রণয় কাহাকে বলে সরলা বুঝিল, চিন্তা কাহাকে বলে বুঝিল। সরলা এখনও পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহময়ী কন্যা, কিন্তু এক্ষণে মাতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে করিতে সততই আর একজনের কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত, আর একখানি মুখ মনে পড়িত। এখনও সরলা পূর্ব্বের ন্যায় পরিশ্রম করিত, কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সহসা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, মধ্যে মধ্যে সহসা চক্ষে জল আসিত। লজ্জায় অশ্রু মুছিয়া আবার কার্য্যে নিযুক্ত হইত, আবার ধীরে ধীরে চক্ষে জল আসিত। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে চক্ষুদ্বয় পরিপূর্ণ হইত,—ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই জলে মুখখানি সিক্ত হইত। সে বালিকার মুখে সে জল দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

চিন্তা কি? সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার উত্তর দিতে পারিত না,—কিন্তু আমরা অনুভব করিতে পারি। রুদ্রপুরে পূর্ণচন্দ্রালোকে যে দেবমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম আবার কি সে মূর্ত্তি দেখিতে পাইব? যাঁহার কণ্ঠে একবার লীলাক্রমে মালা দিয়াছিলাম, তাঁহাকে কি আবার দেখিতে পাইব? হৃদয়ের ইন্দ্রনাথকে আবার কি দেখিতে পাইব। এইচিন্তা করিতে করিতে সরলা কার্য্যকর্ম্ম ভুলিয়া যাইত, চারিদিক শূন্য দেখিত। জ্ঞান-

চক্ষে সেই রুদ্রপুরের কুটীর দেখিতে পাইত,—সেই কুটী-রের পার্শ্বে সেই উদ্যান,—সে উদ্যানে সেই পুষ্পচারা, উপরে পূর্ণচন্দ্র,—সেই পুষ্পচারার মধ্যে সেই চন্দ্রা-লোকে সেই হৃদয়ের ইন্দ্রনাথ,—সহসা নয়নজলে সর-লার মুখখানি প্লাবিত হইয়া যাইত।

আবার চক্ষু মুছিয়া কার্য্য করিতে বসিত, আবার কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে চিন্তা আসিত। সন্ধ্যার সময় ছায়া যেমন ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে গগনমণ্ডল ও পৃথিবী আচ্ছন্ন করে,—প্রণয়চিন্তাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অতি ধীরে ধীরে সরলার হৃদয় আচ্ছন্ন করিত। ভাবিত একবার যদি তাঁহার দেখা পাই,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও যদি তাঁহার দেখা পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে বলি,—কি বলি?—না কিছু বলি না,—তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে আমার জ্বলন্ত হৃদয় স্থাপন করিয়া তাঁহার স্কন্ধে আমার মস্তক স্থাপন করিয়া একবার মনের সাধে ক্রন্দন করিয়া স্বর্গসুখ লাভ করি। অভাগিনী একবার ক্রন্দন ভিন্ন আর কিছু চাহে না।

আবার চিন্তা আসিত। একবার কি ইন্দ্রনাথের সহিত দেখা হইবে না? অবশ্য হইবে; কিন্তু সে কবে হইবে? এক্ষণেই দেখা হয় না কেন? ইন্দ্রনাথ আসিতেছেন না কেন? তিনি কি সরলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? সর-লার চক্ষে আবার জল আসিল। ইন্দ্রনাথ কুশলে আছেন ত? নয়নজলে মুখখানি প্লাবিত হইয়া যাইল!

বালিকা প্রেমের কথা কাহাকেও বলিত না, যে পাবকে হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল সে পাবক কাহাকেও দেখাইত না, নীরবে অবারিত অশ্রুবারি দ্বারা সেই পাবক নির্ব্বাণ করিতে চাহিত, ব্যাধবিদ্ধকপোতীর ন্যায় নীরবে নিভৃত নিকুঞ্জ বনে যাতনা সহ্য করিত। আর আশ্রমবাসিগণ—

হায়! তাহাদিগের মধ্যে কয়জন সরলার যাতনা বুঝিত? ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়া কর্ম্মেই ব্যস্ত, সরলচিত্ত ব্রাহ্মণকন্যাগণ সরলার পীড়ার কিছুই বুঝিত না, সরলাকে কাতর দেখিলে দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "সরলা! অদ্য তোমাকে এরূপ ম্লান দেখিতেছি,—কোন অসুখ ত হয় নাই? কোন কষ্ট হইয়াছে? কি মনে কোন দুঃখ কি ভাবনা হইয়াছে?" এরূপ প্রশ্নে সরলা অধিকতর লজ্জিত হইত,—সে স্থান হইতে প্রস্থান করিত। এমন বিপত্তির সময় তাহার হৃদয়ের অমলা কোথায়? স্নেহগর্ভ বাক্যে হৃদয় শান্ত করিবে, মিষ্ট হাস্য দ্বারা ভাবনা দূর করিবে, এমন অমলা কোথায়?

আশ্রমের মধ্যে এক জন মাত্র সরলার মনের ভাব বুঝিয়াছিল। কমলা সরলাকে কখন কখন আপনার সঙ্গে নিস্তব্ধ নদীকূলে, সুস্নিগ্ধ ছায়াবৃত বৃক্ষতলে লইয়া যাইতেন, সান্ত্বনা করিতেন, আপনার চিন্তার ভাগিনী করিতেন; পবিত্র প্রেমের কথা বলিতেন; দুঃখের কথা বলিতেন; সহিষ্ণুতার কথা বলিতেন: সরলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন, কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতেন। সরলা সেই গল্প শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখ ভুলিয়া যাইত; সেই মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আপন দুঃখ দূর করিত। যেরূপ জনশূন্য স্থানে যাইতে তাহারে ভয় করিত, চিন্তাশীলা কমলার সঙ্গে সে সকল স্থানেও যাইত, যেরূপ গভীর ভাবময় চিন্তা তাহার বালিকাহৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই, ভাবিনী কমলার নিকট তাহাও শুনিত। ফলতঃ দুই জনে একত্র হইলে কমলা আপনার হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া বালিকার নিকট নানারূপ হৃদয়গ্রাহী কথা ও গল্প করিতেন ও অন্তরের নানারূপ গভীর তলচারী ভাব প্রকাশ করি-

তেন। সরলা বালিকার মত একমনে সেই সমুদয় শুনিত;—সে ভাব তাহার বড় ভাল লাগিত; সে হৃদয়গ্রাহী কথা শুনিতে শুনিতে আপন দুঃখকথা বিস্মৃত হইত।

আজি সন্ধ্যার সময় তাঁহারা দুই জনে নদীতীরে বসিয়া আছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কে বল দেখি?

Manfred—Oblivion, self oblivion :——
Byron.

কমলা বলিলেন—"সরলা।"

সরলা উত্তর না করিয়া কমলার মুখের দিকে চাহিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাকে এত ম্লান দেখিতেছি কেন?"

সরলা মুখখানি নত করিল।

কমলা দেখিলেন আজ দুঃখবেগ প্রবল হইয়াছে। স্নেহ সহকারে সরলার নিকটে বসিয়া সরলার হস্ত আপন হস্তে ধারণ করিলেন, পরে স্নেহগর্ভবচনে নানা প্রসঙ্গের কথা আনাতে সরলার মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"ভগিনি! পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা হতভাগিনী আছে। তোমার স্নেহময়ী মাতা আছেন, জগৎ-সংসারে থাকিবার স্থান আছে, হৃদয়েশ্বর জীবিত আছেন, তোমার আশা-ভরসা সকলই আছে। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ হতভাগিনী আছে যাহার কিছুমাত্র

নাই, যাহার ভবিষ্যতের আশা নাই, অতীতের স্মৃতি নাই, ইহজন্মে কেহ নাই, সংসারে সুখ নাই, কেবল অতুল চিন্তাজলে ভাসিতেছে।"

সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইল, বলিল, "দিদি, তোমার কথা ভাবিলে আমি আপন দুঃখ ভুলিয়া যাই, তুমি কিরূপে এত সহ্য কর ?"

কম। "বিধাতা সহ্য করিবার জন্যই নারীজন্ম দিয়াছেন। পুরুষে যত সহ্য করিবে আমরা তাহার দশ গুণ সহ্য করিব।"

সর। "যদি না পারি ?"

কম। "তবে নারীজন্ম গ্রহণ করিলে কেন ?—দেখ মনুষ্যের মানসম্ভ্রম আছে, ধনসম্পত্তি আছে, কুলমর্য্যাদা আছে, নামগৌরব আছে, জীবনের সহস্র ভিন্ন ভিন্ন অবলম্বন আছে, সহস্র সুখের কারণ আছে, একটী না হইলে অন্যটী অন্বেষণ করিতে পারে, সেটী না পাইলে অপর একটী অনুসন্ধান করে, সেই অনুসন্ধানে জীবন স্বপ্নবৎ অতিবাহিত হয়। চেষ্টা সফল হউক বা না হউক, যতদিন চেষ্টা থাকে, যতদিন আশা থাকে, ততদিন জীবন দুর্ব্বহণীয় হয় না। আর আশা নাই কোন্ মনুষ্যের? যুবকের প্রেম, উচ্চাভিলাষ, মান, সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা; বৃদ্ধের ধন-কামনা, পুত্র-কামনা, বংশবৃদ্ধি-কামনা, সহস্র কামনা, সহস্র আকাঙ্ক্ষা[illegible]বন অতিবাহিত হয়। আর অভাগিনী নারীকুলের কি আছে ?"

কমলা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইলেন। সরলার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, সরলা একাগ্রচিত্তে শুনিতেছে আর তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন আবার বলিতে লাগিলেন—

"অভাগিনী নারীকুলের কি আছে? সংসার স্বরূপ অপার-অগাধ-সমুদ্রে তাহাদিগের একটীমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তরী আছে,—সেটী প্রেম। সেই প্রেমের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা অপার সংসারে আইসে, যদি সেই তরীটী ডুবিল, তবে নারীর আর অবলম্বন নাই, আর সুখের কারণ নাই, আর আশা নাই, আর ভরসা নাই, অতল জলে সন্তরণ ভিন্ন আর উপায় নাই।"

সরলা বলিল,—"আমার বোধ হয়, দিদি তুমি বড় দুঃখিনী, কেননা তোমার কেহই নাই, জগতে আশাও নাই।"

কমলা উত্তর করিলেন,

"তথাপি সরলা, আমি দুঃখিনী নহি। চিন্তাবলে আমি সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতে শিখিয়াছি,—চিন্তাই আমার জীবন স্বরূপ হইয়াছে। ঐ যে গলিত বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মরশব্দ শুনিতে পাইতেছ, মধ্যাহ্নে যখন ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া ঐ মর্ম্মরশব্দ শ্রবণ করি, আর ঘুঘুর মৃদুনিঃসৃত প্রেমগীত শ্রবণ করি তখন আমার হৃদয় শান্তিরসে পরিপূরিত হইতে থাকে। ঐ যে আকাশে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র যাইতেছে দেখিতেছ, ক্ষণেকমাত্র ঈষৎ অন্ধকার করিয়া আবার পরিষ্কার নীল গগনমণ্ডলে বাহির হইয়া আপন জ্যোতিঃ বিস্তার করিতেছে; ঐ চন্দ্র ও ঐ আকা-শের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি নিরুপম শান্তি লাভ করি; প্রকৃতির শান্তি ও নিস্তব্ধতা অনুকরণ করিয়া আমার হৃদয়ও শান্তি ও নিস্তব্ধতা গ্রহণ করে। এই সকল দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে অনন্ত, অপরিসীম, অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদ্রেক হয় তাহা

আর কি বলিব, সেই সকল ভাবেই আমাকে পাগলিনী করিয়াছে,—উদাসিনী করিয়াছে। আমি এ সংসারে নাই—যে স্থানে স্বভাবের অনন্ত মহিমা বিরাজ করিতেছে, আমার মন সততই সেই স্থানে বিচরণ করিতেছে।”

সরলা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—“দিদি, তোমার পূর্ব্বকথা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা করে।”

কমলা বলিলেন, “সরলা তুমিও আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে? আশ্রমবাসিদিগের নিকট আমি কিছুই বলি না, কিন্তু ভগিনি! তোমার নিকট আমার লুকাইবার কিছুই নাই; আমি সত্য সত্য বলিতেছি, আমার জীবন কোন অপরূপ মোহজালে জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমি ভেদ করিতে পারি না,—আমার কিছু মাত্র স্মরণ নাই।”

সরলা আশ্চর্য্য হইল,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কিছুই মনে নাই? তোমার বাড়ি কোথায়?”

কম। “স্মরণ নাই।”

সর। “তোমার পিতার নাম কি?”

কম। “স্মরণ নাই।”

সর। “তোমার বিবাহ হইয়াছিল কোথায়?”

কম। “স্মরণ নাই।”

সর। “তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় কবে, কিরূপে?”

কম। “স্মরণ নাই।”

সরলা বিস্মিত হইল। অন্য কেহ হইলে ভাবিত কমলা মিথ্যাকথা কহিতেছে। কিন্তু সরলার মনে সে ভাব উদয় হয় নাই। যাঁহাকে জ্যেষ্ঠার মত ভালবাসিত, তিনি যে মিথ্যাকথা কহিতেছেন, এরূপ বিশ্বাস সরলার হৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই; অথচ জীবনের

সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়াছেন ইহাও বিশ্বাস করা সহজ নহে; সরলা সত্য সত্যই ভাবিলেন কমলার জীবন কোন মন্ত্রজালে জড়িত, হতভাগিনী কোন ভীষণ শাপে অভিশপ্ত।

কমলা ক্ষণেক পর বলিতে লাগিলেন, "আমার কেবল এইমাত্র স্মরণ আছে যে, কিছুদিন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম, হৃদয়ে অতিশয় বেদনা বোধ করিয়াছিলাম, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলাম। সেই পীড়ার সময় স্বপ্নে একটী দেবমূর্ত্তি দেখিতাম। বোধ হইত যেন অপরিসীম নীল আকাশের মধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বল একটী ক্ষুদ্র অতি শুভ্র মেঘখণ্ডে সেই দেবমূর্ত্তি বসিয়া রহিয়াছেন। একবার বোধ করিতাম তিনি ইন্দ্রদেব, কিন্তু তাঁহার গলায় যজ্ঞোপবীত, হস্তে নৌকার দাঁড়,—সেই দাঁড় দিয়া যেন সেই মেঘখানিকে গগনসাগরের মধ্যে সঞ্চালন করিতেছেন। মহাদেবের হস্তে ত্রিশূল থাকে, নারায়ণের হস্তে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম থাকে, দাঁড় কোন্ দেবের হস্তে থাকে আমি জানি না।— আশ্রমবাসী কেহ আমাকে বলিতে পারেন না। যাহা হউক, সেই ভীষণ পীড়া হইতে যখন আমি আরোগ্য লাভ করিলাম, লোকে বলিল, আমি বিধবা হইয়াছি। কিন্তু তখন আর পূর্ব্বকথা কিছুমাত্র মনে ছিল না,— স্বামীর কথা কিছুমাত্র মনে ছিল না, বৈধব্য যাতনাও কিছুমাত্র বোধ করি নাই।"

সরলা অধিকতম বিস্মিত হইল,—সে অপরূপ কথা শুনিয়া যেন কিছু ভয়েরও সঞ্চার হইল। আশ্রমবাসিগণ উপহাস করিয়া কমলাকে "বনদেবী" বলিত, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া সরলার যেন যথার্থই বোধ হইতে লাগিল, তিনি মানুষী নহেন, কোন দেবী হই-

বেন। অতিশয় শোকে যে স্মরণশক্তি এত দূর বিনাশ হয় তাহা সরলা অনুভব করিতে পারিত না। ক্ষণেক পর সরলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"তাহার পর এ আশ্রমে আসিলে কি প্রকারে?—

কমলা উত্তর করিলেন, "যখন আমি ঘোরতর পীড়া সহ্য করিতেছিলাম, তখন সকল লোকেই স্থির করিয়াছিল যে, আমি আর বাঁচিব না। পিতা চন্দ্রশেখর সেই সময়ে তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েন। পিতার দয়ার শরীর তিনিই আমাকে যত্ন করিতে লাগিলেন। সে স্থানে আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহই ছিল না। নিরাশ্রয় বিধবাকে পিতা আশ্রয় দান করিয়া আপন নৌকায় তুলিলেন। তখনও আমার ঘোর পীড়া, গ্রামের সকলেই স্থির করিল যে নৌকাতেই আমার কাল হইবে। অনেক দিন জলপথে আসিতে লাগিলাম, নদীর স্বাস্থ্যজনক বায়ুতে আর পিতার যত্নে আমি পুনরায় আরোগ্যলাভ করিলাম, সংজ্ঞালাভ করিলাম;—কিন্তু পূর্ব্বকথার স্মৃতি আর লাভ করিলাম না,—আমি কে, কাহার দুহিতা, কাহার স্ত্রী কিছুই জানিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিবার কিছু দিন পরেই নৌকা আসিয়া এই আশ্রমের ঘাটে লাগিল,—সেই অবধি আমি পিতার গৃহেই রহিয়াছি।"

শুনিতে শুনিতে সরলার চক্ষে জল আসিল। সরলা ধীরে ধীরে কমলার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিল;—"দিদি, আমি আর আপনার জন্য দুঃখ করিব না, তোমার এ সংসারে কিছু নাই, কেহই নাই সেই জন্য আমার দুঃখ হইতেছে।" পরদুঃখে সরলার সরল হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছিল।

কমলা উত্তর করিলেন, "ভগিনি! আমার জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। স্মৃতি আমাদের দুঃখের কারণ; যাহার স্মৃতি নাই তাহার দুঃখ কি? আমার যদি পিতার কথা মনে থাকিত, স্বামীর কথা মনে থাকিত, তাহা হইলে কি আমি জীবন ধারণ করিতে পারিতাম? এখন আমি বালিকার মত সংসারচিন্তাশূন্য হইয়া এই বনে বিচরণ করি, নানারূপ অপার্থিব চিন্তায় সুখলাভ করি, প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি। প্রকৃতিই আমার পিতাস্বরূপ, প্রকৃতিই আমার স্বামী-স্থানীয়। ইহা ভিন্ন অন্য স্বামী বা অন্য পিতা আমি জানি না।"

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইতে চলিল, আকাশ ক্রমশঃ মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চন্দ্র মেঘের ভিতর লুকাইলেন, মেঘরাশিও ক্রমে ক্রমে গভীর নীলবর্ণ ধারণ করিল। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিদ্যুৎ দেখা যাইতে লাগিল, ও অল্প অল্প বায়ু বহিতে লাগিল। সরলা কুটীরে যাইবার জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু কমলা স্থিরনয়নে সেই নীল মেঘরাশির দিকে দেখিতে লাগিলেন, স্থিরচিত্তে সেই নিবিড় বনের ভিতর সেই বায়ুর শব্দ শুনিতে লাগিলেন। হর্ষোৎফুল্ললোচনে তিনি সরলাকে সেই বিদ্যুতালোক দেখাইতে লাগিলেন, ইচ্ছামতীর ফেনচূড় তরঙ্গমালা দেখাইতে লাগিলেন। সরলা অগত্যা তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পশ্চাৎ হইতে এক জন লোক আসিয়া সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কে বল দেখি?"

সরলা সে স্বর চিনিত, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল না; একে একে আশ্রমবাসিনী সঙ্গিনীদিগের নাম করিতে লাগিল।

"নিস্তারিণী"—চক্ষু হইতে হস্ত উঠিল না,
"মনোমোহিনী"—তথাপি হস্ত উঠিল না,
"যোগেন্দ্রমোহিনী"—তবু হইল না,
"তারা"—

"তোর মাথা,—আমাকে ইহার মধ্যেই ভুলেছিস,—তবু এখনও বিবাহ হয় নাই, না জানি বিবাহের জল গায়ে লাগিলে কি হইবে"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সরলার প্রিয় সই অমলা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সরলার বিস্ময়ের সীমা থাকিল না—"সই?" "এখানে?" "কবে আসিলে?"—আর মুখ দিয়া কথা সরিল না। সরলার বিস্ময় ক্ষণকাল স্থায়ীমাত্র,—অনেকদিন পরে দুঃখের সময় প্রাণের সইকে পাইয়া সরলার হৃদয় আনন্দে প্লাবিত হইল, সে অপার আনন্দ হৃদয়ে স্থান পাইল না, উথলিয়া পড়িতে লাগিল। বাষ্পপরিপূর্ণলোচনে সরলা অমলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার বক্ষে আপন মুখ লুকাইল। অমলাও যখন অনেকদিন পরে সেই প্রেম-পুত্তলীটীকে হৃদয়ে স্থান দিল, তখন তাহার চক্ষু নিতান্ত শুষ্ক ছিল না।

ক্ষণেক পর অমলা বলিল, "এই দুই প্রহর রাত্রিতে এই অন্ধকারে এখানে বসিয়া আছ? আমি যে তোমার জন্য আশ্রমে কত অন্বেষণ করিয়াছি বলিতে পারি না।"

সর। "এখানে কমলার সহিত আসিয়াছি,কথায় কথায় রাত্রি অধিক হইয়াছে। সই তুমি অদ্য আসিলে?"

অম। "হাঁ, আমি আজই আসিয়াছি, তোমাকে দেখিবার জন্য কতদিন আসিব আসিব মনে করি, তা "বৃদ্ধ স্বামী" কি আমাকে ছাড়ে! আজ কত করিয়া তবে আসিলাম। তুমি আশ্রমে নূতন নূতন বন্ধু পাইয়া তোমার পুরাতন সইকে ভুলে যাও নাই ত?"

সর। "না সই, আমি রাত্রিদিন তোমার কথাই চিন্তা করি, আর সেই"—সরলা হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া মুখ অবনত করিল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি অমলার মনে সন্দেহ হইল,—সরলার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া তাহার ম্লান ও প্রফুল্লতাশূন্য মুখমণ্ডল ও কোটরপ্রবৃষ্ট নয়ন দুইটী দেখিয়া অমলার সন্দেহ গাঢ় হইল। ধীরে ধীরে সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দিনরাত্রি আর কাহার চিন্তা কর সই?"

সরলা মুখ অবনত করিয়া রহিল,—অমলা নিশ্চয় জানিল কোরকে কীট প্রবেশ করিয়াছে। অমলার মুখ গম্ভীর হইল,—পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"ছি! সইয়ের নিকট তুমি আবার কথা লুকাইতেছ,—তবে বুঝি আমাকে ভালবাস না?"

সর। "হাঁ, সই ভালবাসি।"

অম। "তবে বল কোন্ পুরুষের চিন্তা দিনরাত্রি তোমার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে?"

সরলা আবার নিস্তব্ধ হইল। অমলার নিকট কখনও কোন কথা লুকায় নাই, লুকাইতে পারেও না, অথচ সে প্রিয় নামটী মুখে আসিয়াও বহির্গত হইতেছে না। লজ্জায় সরলার মুখ রুদ্ধ হইয়াছে।

সরলার অন্তরে যে যাতনা হইতেছিল, অমলা তাহা বুঝিল। বুঝিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—

"আচ্ছা তাঁহাকে কি আমি চিনি?"

সরলা অতি মৃদু, অপরিস্ফুটস্বরে বলিল—"হাঁ।"

অমলা মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিয়া বলিল, "তবে ইন্দ্রনাথ?" এবার সরলাকে আর উত্তর করিতে হইল না। সে প্রিয় নামটী শুনিয়া সরলা শিহরিয়া উঠিল। অমলা বুঝিল ঠিক অনুভব করিয়াছি।

অমলা নিস্তব্ধ হইয়া ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিল। পৃথিবীর মধ্যে এরূপ একজন লোক ছিল না, যাহাকে অমলা সরলা অপেক্ষা ভাল বাসিত,—সেই সরলা আজ অপার প্রেমসাগরে ভাসিতেছে। সে সাগরের কি কূল আছে? যদি থাকে, বালিকা কি সে কূল প্রাপ্ত হইতে পারিবে? অমলা মনে মনে বলিল, "বিধাতঃ, আমি আপনার জন্য কোন ভিক্ষা চাহি না,—তুমি এই বালিকার প্রতি সদয় হও, আমার প্রাণের সইকে রক্ষা কর।"

ক্ষণেক পর অমলা, চিন্তাবেগ সম্বরণ ও আপন নৈসর্গিক প্রফুল্লতা ধারণ করিয়া সরলাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। বলিল—"তা চিন্তা কি জন্য? শুনিয়াছি ইন্দ্রনাথ পশ্চিমে গিয়াছেন। তথা হইতে বোধ হয় শীঘ্রই আসিবেন। তোমার মাতাও বোধ হয় এ বিবাহে অসম্মত হইবেন না, আর ইন্দ্রনাথ একটু পাগলের মত হউক, ছেলে ভাল। তোমার মনের কথা ইন্দ্রনাথ জানেন?"

সর। "জানেন।"

অম। "তিনি সম্মত আছেন?"

সর। "আছেন।"

অম। "ঘরে ঘরে বর দেখা কন্যা দেখা হইয়া গিয়াছে বুঝি,—আমরা ইহার কিছু জানি না?"

সরলা লজ্জিত হইল।

অমলা আবার বলিতে লাগিল, "সইয়ের মনে এত আছে তা কে জানে বল। আমি ভাবি সই আমার বালিকা! ইহার ভিতর এত কাণ্ড কে জানে বল? তা বরটীকে মনে ধরিয়াছে?"

সরলা অধিকতর লজ্জিত হইল,—অথচ ইন্দ্রনাথের

কথা হইতেছে বলিয়া তাহার হৃদয়ে আনন্দলহরী উথ-লিয়া পড়িতেছিল।

অমলা আবার বলিতে লাগিল—"আর কন্যাটী কত বরের মনে অবশ্যই ধরিবে,—এ সোণার মুখ দেখিলে কাহার হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার না হয়? আমি যদি পুরুষ-মানুষ হইতাম, আর যদি ব্রাহ্মণের ছেলে হইতাম, তাহা হইলে তোকে দেখিয়া পাগল হইয়া যাইতাম"—এই বলিয়া অমলা সরলার অবনত মুখখানি ধীরে ধীরে তুলিয়া তাহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সক-লেই আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

অতিথিদ্বয়।

And wherefore do the poor complain,
The rich man asked of me,
* * * *
You asked me why the poor complain,
And these have answered thee,

Southey.

যখন সরলা ও অমলার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎ হইল তখন কমলা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে আশ্রমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু সমান ও সরল পথ দিয়া না যাইয়া বন্ধুর, বক্র ইচ্ছামতী-তীর দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইচ্ছামতীর তরঙ্গমালা মেঘা-চ্ছন্ন আকাশের ভয়াবহ সৌন্দর্য্য অনুকরণ করিতেছে;

ভীষণ উচ্ছ্বাসে ক্রীড়া করিতেছে ;—ফেণরাশিতে আবৃত হইয়া সুবর্ণরৌপ্যালঙ্কার-বিভূষিতা শ্যামাঙ্গী উন্মাদিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই অপূর্ব্ব শোভা দেখিবার জন্যই কমলা নিকট পথ পরিত্যাগ করিয়া নদীতীর দিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে-ছিলেন।

আসিতে আসিতে কমলা সহসা ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সে ধ্বনি শিশুকণ্ঠজাত বলিয়া বোধ হইল,—এই গভীর রজনীতে নদীতীরে কোথায় শিশু ক্রন্দন করিতেছে। কমলার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। সেই ক্রন্দনধ্বনি অনুসরণ করিয়া অতি দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।

ক্ষণেক যাইয়া দেখিলেন, নদীর উপকূলভাগে দুইটি অল্পবয়স্ক বালক একটী বৃক্ষতলে বসিয়া রোদন করি-তেছে ; তাহাদিগের সমস্ত শরীর ও বস্ত্রাদি আর্দ্র, তাহার উপর সেই প্রচণ্ড শীতল বায়ুতে তাহারা শীতার্ত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে।

কমলা অতি সকরুণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে বাছা, এখানে বসিয়া রহিয়াছ ?"

দুইটী বালকই একেবারে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাদিগের দুই জনেরই অল্প বয়স হইবে, এক জনের বয়ঃক্রম দশ বৎসর হইবে, অন্যের বয়ঃ-ক্রম তদপেক্ষা এক কি দুই বৎসর অধিক। তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল,—

"আমরা মাঝি, রুদ্রপুর হইতে নৌকা লইয়া আসি-য়াছি, ফিরিয়া যাইবার সময় পথে ঝড় উঠিল। মা, তুমি যেই হও, আমাদের সাহায্য কর, আমাদের কেহই নাই।"

দ্বিতীয় বালকটী বলিল, "আমাদের কেহই নাই, মা, তুমি সাহায্য কর।"—দুই জনেরই চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল।

কমলার কোমল হৃদয়ে আরও দয়া ও দুঃখের সঞ্চার হইল, বলিলেন—

"বাছা, তোমরা এই বয়সে এত কষ্ট সহ্য করিতে শিখিয়াছ?—তোমরা রুদ্রপুর হইতে কোথায় আসিয়াছিলে?"

প্রথ, বা। "এই আশ্রমে আসিয়াছিলাম, এখানে বৈকালে খাওয়া দাওয়া করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে যাইতেছিলাম; পথে ঝড় উঠিয়াছে।"

কম। "পুনরায় আশ্রমে চল না কেন? আশ্রম অধিক দূর নহে; অদ্য রাত্রি তথায় থাকিয়া কালি বাড়ী যাইও।"

প্রথ, বা। "তাহাই করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বাতাস উল্টা হইয়াছে, নৌকা আশ্রমের দিকে আর এক রশীও চলে না।"

কম। "নৌকা কোথায়?"

প্রথ, বা। "এইখানেই আছে" বলিয়া কমলাকে নদীকূলে লইয়া যাইল, নৌকা তথায় বাঁধা ছিল।

কমলা বলিলেন," নৌকা এই স্থানেই থাকুক, তোমরা আশ্রমে আইস।"

দ্বিতী, বা। "যেরূপ বাতাস হইতেছে বোধ হয় নৌকার দড়ী ছিঁড়িয়া যাইবে, নৌকা ভাসিয়া যাইবে।"

কম। "তবে নৌকা ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখ।"

দ্বিতী, বা। "আমরা দুই জনে তুলিতে পারিলাম না।"

কম। "আইস আমিও ধরিতেছি।"

পরোপকারিণী ব্রাহ্মণকন্যা নৌকার এক দিক্ ধরি-

লেন, দুই জন বালক নৌকার অপর দিক্ ধরিল। নৌকা অতি ক্ষুদ্র, অনায়াসে ডাঙ্গার উপর উঠিল। তথায় দুইটী আম্রবৃক্ষে সেই নৌকা উত্তমরূপে বদ্ধ হইল। তখন বালকদ্বয় অতি স্নেহগর্ব্বস্বরে বলিল—"মা আর অধিক কি বলিব, তুমি আজ আমাদের বাঁচাইলে।"

কমলা বলিলেন, "আইস বাছা আশ্রমে যাই। যেরূপ মেঘ হইয়াছে, শীঘ্রই ভয়ানক বৃষ্টি হইবে।" এই বলিয়া তিন জনই আশ্রমাভিমুখে চলিল। ক্রমে গভীর মেঘ-রাশি আকাশে জড় হইতে লাগিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নীলমেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতে লাগিল, রহিয়া রহিয়া বায়ু ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতে লাগিল, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতা মুহুর্মুহু দেখা দিতে লাগিল, মেঘের ভীষণ গর্জ্জনে বৃক্ষ, গ্রাম, অটবী, সমস্ত মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। বালকদ্বয় ভয়ে কমলার নিকটে যাইতে লাগিল, কমলা বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে স্বভাবের সেই ভীমশোভা অবলোকন করিতে লাগিলেন, অলৌকিক আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে বালকদ্বয়ের দিকে চাহিলেন, সস্নেহ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের এই অল্প বয়স, তোমরা এইরূপ কষ্ট করিয়া জীবন ধারণ কর? তোমা-দের কি পিতামাতা নাই?"

নবীন উত্তর করিল," আছেন কিন্তু তাঁহারা অতিশয় বৃদ্ধ, কার্য্য কর্ম্মে অক্ষম। আজ মা আমাদের জন্য কত ভাবনা করিবেন;—ভাবিবেন এই ঝড়ে আমরা ডুবিয়া গিয়াছি।"

রাখাল বলিল, "দাদার মৃত্যু হওয়া অবধি একটু বাতাস হইলে মা আমাদিগকে বাহির হইতে দেন না।

আজ তিনি কত ভাবিতেছেন।” দুই জনে কাঁদিতে লাগিল।

কমলা তাহাদের সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“তোমার দাদার কবে মৃত্যু হইয়াছে?”

রাখাল উত্তর করিল,“আজ ছয় মাস হইল, এক দিন মাছ ধরিতে গিয়াছিলেন, ভয়ানক তুফানে নৌকা উল্টিয়া পড়িল, আর দাদাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই অবধি পিতা পীড়ায় ও শোকে শয্যাগত, যতক্ষণ আমরা কিছু আনিতে না পারি ততক্ষণ তাঁহার খাওয়া হয় না। আর মাতা ত সেই অবধি আজপর্য্যন্ত দিন রাত্রি রোদন করিতেছেন।”

কমলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কিরূপে রোজগার কর?”

নবীন বলিল, “কখন মাছ ধরি, কখন নদীর শেওলা জড় করিয়া যাহারা চিনি করে তাহাদিগের নিকট বিক্রয় করি, কখন বা যাত্রীদিগকে এস্থান ওস্থানে লইয়া যাইয়া কিছু কিছু পাই। যিনি আজ রুদ্রপুর হইতে এই আশ্রয়ে আসিলেন, তিনি আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেন, তাঁহার কোথাও যাইতে হইলে আমাদের ভিন্ন আর কাহাকেও ডাকেন না। আর কত দিন আমাদিগের খাইবার কিছু না থাকিলে আমরা উহাঁর স্বামী নবীনদাসের নিকট যাইয়া দাঁড়াই, তিনি আমাদের চাল, ডাল, পয়সা না দিয়া বিদায় করেন না।”

রাখাল বলিতে লাগিল, “কিন্তু তথাপিও আমাদের কখন কখন চলা ভার হয়;—কতবার বৃষ্টি বাদলার দিন এমন হয় যে, আমাদের ঘরে খাবার নাই আমরা

ক্ষুধায় কাঁদি, মা আমাদের দেখিয়া কাঁদেন, পিতা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া থাকেন, মুখে একখানি বাতাসা দি, কি এক বিন্দু দুধ দি এমন উপায় নাই। গ্রামে ধার চাহিলে ধার পাই না, গরিবকে কে ধার দিবে? মা এক একবার বলেন, 'যা নবীনদাসের কাছে কিছু ভিক্ষা করিয়া আন,'—কিন্তু আবার ঘর হইতে বাহির না হইতে হইতে ফিরাইয়া আনেন; বলেন, 'এ বাতাসে কোথাও যেও না, বাঁচিয়া থাক, বাঁচিয়া থাকিলে অন্ন জুটিবে।'"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে দুইটী বালক কমলার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সে কথার শেষ নাই,—দুঃখীলোক যখন দুঃখের কথা বলিবার লোক পায় তখন কি তাহার কথার শেষ থাকে?—হৃদয়ে দুঃখও যেরূপ অনন্ত, কথাও সেইরূপ অনন্ত। কিন্তু এ জগতে হতভাগাগণ দুঃখের কথা বলিয়া একটু রোদন করিবে এরূপ সময়ও কত অল্প; হতভাগার দুঃখকথা কে শ্রবণ করিবে? ধনী-গণ ধনমদে মত্ত, বিলাসীগণ বিলাসে সংজ্ঞাহীন, কুল-মর্য্যাদাগর্ব্বী লোক নীচদিগের সহিত কথা কহেন না,—জগতে সকলেই ধনমানলাভাদি নিজ নিজ অভিপ্রায়ে ব্যতিব্যস্ত। দুঃখীলোক কাহার কাছে রোদন করিবে, হতভাগার দুঃখকথা কে শ্রবণ করিবে?

তিন জনে যাইতে যাইতে পথে মহাশ্বেতার সহিত দেখা হইল। তিনি নদীতীরে শিবপ্রতিমা পূজা করিয়া আশ্রমাভিমুখে যাইতেছিলেন। কমলাকে কিছু দূর হইতে দেখিয়া বলিলেন—

"কে ও কমলা? এস মা আশ্রমে যাই; এই অন্ধকারে ঝড়ের সময় কি তোমার বনে বনে বিচরণ করিবার উপযুক্ত সময়? আরও দুইটী বালক কে?"

কমলা উত্তর করিলেন, "ও দুইটী নিরাশ্রয় বালক, নৌকা লইয়া যাইতেছিল, এরূপ সময়ে ঝড় উঠিল, সুতরাং আজ আমাদের আশ্রমে অতিথি হইবে।"

মহা। "আহা! বাছাদের সমস্ত বস্ত্র সিক্ত, আয় শীঘ্র শীঘ্র আশ্রয়ে আয়। আর কমলা তোমার সহিত আমার সরলা গিয়াছিল, সে কোথায়? তুমি আপনি যেমন বনদেবী তাহাকেও তাই করিলে। বাছা রুদ্রপুরে অমলাকে যেমন ভাল বাসিত এখানে তোমাকে সেই-রূপই ভাল বাসে। কিন্তু এখনও অমলাকে ভুলে নাই, তাহার জন্য দিন রাত্রি কাঁদে। এ জগতে বিপদকালে কয় জন বন্ধু হয়? যাহারা হয় তাহাদিগকে কি কেহ কখন ভুলিতে পারে?"

সরলার দিবারাত্রি ক্রন্দনের অন্য কারণ ছিল, তাহা কমলা জানিতেন, তথাপি মহাশ্বেতার সম্মুখে তাহা বলিলেন না। তিনি উত্তর করিলেন,—

"হাঁ সরলা এক্ষণও অমলাকে বড় ভাল বাসে, অমলার সঙ্গে আশ্রমাভিমুখে গিয়াছে।"

"আর বনদেবীর বুঝি এক্ষণও আশ্রমাভিমুখে যাইবার সময় হয় নাই, এক্ষণও বনে বনে বিচরণ করিতেছেন,"—এই বলিয়া শিখণ্ডিবাহন সম্মুখে আসিলেন।

কমলা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন; বলিলেন, "শিখণ্ডি-বাহন! তুমি এই রাত্রিতে আশ্রম হইতে কোথায় যাইতেছ?"

শিখ। "পিতা চন্দ্রশেখর আমাকে আপনার অন্বেষণে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য আমি বনাভিমুখে যাইতেছিলাম, বনদেবীকে আর কোথায় পাওয়া যাইবে! আপনার সঙ্গে এই দুইটী বালক কে?"

এইরূপ নানা কথোপকথন করিতে করিতে মহাশ্বেতা, কমলা, শিখণ্ডিবাহন, আর সেই দুইটী দরিদ্র বালক আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জমীদারের পূর্ব্বকথা।

But I have woes of other kind,
Troubles and sorrows more severe,
Give me to ease my tortured mind,
Lend to my woes a patient ear;
And let me—if I may not find
A friend to help—find one to hear.

Crabbe.

চন্দ্রশেখর ও শিখণ্ডিবাহন ভিন্ন সে আশ্রমে আর কেহই মহাশ্বেতার প্রকৃত পরিচয় জানিতেন না। তাঁহারাও এ পরিচয়ের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না, বিশেষরূপে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

চন্দ্রশেখর যেরূপ অনেক অনাথা ব্রাহ্মণকন্যাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, মহাশ্বেতাকেও সেইরূপ দিলেন। মহেশ্বর-মন্দির হইতে তাঁহার যে আয় হইত তাহাতে অনায়াসেই সকলের ভরণপোষণ হইত।

আশ্রমের শান্ত, দ্বেষবিদ্বেষ শূন্য নিবাসিগণের সহিত একত্র বাস করিতে করিতে মহাশ্বেতার অন্তঃকরণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে বয়সে স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন কখনই হয় না। মহাশ্বেতার বিজাতীয় মান ও জিঘাংসা অন্তরে সেইরূপই জাগরিত ছিল। স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি সেইরূপই

প্রতিরাত্রি বৈরনির্যাতনের জন্য শিবপূজা করিতেন;—সেইরূপই প্রতিদিন বৈরনির্যাতনের আলোচনা করিতেন। শিখণ্ডিবাহন এ বিষয়ে তাঁহার সহিত কথা কহিতে সাহস করিতেন না, মনে মনে ভাবিতেন, সিংহপত্নীকে শান্তরসাস্পদ আশ্রমে রাখিলেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

আজি রাত্রি অতিশয় দুর্যোগবশতঃ অনেক জন অতিথি আশ্রমে আসিয়াছেন, আশ্রমবাসিগণ অতিথি-সেবা অপেক্ষা অধিক আনন্দ জানিত না। ব্রাহ্মণ-গৃহিণীগণ অতিথিদিগের জন্য অন্নপাক করিতে লাগিলেন, সহর্ষচিত্তে নানারূপ ব্যঞ্জনপাক করিয়া আপন আপন রন্ধন-কৌশল দেখাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ সুনৃত বাক্যে অতিথিদিগকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। গৃহে গৃহে শীত নিবারণার্থ অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার চতুঃপার্শ্বে বন্ধুবান্ধবে উপবেশন করিয়া মিষ্টালাপ করিতেছে; শুদ্ধান্তঃপুর হইতে গৃহিণীদিগের সংসারকথা শুনা যাইতেছে, কখন কখন বা অল্প-বয়স্কদিগের সুমিষ্ট রহস্য-হাস্য শুনা যাইতেছে। জগতের মধ্যে এই আশ্রমটী শান্তি ও কুশলের স্থান বলিয়া বোধ হইতেছে।

চন্দ্রশেখরের কুটীরে অদ্য এক জন অতি সমৃদ্ধিশালী অতিথি আসিয়াছেন বলিয়া অনেকেই খাওয়া দাওয়া সাঙ্গ হইলে তথায় যাইয়া সমবেত হইলেন। সে আশ্রমটী এরূপ ক্ষুদ্র যে, তাহার মধ্যে সকলেই সকলকেই এক পরিবারের লোক বলিয়া মনে করিত, রমণীগণও সকল আশ্রমবাসিদিগের সহিত আলাপ সম্ভাষণ করিতে সঙ্কোচ করিত না। সুতরাং অদ্য রাত্রিতে চন্দ্রশেখরের প্রশস্ত কুটীরাভ্যন্তরে অনেক পুরুষ ও অনেক

স্ত্রী একত্র হইলেন,—তুই এক জন অপরিচিত অতিথি আসিয়াছে বলিয়া আশ্রমের রীতি ভঙ্গ হইল না।

গৃহের মধ্যস্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির ঠিক পশ্চাতে চন্দ্রশেখর বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষেরও অধিক হইয়াছে। কিন্তু দিন দিন আশ্রমের শান্ত দেবকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াই হউক, বা মানসিক শান্তি বশতঃই হউক, তাঁহার প্রশস্ত ললাটে একটী মাত্র বার্দ্ধক্যচিহ্ন নাই। নয়ন তুটী জ্যোতিঃপূর্ণ, সমস্ত শরীর তেজঃপূর্ণ, সেই শরীরের উপর যজ্ঞোপবীত লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সমৃদ্ধিশালী অতিথি বসিয়া আছেন। তাঁহারও বয়ঃক্রম চন্দ্রশেখরের সহিত সমান হইবে, কিন্তু সংসার-চিন্তায় ও পার্থিব তুঃখে তাঁহার শরীর কি শীর্ণ করিয়াছে! মস্তকের কেশ অধিকাংশ পলিত হইয়াছে, ভ্রযুগলের কেশও তুই একটী শুক্লবর্ণ হইয়াছে। চক্ষুতে জ্যোতি নাই, বদনমণ্ডলে জ্যোতি নাই, শরীরে বল নাই। হস্তপদাদি শীর্ণ হইয়াছে, চর্ম্ম শিথিল হইয়াছে। তাঁহাদিগের তুই জনকে দেখিলে সংসার ও সংসার-চিন্তার অকিঞ্চিৎকারিতা, অনিষ্টকারিতা ও যোগ-বল ও পুণ্যবলের গৌরব ও মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সমৃদ্ধিশালী অতিথি পাঠক মহাশয়ের নিতান্ত অপরিচিত নহেন,—ইনি ইচ্ছাপুরের জমীদার নগেন্দ্র-নাথ।

সেই তুই জনের উভয়পার্শ্বে ও পশ্চাতে অনেক জন আশ্রমবাসী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রশেখ-রের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে, ঈষৎ অন্ধকারে মহাশ্বেতা অব-গুণ্ঠনবতী হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন,—অন্ধকারে থাকি-লেও বিধবার শুভ্র বসনে আবৃত সে উন্নতকায় সকলেই

দেখিতে পাইতেছিল, তাঁহার স্থিরগম্ভীর ভাব দেখিয়া অবগুণ্ঠন সত্তেও আশ্রমবাসী সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া ছিল। তাঁহার পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহন বসিয়া রহিয়াছেন, মৃদু মৃদু কি কথা কহিতেছেন, এক একবার নগেন্দ্র নাথের দিকে লক্ষ্য করিতেছেন। চন্দ্রশেখরের বাম-হস্তের নিকট, অগ্নির সন্নিকটে কমলা বিনীতভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, অগ্নির দিকে স্থির লক্ষ্য করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। এক একবার তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সেই দুইটী নিরাশ্রয় বালকের প্রতি লক্ষ্য করিতেছেন, স্নেহসহকারে তাহাদিগকে অগ্নির নিকটে বসাইতে-ছেন,—তাহাদিগের সিক্ত বসন উত্তপ্ত করিতেছেন, এক একবার তাহাদিগের সংসারকথা, দুঃখকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কুটীরের এক পার্শ্বে অমলা ও সরলা বসিয়া রহিয়াছে,—আজ তাহাদিগের আনন্দ অপার, তাহাদিগের গল্প শেষ হইতেছে না, তাহা-দিগের সুমিষ্ট ওষ্ঠে সুহাসি শুকাইবার সময় পাইতেছে না। অপর একটী পার্শ্বে নিস্তারিণী, মনোমোহিনী, যোগেন্দ্রমোহিনী ও তারাসুন্দরী ইত্যাদি অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণ-কন্যাগণ আমোদ ও রহস্য করিতেছে, তাহা-দিগেরও কথার শেষ নাই, আমোদের শেষ নাই,—এক একবার মুখে বসন দিয়া হাসি সম্বরণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, আবার এক একবার নিস্তব্ধ হইয়া চন্দ্রশেখর ও নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে। ইহা ভিন্ন অপরাপর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যা অগ্নির চারিপার্শ্বে বসিয়া কখন কখন আপনাদিগের মধ্যে কথা কহি-তেছে, কখন নগেন্দ্রনাথের কথা শুনিতেছে।

নগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখ-রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন্! আমি আপ-

নার বিস্তীর্ণ মহেশ্বরমন্দির ও এই সুরম্য পুণ্যাশ্রম দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। যদি আপনার মত মোহময় সংসার ত্যাগ করিয়া এই ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে এই বার্দ্ধক্যে আমি অসীম দুঃখসাগরে ভাসিতাম না।” চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন,—“মহাশয়, কেবলই কি আশ্রমে পুণ্য কর্ম্ম করা যায়, সংসারের মধ্যে থাকিয়া কি পুণ্য কর্ম্ম সম্ভবে না? শাস্ত্রে বলে দান, ধর্ম্ম ও পরোপকারিতায় যত পুণ্য, যাগযজ্ঞে তত নাই। যে জমীদার পরোপকারিতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য সর্ব্বত্রই সমাদৃত হয়েন তাঁহার কি আশ্রমবাসের জন্য আক্ষেপ উচিত?”

নগে। “মহাশয়! আপনি আমাকে অতিশয় সম্মান করিলেন, আমি সে সম্মানের যোগ্য নহি। যদি যোগ্য হইতাম, যদি মহাপাপী না হইতাম, তবে আজ পাপ প্রশমনার্থ মহাত্মা চন্দ্রশেখরের নিকট আসিতাম না।”

চন্দ্র। “এ জগতে সহস্রগুণ সত্ত্বেও কে মহাপাপী নহে? কে বলিতে পারে আমি পাপ করি নাই,—কে বলিতে পারে আমি নিষ্কলঙ্ক, নিরপরাধী?”

দুই জনে অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অবশেষে নগেন্দ্রনাথ আপনার আসিবার কারণ বলিতে লাগিলেন; বলিলেন—

“মহাত্মন্, আমার মত পাপী এ জগতে আর কেহই নাই, আমার মত দুঃখীও আর কেহই নাই, আমার দুঃখকথা শ্রবণ করুন।”

“আমার সহধর্ম্মিণী আমাকে বলিতেন যে, যেদিন তাঁহার জন্ম হয়, সেদিন, আকাশে অপরূপ তিথি নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতে গণিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশুকন্যা ঘোর উন্মাদিনী হইবেন। সে

ভ্রম, আমার সহধর্ম্মিণী উন্মাদিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি সুকুমার মনোবৃত্তি অতিশয় বেগবতী ছিল, সে জন্য আমি তাঁহাকে পাগলিনী বলিতাম। আজি দ্বাদশ বর্ষ হইল, সে স্নেহময়ী পাগলিনীর কাল হইয়াছে।"

"পাগলিনীর গর্ব্ভে আমার দুইটী পুত্র জন্মে। তাহাদিগের গর্ভধারিণীর মত দুই জনই পাগল। জ্যেষ্ঠটী চিন্তায় পাগল, কনিষ্ঠটী কার্য্য কর্ম্মে পাগল। সে দুইটী পুত্র আমার দুইটী নয়নের তারা ছিল,—আজ তাহারা কোথায়? হায় দারুণ বিধি! বার্দ্ধক্যে কি আমার কপালে এই লিখিয়াছিলে? আমার দুইটী নয়নই গিয়াছে, আমি অন্ধ হইয়াছি, দুইটী রত্ন হারাইয়াছি, আমি কাঙ্গালী হইয়াছি।"

সে দুঃখবচনে সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ক্ষণেক পরে নগেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন—

"আমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে অল্প বয়সে ব্যাঘ্রে লইয়া যায়। তাহারই শোকে তাহার মাতা কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়া আমি সে শোক সহ্য করিয়াছিলাম। আহা! সেরূপ বীরপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই। দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যালোচনা, বল ও বিক্রমে সুরেন্দ্রনাথের মত কে ছিল? বৎস নবীনবয়সে সিংহবল ধারণ করিত, মল্লযুদ্ধে শত শত যোদ্ধাকে পরাস্ত করিয়াছে, অসীম বাহুবলে সকলকে বিস্মিত করিয়াছে, অশ্বচালনায় তাহার সমকক্ষ এ দেশে কাহাকেও দেখি নাই। যে দেখিত, সুরেন্দ্রনাথকে দয়াধর্ম্মে দাতাকর্ণ বলিত, বলবিক্রমে ভীমাবতার বলিত। বাল্যকালেই রাণা সমরসিংহের নিকট যুদ্ধবার্ত্তা শুনিতে ভাল বাসিত, শুনিতে শুনিতে

বালকের মুখ গম্ভীর হইত, নয়নদ্বয় তেজে অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইত, শিশু সমরসিংহের খড়্গ ধারণ করিত ও যুদ্ধে যাইব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিত; রাজা সমরসিংহ অশ্রুপূর্ণলোচনে বালককে চুম্বন করিতেন। বাল্যকালেই তাহাকে রাজা সমরসিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাইতেন। রাজা সর্ব্বদাই বলিতেন, 'পাঠানেরা যথার্থই বাঙ্গালীদিগকে ভীরু বলিয়া ভৎর্সনা করে, কিন্তু সেই বাঙ্গালীর মধ্যেও মধ্যে মধ্যে বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আমি মরিলে তুই আমার তরবারি লইবি, তোর হস্তে এ খড়্গের অপমান হইবে না।' আজি সে বালক কোথায়! বিধাতঃ এক্ষণ আর কে আছে যাহার মুখ চাহিয়া আমি সুরেন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ সহ্য করিব।"

বৃদ্ধ পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রশেখর শোকার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সুরেন্দ্রনাথের কোন অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়াছেন?"

নগেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "তাহা যদি শ্রবণ করিতাম, তাহা হইলে আর এতক্ষণ জীবিত থাকিতাম না, সেইক্ষণেই জীবন ত্যাগ করিতাম।"

চন্দ্র। "তবে এত চিন্তিত হইতেছেন কেন? সুরেন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্য বিদেশে গিয়াছেন, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অবশ্যই কুশলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।"

নগে। "আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহাই হয়। কিন্তু আমি কল্য রাত্রিযোগে অতিশয় কুস্বপ্ন দেখিয়াছি, সেই জন্যই ব্যাকুল হইয়াছি,—সেই জন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। বোধ হইল যেন ভীষণ সেনারাশির মধ্যে আমার পুত্রকে দেখিলাম, যেন যুদ্ধের

ভীষণ কোলাহলে উন্মত্ত হইয়া আমার পুত্র শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া সাগর-তরঙ্গের ফেণচূড়ের ন্যায় সেনা-তরঙ্গের সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হইতেছে। আহা! বৎস অল্প বয়স হইতেই যুদ্ধে যাইয়া যশোলাভ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু এখনকার ভীষণ মোগল পাঠানদিগের যুদ্ধে যদি লিপ্ত হইয়া থাকে, তবে কি আর তাহাকে ফিরিয়া পাইব? মুনিশ্রেষ্ঠ! এ স্বপ্নের অর্থ করিয়া দিন, যদি কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে তবে আমি এইক্ষণেই প্রাণত্যাগ করিব।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "শান্ত হউন।" বলিয়া ক্ষণেক ধ্যান করিতে লাগিলেন। কুটীরের সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সরলা প্রিয় সইয়ের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিয়া উপবেশনাবস্থাতেই নিদ্রা যাইতেছিল, নিদ্রাতেও তাহার অধরে হাস্যকণা বিরাজমান রহিয়াছে। যেন প্রিয়সখীর স্পর্শসুখে নিদ্রাতেও আনন্দস্বপ্ন দেখিতেছে। অমলা অনন্যমনে জমীদারের কথা শুনিতেছিল, সুরেন্দ্রনাথ কে, তাহা জানিত না। মহাশ্বেতার শরীর ভয়ে কণ্টকিত হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহারই কার্য্যের জন্য যাইয়াছেন, সে কার্য্যও বিপদরাশি-বেষ্টিত। মহাশ্বেতা ভাবিলেন, "আমি অভাগিনী যদি সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকি, তবে আপন শোণিত দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। ভগবন্! রক্ষা কর।"

অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রশেখর চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া নগেন্দ্রনাথকে বলিলেন,—

"নিশ্চিন্ত হউন, আপনার সন্তান কুশলে আছেন।" নগেন্দ্রনাথের শরীরে যেন জীবন আসিল,—এ বিশাল বিপদাকীর্ণ সংসারে একমাত্র পুত্রবিয়োগের ন্যায়

আর কি বিপদ্ আছে? তথাপি বোধ হয় মহাশ্বেতা চন্দ্রশেখর অপেক্ষাও অধিকতর আরাম বোধ করিলেন,—পুণ্যাত্মার হৃদয়ে মহাপাতকের ভয়, পুত্রবিয়োগের ভয় অপেক্ষাও গাঢ়তর ও ভীষণতর।

এ আশঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত হইয়া নগেন্দ্রনাথ অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। পুত্র কবে গৃহে আসিবেন, এক্ষণও আসিলেন না কেন, অনেকবারত ভ্রমণ করিতে বাহির হয়েন কিন্তু কখনও এতদিন বিলম্ব করেন নাই,—স্নেহবান্ পুত্র হইয়া পিতাকে ছাড়িয়া এতদিন কিরূপে আছেন, ইত্যাদি নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন—

"মহাশয়, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—এবার আপনার পুত্রের এতদিন বিলম্ব করিবার বিশেষ কারণ আপনি কিছু জানেন, যাইবার সময় আপনাকে বিশেষ করিয়া কিছু বলিয়াছিলেন?"

নগেন্দ্রনাথ ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—

"আপনার নিকট আর আমি পাপ কথা লুকাইব কেন? আমার পুত্রের দোষ কিছুই নাই। বাছা যদিও পাগলের মত কখন কখন গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিত, তথাপি আমাকে ছাড়িয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাত দিন কখন থাকিতে পারিত না। এবার যে দুই মাস রহিয়াছে, সে কেবল আমারই পাপে।

"যখন আমার সুরেন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ষ, তখন আমি সপুত্রে রাজা সমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আপনি জানেন রাজা সমরসিংহ আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত ভালবাসিতেন; আমাকে

অতিশয় সম্মানপুরঃসর আলিঙ্গন করিতেন। আমরা দুইজনে কথা কহিতেছি আমাদের পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ আর সমরসিংহের একটী দুহিতা ক্রীড়া করিতেছিল। ক্রীড়াচ্ছলে সেই দুহিতা একটী পুষ্পমাল্য লইয়া সুরেন্দ্রনাথের গলায় পরাইয়া দিল। রাজা কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন,—কন্যার এই কার্য্যটী দেখিয়া আনন্দে তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। আমাকে বলিলেন, 'নগেন্দ্রনাথ, অনেক রাজপুত্রের সহিত আমার এই কন্যার সম্বন্ধ হইতেছে। কিন্তু কন্যা যাহাকে আপনি বরণ করিয়াছে তাহারই সহিত আমি উহার বিবাহ দিব। তোমার পুত্রের সহিত আমার একমাত্র দুহিতার বিবাহ হইবে।' আমার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বঙ্গচূড়ামণি রাজা সমরসিংহ আপনি একমাত্র দুহিতাকে যে এই অকিঞ্চিৎকর জমীদারের পুত্রের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর। সেইদিনই আমরা শপথ করিয়া অঙ্গীকারে বদ্ধ হইলাম,—সে শপথ আমি ভঙ্গ করিয়াছি।"

মহাশ্বেতা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ সকোপ কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইতেছিল। তিনি নগেন্দ্রনাথের মুখে এই কথা শুনিবার জন্যই সে দিন আসিয়া তথায় বসিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি। সমরসিংহের মৃত্যুর পর আমি নিরাশ্রয় বিধবার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অসম্মত হইলাম। তখন আমি অন্য সমৃদ্ধিশালিনী পাত্রী স্থির করিতে লাগিলাম। অবশেষে এক উপযুক্ত পাত্রী পাইলাম। কিন্তু যদিও আমি

অঙ্গীকারভঙ্গে তৎপর হইয়াছিলাম, আমার ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র তাহাতে অসম্মত হইল। এক দিন আমাকে বলিল, 'পিতা, আমি আপনার কোন কথায় অবাধ্য হইতে পারি না, কিন্তু একটী বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজা সমরসিংহের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাহা ভঙ্গ করিতে দিব না।' এই যথার্থ কথায় আমি রুষ্ট হইলাম, তৎক্ষণাৎ নূতন পাত্রীর সহিত বিবাহের দিন স্থির করিলাম, বলপূর্ব্বক তাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিবার উপক্রম করিলাম। কিন্তু আমার পুত্রের কথাই রহিল, ধর্ম্মের জয় হইল,—আমার পুত্র গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল,—বাছাকে সেই অবধি আর দেখি নাই।"

সুরেন্দ্রনাথ যে কেবল একটা পুরাতন প্রতিজ্ঞা রক্ষা হেতু পিতার অবাধ্য হয়েন নাই, তাহা পাঠক মহাশয় অবগত আছেন।

নগেন্দ্রনাথ আবার বলিতে লাগিলেন, "সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছি, কত পাপ করিয়াছি, সেই জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে আমার এই যাতনা। কোথায় এই বয়সে আমার অশ্বিনী-কুমারের ন্যায় দুই পুত্র আমার হস্ত হইতে জমীদারীর ভার লইবে, কোথায় চন্দ্রাননা পুত্র-বধূ বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া আমার পুত্র নাই, পুত্রবধূ নাই, স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী নাই, অগাধ সমুদ্রে ভাসিতেছি,—মহাশয়! কি পাপে আমার এই অদৃষ্ট হইয়াছে,—কি করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহা আপনি বিধান করুন।"

চন্দ্রশেখর বলিলেন,—"আমি আপনার জন্য পূজা দিতে ক্রটী করিব না, যাহাতে আপনার মঙ্গল হয় সেরূপ বিধান করিতে ক্রটী করিব না।"

শিখণ্ডিবাহন মহাশ্বেতার সহিত কথা কহিতে-ছিলেন,—তিনি নগেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

"প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া যদি পাপ করিয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা পুনরায় পালন করিতে যত্নবান্ হউন।"

নগেন্দ্রনাথ কহিলেন, "শিখণ্ডিবাহন! আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। রাজা সমরসিংহের অনাথা দুহিতাকে আনিয়া দাও, আমার সুরেন্দ্রনাথের সহিত অবশ্যই বিবাহ দিব। আর আমার পূর্ব্ববৎ গর্ব্ব নাই, পূর্ব্ববৎ অভিমান নাই। বার্দ্ধক্যে ও শোকদুঃখে আমার উচ্চ মস্তক নম্র করিয়াছে। এবার যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, তাহা হইলে যেন আমি আর পুত্রের মুখ কখন না দেখিতে পাই। ইহা অপেক্ষা অভিশাপ আমি আর জানি না।"

শিখণ্ডিবাহন কোন উত্তর না করিয়া মহাশ্বেতার সহিত পুনরায় কথা কহিতে লাগিলেন। সে কি কথা হইতেছিল, পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিতে পারিবেন।

শিখণ্ডিবাহন বলিতেছিলেন, "ভগিনি! আর বিলম্বে আবশ্যক কি আপনার পরিচয় দিন্।"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "যদি বিধাতা আমাদিগকে পূর্ব্বমত উন্নতিসম্পন্ন না করেন তাহা হইলে এজন্মে পরিচয় দিব না, এজন্মে কন্যার বিবাহ দিব না।"

শিখ। "কেন?"

মহা। "প্রথম কারণ আমার ব্রতভঙ্গ কখনই করিব না। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর কারণ আছে।"

শিখ। "সে কি?"

মহা। "পরের নিকট অনুগ্রহ গ্রহণ করা আমার স্বামীর রীতি ছিল না। তিনি অপরকে অনুগ্রহ বিতরণ

করিতেন, কাহারও নিকট গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার বিধবা নিরাশ্রয় হইয়াও সেই রীতি পালন করিবে।”

শিখ। “আমি আপনার কথা বুঝিতেছি না, স্পষ্ট করিয়া বলুন।”

মহা। “আমি নিরাশ্রয় বিধবা,—নগেন্দ্রনাথ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, দয়া প্রকাশ করিয়া আমার কন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিবেন, ইহা আমি মরিলেও সহ্য করিব না। লোকে আমার কন্যার প্রতি অঙ্গুলী নিদর্শন করিয়া বলিবে, ‘ইহার মাতা সূতা কাটিয়া খাইত, নগেন্দ্রনাথ অনুগ্রহ করিয়া ইহার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিয়াছেন।’ আমি মরিলেও এ কথা সহ্য করিব না। শিখণ্ডিবাহন! মানিনী মৃত্যুভয় করে না, কিন্তু পরের নিকট দয়া বা অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে ভয় করে।”

শিখণ্ডিবাহন অবাক্ হইয়া রহিলেন, বলিলেন—“তবে আপনি আমাকে নগেন্দ্রনাথের নিকট প্রতিজ্ঞা-পালনের প্রস্তাব করিতে বলিলেন কেন?”

মহা। “এ অবস্থায় উনি প্রতিজ্ঞাপালনে সম্মত আছেন কি না দেখিবার জন্য,—আমি সম্মত নহি।”

এই কথোপকথন অতি অপরিস্ফুট স্বরে হইতেছিল, সুতরাং আর কেহই শুনিতে পায় নাই।

নগেন্দ্রনাথ আবার আপন দুঃখকথা বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের কথা শীঘ্র শেষ হয় না; বিশেষ, দুঃখের কথা পরকে জানাইলে মনের দুঃখ কিছু শান্ত হয়।

নগেন্দ্রনাথের সামান্য দুঃখ নহে, যখন আপন অবস্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন। স্ত্রী নাই, পরিবার নাই, পুত্র নাই, কন্যা নাই, জগৎ সংসার

অন্ধকার; বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ আপন দুঃখকথা বলিতে লাগিলেন, পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চন্দ্রশেখর বলিলেন, "মহাশয়! আপনার মত জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যদি দুঃখশোকে সংজ্ঞাশূন্য হইবে, তবে অপর লোক কি করিবে? আপনার পুত্র জীবিত আছেন, কুশলে আছেন। আমার বংশে কেহই নাই, আপনি যদি এইরূপ শোকবিহ্বল হইবেন, তবে আমি কি করিব?"

নগেন্দ্রনাথ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি যে কখন বিবাহ করিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতাম না। আপনার কি পুত্রকন্যা কিছু হইয়াছিল?"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "পূর্ব্বকথা স্মরণ করা কেবল বিড়ম্বনামাত্র,—কিন্তু দুঃখীর দুঃখকথাই ভাল লাগে। আপনি আমার দুঃখকথা শ্রবণ করুন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহন্তের পূর্ব্বকথা।

To gather life's roses, unscathed by the briar,
Is given alone to the bare-footed friar.

Scott.

কুটীরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, একে একে তাঁহারা প্রায় সকলেই উঠিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণপত্নী ও ব্রাহ্মণকন্যাগণ সকলেই আপন আপন গৃহে গমন করিলেন, কমলা বালকদ্বয়কে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া একটী

ঘরে শয়ন করিতে বলিলেন, আপনিও নিজ শয্যাগৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। শিখণ্ডিবাহনও উঠিয়া আপন আশ্রমে গমন করিলেন। কুটীরে নগেন্দ্রনাথ ও চন্দ্রশেখর ভিন্ন কেবল মহাশ্বেতা বসিয়াছিলেন, আর অমলা প্রিয়সখীর মস্তক আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া বসিয়াছিল। অমলা এতক্ষণ কিজন্য বসিয়াছিল পাঠক মহাশয় জানিতে ইচ্ছা করিবেন।—অমলার কিসের ঔৎসুক্য যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকে? অমলা ভাবিতেছে,—"নগেন্দ্রনাথের পুত্র পাগল, মধ্যে মধ্যে বাড়ী ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে বেড়ায়, লুকাইয়া কৃষকদিগের সঙ্গে বাস করে, আজ দুই মাস হইল কোন সন্ধান নাই, বলিষ্ঠ বীরপুরুষ, অশ্বিনীকুমারের ন্যায় সুন্দর; যদি ইন্দ্রনাথ নগেন্দ্রনাথের পুত্র না হয়, তবে আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে নহি।—স্থির হও, বাপ যাহাকে বলে তাহাকে বিবাহ করিবে না, সমরসিংহের মেয়েকে বিবাহ করিবে,—সমরসিংহের বিধবা এক্ষণে নিরাশ্রয়; ছদ্মবেশে আছে, তাহার মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য ইন্দ্রনাথ পাগল হইয়াছে। ইন্দ্রনাথকে বিবাহ করিবার জন্য ত সরলা পাগল হইয়াছে,—সই বলিল, 'ইন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মত আছে,'—হরি হরি! আমার সই কি সমরসিংহের কন্যা? মহাশ্বেতাকে দেখিলেও রাজরাণীর মত বোধ হয়, সামান্য ব্রাহ্মণীর মত বোধ হয় না,—কাহারও সহিত অধিক কথা কহেন না, প্রত্যহ শ্বেত প্রস্তরের শিব পূজা করেন, বৃদ্ধ বয়সেও মুখে স্বর্গীয় মহিমা বিরাজ করিতেছে। আর সরলা,—সই আমার বক্ষের উপর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত। আমার বোধ হয় উহার মন ইহা অপেক্ষাও গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত,—আপনি রাজকন্যা হইয়াও

আপনাকে রাজকুমারী বলিয়া জানে না। রাজকুমারীর সহিত আমি বন্ধুত্ব করিতে সাহস করিয়াছি। রাজকুমারীর পদবিক্ষেপে রুদ্রপুর ও বনাশ্রমের পথ ও ঘাট পবিত্র হইয়াছে। ভগবন্! তুমিই জান, আমি কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না"—অমলা এইরূপ চিন্তায় অভিভূত হইয়া নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রশেখরের পূর্ব্বকথা বলিতে লাগিলেন,—

"আমি অতি অল্প বয়স অবধি শিবপূজাভক্ত ছিলাম। ত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত সংসারাশ্রম গ্রহণ করি নাই; গুরুসেবায়, শাস্ত্রালোচনায় ও দেবপূজায় কাল অতিবাহিত করিয়াছিলাম। অবশেষে বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলাম।

"মায়াজালে জড়িত হইয়া সংসারের সুখদুঃখ ভোগ করিতে লাগিলাম,—যে সমস্ত অনির্ব্বচনীয় সুখ পূর্ব্বে কখন ভোগ করি নাই, এক্ষণে তাহা ভোগ করিতে লাগিলাম। যে সমস্ত কষ্ট ও ক্লেশ পূর্ব্বে কখন জানিতাম না, এক্ষণে তাহা অনুভব করিতে লাগিলাম। সংসার কি মোহজালে জড়িত। মায়া, প্রেম, বাৎসল্য, দয়া এ সকল কি স্বর্গীয় সুখের আকর, আবার এই সকল হইতে কি অচিন্তনীয় দুঃখ উৎপন্ন হয়! গুরুসেবায় ও দেবপূজায় যে শান্তি লাভ করিয়াছিলাম, এই মোহজালে জড়িত হইয়া এক্ষণে তাহা ভুলিলাম। সমভূমির উপর স্বচ্ছনদী যেরূপ নিঃশব্দে শান্তভাবে বহিতে থাকে, আমার জীবন গুরুর আশ্রমে সেইরূপ বহিতেছিল, সহসা নিম্নভূমি পাইলে সেই প্রবাহিণী ঘোর গর্জ্জন সহকারে যেরূপ জলপ্রপাত স্বরূপ পতিত হয়, সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবামাত্র আমার জীবন

সেইরূপ সহস্ররূপে বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিল। সে কয় বৎসর এক্ষণে আমার স্বপ্নসম বোধ হয়।

"অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার পুত্র কন্যাদি কিছু হয় নাই। তাহাতে আমার পত্নী ও আমি দেবতার নিকট মানিলাম যে, প্রথমে আমার যে সন্তান হইবে তাহাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিব। তাহারই দুই এক বৎসর পরে দেবকন্যার ন্যায় রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন আমার একটী কন্যা হইল। সে কন্যার মুখাবলোকন করিয়া আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা ভুলিলাম, পিতামাতার সাধ্যে ছিল না যে, সেই সুন্দর পুত্তলীটীকে বিসর্জ্জন দেয়।

"সে কন্যার মুখ আমি এক্ষণও বিস্মৃত হই নাই। চক্ষু দুইটী নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ ও শান্ত, চিত্তও নিরুপম শান্ত, প্রায় ক্রন্দন করিত না। যদি কখনও ক্রন্দন করিত, তাহার মাতা তাহাকে গৃহের বাহিরে লইয়া যাইয়া চন্দ্র দেখাইত বা কল্লোলিনী নদীর কল কল ধ্বনি শুনাইত,—শিশু তাহাতেই একেবারে নিস্তব্ধ হইত। অল্প বয়সে কি হৃদয় স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে পারে?

"মায়ায় প্রতিজ্ঞা ভুলিলাম, কিন্তু সে পাপের ফল ফলিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমার কন্যার সঙ্কটজনক পীড়া হইল, জীবনের আশা রহিল না। তখন আমরা পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ করিলাম। দেবতার নিকট আবার মানিলাম যদি কন্যা এই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করে, তবে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিব। সে পীড়া আরাম হইল, হৃদয় হইতে মায়া উৎ-পাটিত করিয়া আমরা কন্যাকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিলাম।

"বিসর্জ্জন দিবার অগ্রে তাহার বক্ষঃস্থলে এক অপ-রূপ চিহ্ন দিলাম,—শিবের প্রতিমা অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত করিয়া দিলাম, মানস ছিল যদি বাছা সাগর হইতে পরিত্রাণ পায়, যদি তাহাকে কখন আবার দেখি, তবে আপন কন্যা বলিয়া চিনিব। বৎস পরি-ত্রাণ পাইয়াছিল,—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণী তাহাকে জল-রাশি হইতে তুলিয়া লইল,—কিন্তু সে কন্যাকে আর পাইলাম না।

"গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার সহধর্ম্মিণী কন্যা-শোকে বিহ্বল হইয়াছেন—সেই শোকে তাঁহার পীড়া হইল, সেই পীড়াতেই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার শব শ্মশানে সৎকার করিতে লইয়া যাইলাম। অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, আমি সংজ্ঞাশূন্য পাগলের ন্যায় সেইদিকে দেখিতে লাগিলাম। সে সময় আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান থাকিলে আমি সে দুঃখভার বহন করিতে পারিতাম না,—জ্ঞান থাকিলে সেই অগ্নি-রাশিতে মানবলীলা সম্বরণ করিতাম। অজ্ঞানের মত সেই চিতার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অগ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিল,—আমার চারিদিকে ঘোর অন্ধকার হইল।

"তখন মায়াজাল সহসা ছিন্ন হইল। যে কুহু এত দিন জীবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, সহসা তিরোহিত হইল। সংসারে আপনার বলিয়া সম্বোধন করি এরূপ আর কেহই ছিল না। চারিদিকই শূন্য ধূ ধূ করিতেছে যে দিকে চাই সেই দিক্ শূন্য দেখি,—সেই দিকেই মরু-ভূমি ধূ ধূ করিতেছে। পিতা নাই, মাতা নাই, বন্ধুবান্ধব কেহ নাই, জ্ঞাতিকুটুম্ব কেহ নাই,—প্রণয়িনী কাল-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন,—একমাত্র কন্যা অতল জলে

ভাসিতেছে—এইরূপ পূর্ব্বস্মৃতিতে আমার হৃদয় ব্যথিত ও বিদীর্ণ হইতে লাগিল,—নদীতীরে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম।

"সে দুঃখ রোদনে শান্ত হইল না,—প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রোদন করিলাম। সন্ধ্যার সময় আর সহ্য না করিতে পারিয়া আত্মহত্যার স্থির সংকল্প করিলাম। যাহার এ পৃথিবীতে কেহ নাই, যে মরিলে শোক করিবার কেহ নাই, অথচ নিজ অসহ্য শোক বিস্মৃত হইতে পারে, তাহার আত্মহত্যার বাধা কি ?

"জলে মগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে স্কন্ধে কে হাত দিলেন। ফিরিয়া দেখিলাম আমার প্রাচীন গুরু দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

"অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

"'এক্ষণও মায়াজাল ছিন্ন হয় নাই ?—এক্ষণও জ্ঞান বিকাশ হয় নাই ?—চন্দ্রশেখর অজ্ঞানের কার্য্য করিও না, আমার সঙ্গে আইস।'

"আমি সঙ্গে সঙ্গে এই মহেশ্বরমন্দিরে আসিলাম। পুনরায় যোগ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলাম, গুরুর মৃত্যুর পর অবধি আমিও মহেশ্বরমন্দিরের মহান্ত হইয়াছি।"

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে সহসা একজন বালক আসিয়া মহাশ্বেতাকে মৃদুস্বরে বলিল, "বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য দণ্ডায়মান আছে।" মহাশ্বেতা অতি দ্রুতবেগে সেইদিকে চলিলেন, কিছু পথ যাইয়া পাগলিনীকে দেখিতে পাইলেন। তাহার ভীষণ আকার অধিকতর ভীষণ হইয়াছে, সমস্ত শরীর ভয়ে কাঁপিতেছে, বলিল, "মহাশ্বেতা এইক্ষণেই পলায়ন কর, শত্রু এই আশ্রমে আসিয়াছে।"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "পাগলিনী! তুমি বিপদকালে চিরকালই আমার বন্ধু, তোমার ঋণ কিরূপে শোধ করিব?"

পাগ। "এক্ষণে আপন বিপদ্ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা দেখ।"

মহা। "কোথায় পলাইব?"

পাগ। "রুদ্রপুরে বা ইচ্ছাপুরে, যথায় ইচ্ছা,—শীঘ্র পলায়ন কর।"

মহা। "আশ্রমবাসীদিগের নিকট বিদায় লইব না,—তাঁহাদের দয়া দাক্ষিণ্যের জন্য একবার ধন্যবাদ দিব না?"

পাগ। "আর এক দণ্ডকাল এস্থানে থাকিলে নিশ্চয় মৃত্যু,—চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের চর আপনার সন্ধানে আশ্রমে বেড়াইতেছি।"

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আমার হৃদয়েও সেই সন্দেহ হইয়াছিল। সে কালসর্প না হইলে এ নিরাশ্রয় বিধবাকে দংশন করিতে কে ইচ্ছা করে। হায়! আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াও তোর মানস সম্পূর্ণ হয় নাই, আমাদের প্রাণে বধ করিবি? মৃত্যু!—মৃত্যুকে কে ভয় করে, যদি এই প্রাণের কন্যা না থাকিত তবে আর কাহাকে ভয় করিতাম?"

পাগলিনী পুনরায় বলিল, "চিন্তার সময় নাই।"

মহা। "আমি যদি আপন পরিচয় দিয়া আশ্রমবাসী-দিগের শরণাগত হই, তাহা হইলে কি পরিত্রাণ নাই?"

পাগ। "আশ্রম শুদ্ধ, মহেশ্বরমন্দির শুদ্ধ উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে এত লোক আসিয়াছে,—মহা-শ্বেতা শীঘ্র পলায়ন করুন।"

মহা। "আমিই বা আপনার জন্য আশ্রমবাসী-

দিগের কেন দুর্ঘটন ঘটাইব।—আমার যাহা কপালে আছে হউক, মহেশ্বর! কন্যাকে রক্ষা কর। পাগলিনি! আমি চলিলাম কিন্তু তুমি যে আপদ্ বিপদ্‌কালে আমাদের সহায়তা করিয়াছ, তোমার কি পরিচয় পাইব না?"

পাগ। "অন্য সময়, এখন শীঘ্র পলায়ন কর।" এই বলিয়া পাগলিনী অদৃশ্য হইল।

মহাশ্বেতা দ্রুতবেগে আপন গৃহে যাইয়া শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শিব-প্রতিমা ও কিছু অর্থ লইয়া নদীতীরে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিলেন, "এই রাত্রিতে কি নৌকা পাইব,—মাঝিরা কি কেহ ঘাটে আছে?"—ভাবিতে ভাবিতে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যথার্থই চিন্তা করিয়াছিলেন, দুই একখানি নৌকা ঘাটে আছে কিন্তু একজনও মাঝি নাই। ইতস্ততঃ যাইতে যাইতে দেখিলেন, একখানি নৌকায় অনেক মাঝি আছে ও সকলেই জাগিয়া রহিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন—

"বাপু, তোমরা রুদ্রপুরে যাইবে?"

নৌকারোহীগণ মহাশ্বেতা ও সরলার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণেক পর বলিল, "যাইব, আসুন।"

মহাশ্বেতা আরও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু চিন্তার সময় নাই, "ভগবান্ সহায় হও" বলিয়া মাতা কন্যা নৌকায় উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িল।

মহাশ্বেতা আপনা হইতে শত্রুহস্তে আসিয়া পড়িলেন। সেই নৌকায় চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের চর আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন আশ্রমে সন্ধান করিয়া মহাশ্বেতা ও সরলাকে চিনিয়াছিল, সেই বলিয়াছিল, "যাইব, আসুন।"

নৌকা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গাভিমুখে চলিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কারাবাস।

Below dark rounds the arches hung,
From the rude rock the side walls sprung,
* * * *
A cresset in an iron chain,
Which served to light this drear domain,
With damp and darkness seemed to strive
As if it scarce might keep alive,
* * * *
Fixed was her look, and stern her air,
Back from her shoulders streamed her hair,
The locks that wont her brow to shade,
Started up erectly from her head.

Scott.

প্রাতঃকালের স্বর্ণবর্ণ সূর্য্যরশ্মি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের (আধুনিক চৌবেড়ে) শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রাচীর, স্তম্ভ, গবাক্ষ, কক্ষ, ছাদ সকলই আলোকময় করিতেছে, দুর্গপদচারিণী শান্তপ্রবাহিণী যমুনার উপর ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। নদী-বক্ষে প্রকাণ্ড দুর্গের ছায়া প্রতিফলিত রহিয়াছে, আর দুই একখানি ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে। শীতল সমীরণ ক্ষেত্রস্থিত শিশিরবিন্দুতে সিক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইয়া বহিতেছে, ও ঘাটে যে সকল রমণী স্নান করিতে বা জল লইতে আসিয়াছে তাহা-দিগের শরীর পুলকিত করিতেছে। কৃষকগণ গরু লইয়া মাঠে যাইতেছে ও রহিয়া রহিয়া আনন্দে গান করি-তেছে;—পক্ষীগণও তরুণ অরুণকিরণে পুলকিত হইয়া সেই গানে যোগ দিতেছে। সমস্ত জগৎ আলোকময় ও আনন্দময়। এরূপ হতভাগিনী কে আছে, যে এই

আনন্দের সময় শোকবিহ্বলা হইয়া রহিয়াছে?—মনুষ্যই মনুষ্যের দুঃখের কারণ।

সেই প্রকাণ্ড দুর্গের মধ্যে একটী ঘর ছিল, তথায় আনন্দদায়ী সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারিত না। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে একটী ভীষণ প্রকোষ্ঠ ছিল, তথায় শকুনি ইচ্ছামত বিদ্রোহী প্রজা বা পরম শত্রুকে কখন কখন বদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সে গৃহের ভিত্তি আনন্দ বা হাস্যের ধ্বনিতে কখন প্রতিধ্বনিত হয় নাই,—সে গৃহের অভ্যন্তরে সুখ অথবা ভরসা কখন প্রবেশ করে নাই, তথায় কেবলমাত্র হতভাগ্য বন্দীদিগের ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইত, অশ্রুবিন্দু দৃষ্ট হইত। গৃহতল মৃত্তিকাময়, অন্ধকার নিবারণার্থ একটী হীনজ্যোতিঃ প্রদীপ দিবারাত্রি জ্বলিত। সেই প্রদীপালোকে সেই অসুখজনক গৃহতলে মহাশ্বেতা ও সরলা শয়ন করিয়া রহিয়াছে।

সরলা নিদ্রিত;—মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় মহাশ্বেতার পার্শ্বে বালিকা নিদ্রিত রহিয়াছে, সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর সরলা নিদ্রিত রহিয়াছে। সরলার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে; চক্ষু দুটী কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে: মুখমণ্ডলে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা বা বালিকাভাব দেখা যাইতেছে না, সরলা আর বালিকা নাই,—সহসা অসীম শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া বালিকাসুলভ সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়াছে। সে জাগরণ কি ক্লেশদায়ী! সুখের আশাভরসা একেবারে দূর হয়, মানবজীবনের প্রকৃত অবস্থা একেবারে সম্মুখীন হয়।

সরলার পার্শ্বে মহাশ্বেতা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন,—অনিদ্র হইয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। সে ভীষণ

স্থানে তাঁহার মুখে যে ভীষণ ভাব লক্ষিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত,—সে ভাব ভয়ের নহে, দুঃখের নহে কেবল চিন্তার নহে। তাঁহার হৃদয়ের অমানুষিক অভিমান অদ্য ভীষণ কারাগারে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল; যেন অবারিত অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে,—সূক্ষ্ম ওষ্ঠের উপর দন্ত চাপিয়া রহিয়াছে; সমস্ত মুখমণ্ডলে উন্মত্ততার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, নয়ন নিমেষশূন্য, হৃদয় পূর্ব্বস্মৃতি ও চিন্তাতরঙ্গে প্লাবিত হইতেছে।

ক্ষণেক পর সরলা জাগিল। উঠিয়া মাতার মুখমণ্ডলে অপরূপ ভীষণভাব লক্ষ্য করিয়া ভীত হইয়া বলিল, "মা, সমস্ত রাত্রি তোমার নিদ্রা হয় নাই?"

মহাশ্বেতার চিন্তা-শৃঙ্খল সহসা ছিন্ন হইল, সরলার দিকে চাহিলেন, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া মুখের বিকৃতভাব লীন হইল, চক্ষুতে জল আসিল। মনে মনে ভাবিলেন, "ভগবান্ এই মৃত্তিকাশয্যা যদি অগ্নিশয্যা হইত তাহাও সহ্য করিতে পারিতাম, কিন্তু প্রাণের সরলাকে এ অবস্থায় দেখিয়া চক্ষুতে শূল বিঁধিতেছে।"

সরলা আবার বলিল,—

"মা, তোমার জন্য কল্য যে অন্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা একক্ষণও স্পর্শ কর নাই, যেরূপ ছিল সেইরূপ আছে?"

মহাশ্বেতা উত্তর করিলেন, "আহারে রুচি নাই।"

সরলা পুনরায় বলিল, "না খাইলে শরীর কতদিন থাকিবে?"

মহাশ্বেতা বলিলেন, "বাছা আর শরীর থাকার আবশ্যক কি? ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহার

অগ্রেই আমার মৃত্যু ঘটাইতেন, তাহা হইলে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিতে হইত না।”

সরলা বলিল—“মা, তুমি না থাকিলে আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব, জগতে আর আমার কে আছে যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?”

মহাশ্বেতা সজলনয়নে উত্তর করিলেন, “না মা হত-ভাগিনীর এখনও যাইবার সময় হয় নাই।”

যখন মহাশ্বেতা চিন্তা করিতেছিলেন, সরলাও চিন্তা-শূন্য ছিল না। মাতার দুরবস্থা, আপনার দুর্দ্দশা, ইন্দ্রনাথের চিন্তা এ সকলই সরলার দুঃখের কারণ। কিন্তু তাহার সরল হৃদয়ে এক সময়ে একটীর অধিক চিন্তা স্থান পাইত না। বালিকার হৃদয় অধিক দুঃখ কখন অনুভব করে নাই, অধিক দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না,—একটী চিন্তায় একটী দুঃখে সে হৃদয় পরি-পূর্ণ হইত। বনাশ্রমে ইন্দ্রনাথের চিন্তায় সরলা দিবা-রাত্রি নিমগ্ন থাকিত,—এক্ষণে সে চিন্তা ও আপন দুঃখ-চিন্তা সকলই বিস্মৃত হইল, কেবল মাতার দুঃখ দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল। যে সময় মহাশ্বেতা চিন্তামগ্ন ছিলেন, সরলা একপার্শ্বে বসিয়া একদৃষ্টিতে মাতার দিকে অবলোকন করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে আপন নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল এক একবার কুঞ্চিত হইতেছিল, বিশাল নয়ন দুইটী জলে পরিপূর্ণ হইতেছিল, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাসে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছিল। মাতার দুঃখ দেখিয়া বালিকার হৃদয়ে যে কি যাতনা হইতেছিল, তাহা সেই বালিকাই জানে।

• • •

এমন সময়ে ঝন্‌ঝনা শব্দে কারগারের দ্বার খুলিল। মহাশ্বেতা দ্বারের দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন

না। সরলা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একজন নিরুপমা সুন্দরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন;—বলা আবশ্যক নাই যে, সে সুন্দরী বিমলা।

বিমলা কারাগারের ভিতর যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় একেবারে দুঃখে অধীর হইল। দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের খাদ্যদ্রব্য এখনও স্পর্শ করা হয় নাই, এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছেন, পার্শ্বে একটী তাহার বালিকা বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছে।

বিমলা আপন চক্ষু মুছিয়া, মহাশ্বেতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাতঃ আপনাদিগের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে আপনারা বাহিরে আসুন।"

রমণীকণ্ঠনিঃসৃত করুণাসূচক কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা সেই দিকে চাহিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

বিমলা উত্তর করিলেন, "এই দুর্গাধিপতি সতীশ-চন্দ্রের দুহিতা, আমার নাম বিমলা।"

ক্রোধে মহাশ্বেতা শিহরিয়া উঠিলেন। ক্ষণেকপর ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার পিতাকে বলিও আমা-দের আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই,—যে কয়দিন আছি, আমাদিগকে নির্জ্জনে থাকিতে দাও, তোমরা আসিয়া বিরক্ত করিওনা।"

অন্য সময় এরূপ উত্তর পাইলে মানিনী বিমলা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধের লেশমাত্র উদিত হয় নাই। তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—

"আমার পিতার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতে-ছেন, তিনি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানেন না। আমি

আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে আইসি নাই, এই জঘন্য ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।”

মহাশ্বেতা পুনরায় বলিলেন—

“ ... এইরূপ ঘরে থাকাই ভাল,—যাহার চরণে ... তাহার সে শিকল সুবর্ণের না হইয়া লৌহের হওয়াই উপযুক্ত। যাও আর দয়া ... আবশ্যক নাই, হতভাগিনীদিগের কষ্টের ... আর উপহাস করিও না।”

বিমলা সজলনয়নে উত্তর করিলেন—

“মাতঃ আমি যে আপনাদিগকে উপহাস করিতে আইসি নাই, জগদীশ্বর জানেন”—

বিমলা আরও বলিতেন, কিন্তু মহাশ্বেতা ভীষণস্বরে বলিলেন—

“জগ... রের নাম করিও না,—তোমার পিতা যেন সে পবিত্র নাম কখনও গ্রহণ না করেন, নরাধমের বংশে যেন সে নাম কেহ গ্রহণ করিয়া অপবিত্র না করে।”

বিমলা গম্ভীরস্বরে বলিলেন—

“মাতঃ আপনি আমাদিগকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন। আপনি যেরূপ হতভাগিনী, আমিও সেইরূপ,—হতভাগিনীর জগদীশ্বরের নাম ভিন্ন আর কি আছে?—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই নাম স্মরণ করিব,—এই দুঃখপরিপূর্ণ সংসারে হতভাগিনীর সেই নামই একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সুখ।”

সে পবিত্র নাম শুনিয়া মহাশ্বেতার ক্রোধ একেবারে লীন হইল। বিমলার ঈশ্বর-ভক্তি দেখিয়া মহাশ্বেতা একদৃষ্টে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, দেবকন্যার মত সেই উন্নতপ্রকৃতি রমণীরত্ন দণ্ডায়মান

আছেন। নয়নে অশ্রুজল; মুখে স্বর্গীয় প্রেম ও ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হইতেছে না।

মহাশ্বেতা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"বিমলা, ক্ষমা কর; না জানিয়া তিরস্কার করিয়াছি, দুঃখে বিবেচনাশক্তির লোপ হয়।"

বিমলা মহাশ্বেতাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। নিকটে আসিয়া হস্তধারণ করিয়া বলিলেন—

"মাতঃ ক্ষমা প্রার্থনার কিছুই কারণ নাই—আপনিও দুঃখিনী, আমিও অল্পদুঃখিনী নহি, আমার অবস্থা জানিলে আপনি আমার প্রতিও দয়া করিবেন।"

মহাশ্বেতা বিমলাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করিলেন, দুই জনে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন;—হতভাগিনী সরলাও রোদন করিতে লাগিল। ক্ষণেক পর মহাশ্বেতা বলিলেন—

"বিমলা তোমার দুঃখ আমি বুঝিতে পারিতেছি। পিতার পাপকর্ম্ম দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মপরায়ণা কন্যার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়?"—

বিমলা উত্তর করিলেন, "মাতঃ আপনি এখনও ভ্রান্ত। আমরা যেরূপ হতভাগা, আমার পিতাও সেইরূপ হতভাগা, তাঁহার জীবন মরণ এখনও স্থির নাই। যে পামর আপনাকে ও আমাকে কষ্ট দিতেছে, সে পিতাকেও হতভাগ্য করিয়াছে,—আমি আশঙ্কা করি, সে পিতার মৃত্যু সংকল্প করিতেছে।"

মহাশ্বেতা বিস্মিত হইলেন, ভাবিলেন, "সে কি,—সতীশচন্দ্র ভিন্ন ইহার ভিতর আর কে আছে।"

বিমলা মহাশ্বেতার চিন্তা দেখিয়া বলিলেন, "মাতঃ উপরে আসুন, আমি সকল কথা আপনাকে অবগত করাইব।"

তিন জনে ধীরে ধীরে সেই জঘন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বিমলা সরলাকে ভগিনী মত স্নেহ করিয়া লইয়া যাইলেন। তাঁহাদিগের আহারাদি সাঙ্গ হইলে বিমলা শকুনিসংক্রান্ত সমস্ত কথা মহাশ্বেতাকে অবগত করাইলেন। কেবল বিমলা আপনি যে সেই পামরের নিকট কত অনুনয় কত কষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের কারামুক্তির অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই কথা লুকাইয়া রাখিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এ স্বপ্ন নহে,—পূর্ব্বস্মৃতি।

O! these new tenants dare me call
Intruder in my father's hall!
Wall of my Sires, if ye could speak,
If ye could have a tongue,
Save by the owlet's awful shriek
Or raven's uncouth song,
Fain would I ask of days gone by
And o'er each tale would heave a sigh.

J. C. Dutt

পৃথিবীতে এপ্রকার একরূপ লোক আছে যে, তাহাদিগের মুখ দর্শনমাত্রই নির্দ্দয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়, নিষ্প্রেমের হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হয়, সকলেরই হৃদয়ে ভালবাসার উদ্রেক হয়। মুখের সে ভাব কেবল সৌন্দর্য্য নহে, কেননা সৌন্দর্য্য সকল হৃদয়কে সমরূপে আকৃষ্ট করিতে পারে না,—কতক সৌন্দর্য্য, কতক

অমায়িকতা, কতক বালিকার লজ্জা, কতক বালিকার নির্দ্দোষিতা। এক একখানি মুখের সরলতা ও কিশোর ভাব দেখিলে ইচ্ছা হয় যে, তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিই, তাহার সন্তোষার্থে জগৎসংসার ত্যাগ করি; তাহার সুখসাধনের জন্য চিরকাল দাস হই। এক একখানি মুখের অনির্ব্বচনীয় শান্ত স্বাভাবিক মধুরিমা দর্শনে হৃদয়ে সহসা শান্ত প্রগাঢ় ভালবাসার উদয় হয়,—কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের বক্র শোভা, বিশাল শান্ত নয়নের স্থির জ্যোতি, ওষ্ঠ দুখানির পরিমল সুধা, সমস্ত বদন-মণ্ডলের বালিকাভাব দর্শনে হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হয়,—সেই বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতিমাটীকে হৃদয়ে স্থান দিতে ইচ্ছা করে। সরলা পরমা সুন্দরী নহে, অথচ তাহার মুখে এইরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাব ছিল; হৃদয়ও মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিমলা যে, তাহাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল-বাসিবেন আশ্চর্য্য নহে।

আর এক প্রকার আকৃতি আছে, যাহাকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিবার জন্য প্রকৃতি আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়াছেন। সে জ্যোতিপূর্ণ মুখমণ্ডল, জ্যোতিপূর্ণ নয়নযুগল, সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়, উন্নত ললাট, তুলিকা-চিত্রিতবৎ সূক্ষ্ম ভ্রূযুগল, তনু অঙ্গ, সুগঠিত সুদীর্ঘ অবয়ব, ধীর গম্ভীর পদবিক্ষেপ দেখিলে হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইবার অগ্রে ভক্তির উদয় হয়। সে উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে, সে উন্নত প্রশস্ত ললাটে হৃদয়ের উন্নত ভাব প্রকাশ পায়, সে সূক্ষ্ম ওষ্ঠদ্বয়ে হৃদয়ের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বিরাজ করে। বিমলার এইরূপ সৌন্দর্য্য ছিল, তাঁহারও হৃদয় মুখের অবিকল প্রতিকৃতি। এই-রূপ দেবীর অবয়ব দেখিয়া সরলা যে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা

ভগিনীর ন্যায় ভক্তি করিবে, দেবীর ন্যায় পূজা করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে।

সরলার হৃদয় হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য বিমলা তাহাকে দুর্গের চারিদিক্ দেখাইতে লাগিলেন। প্রথমে দুর্গের পশ্চাতে উদ্যানে লইয়া গেলেন। তথায় আম্রবৃক্ষের নিবিড় ছায়া দিবা দুই প্রহরকেও সন্ধ্যার ন্যায় সুস্নিগ্ধ করিয়াছে। দুইজনে সেই ছায়ায় ক্ষণেক বসিলেন, দুই প্রহরের মৃদু বায়ুতে অল্প অল্প পত্রের মর্ম্মর শুনা যাইতেছে, মধ্যে মধ্যে ঘুঘুর অতি মৃদুপ্রায় অপরিস্ফুট শব্দ শুনা যাইতেছে,—দুই প্রহরে এইরূপ সুস্নিগ্ধ স্থানে যে সেই রব শুনিয়াছে, তাহারই হৃদয় মোহিত ও শান্তিপরিপূর্ণ হইয়াছে।

উভয়ে উদ্যান হইতে সরোবরসমীপে গমন করিলেন। তাহার জল অতি বিস্তীর্ণ, চারি পার্শ্বের আম্রচ্ছায়া আপন স্থির বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দুই জনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সরোবরের ঘাটে বসিয়া রহিলেন, স্বভাবের নিস্তব্ধ শোভা দেখিয়া হৃদয় নিস্তব্ধ হইল। বিমলা মধ্যে মধ্যে কথা কহিতেছেন, সরলার মুখে কথা নাই, নিস্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেছে। ক্ষণেক পর বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সরলা, অত মৌন হইয়া রহিয়াছ কেন? এক্ষণও কি দুঃখচিন্তা করিতেছ? ছি, সে সকল চিন্তা দূর কর।"

সরলা উত্তর করিল, "কৈ না, আমি ত আর সে চিন্তা করিতেছি না।"

সরলা সত্য কথাই বলিল,—তাহার হৃদয়ে প্রাতঃকালের দুঃখের চিন্তা ছিল না, অথচ বিমলার বোধ হইল সরলার হৃদয় চিন্তাশূন্য ছিল না। স্নেহসহকারে তাহাকে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় উঠাইলেন, আপনি

তাহার দাঁড় ধরিয়া সেই বিস্তীর্ণ সরোবরে তরী চালন করিতে লাগিলেন।

সূর্য্য অস্ত যাইবার অনেক পূর্ব্বেই সেই ঘনচ্ছায়ান্বিত আম্রবেষ্টিত সরোবরে অন্ধকার হইতে লাগিল। বিমলার বোধ হইল, যেন তাঁহার প্রিয়সখীর সরলান্তঃকরণেও কোন দুঃখতিমির ঘনীভূত হইতেছে। সরলা আন্তরিক ভাব গোপন করিতে জানিত না, কখন চেষ্টাও করে নাই; বিমলা অনায়াসেই বুঝিতে পারিলেন যে, সরলার হৃদয়ে কোন খেদচিন্তা ঘনীভূত হইতেছে। তিনি যে সকল কথা বলিতেছিলেন সরলার তাহাতে মন নাই,—এক মুহূর্ত্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক শুনিতেছে আবার পরমুহূর্ত্তে চারিদিকে চাহিতেছে আর কি চিন্তা করিতেছে। বিমলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সরলা, আমার নিকট কেন লুকাইলে,—তুমি আবার সেই দুঃখচিন্তা করিতেছ। তুমি চারিদিকে অবলোকন করিতেছ, অদ্য সমস্ত দিনই অন্যমনস্কা হইয়া রহিয়াছ। ছি, সে দুঃখচিন্তা ত্যাগ কর, আইস আমার নিকটে আইস।"

এই বলিয়া বিমলা অতি স্নেহসহকারে সরলাকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া আপন হস্তে তাহার হস্ত ধারণ করিলেন।

সরলা উত্তর করিল, "তোমার কাছে লুকাইব কি জন্য,—সত্য আমার মন কেমন কেমন করিতেছে, কিন্তু যথার্থ বলিতেছি, আমি সে দুঃখচিন্তা করিতেছি না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কি চিন্তা করিতেছ?"

সরলা উত্তর করিল, "জানি, জানি না,—চিন্তা কিছুই নাই,—এক একবার মন কেমন কেমন করিতেছে।"

সরলা সম্পূর্ণ সত্যকথাই কহিয়াছিল। মন কিজন্য চঞ্চল হইতেছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই,—পাঠক মহাশয় যদি পারেন, অনুভব করুন।

সন্ধ্যা হইল, বিমলা ও সরলা উদ্যান হইতে পুনরায় দুর্গাভ্যন্তরে আসিলেন। তথায় আসিয়া বিমলা সরলাকে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিলেন, ও নানারূপ অপরূপ ও বহুমূল্য সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন। আপনার শয়নাগারে লইয়া যাইলেন, তথায় একটী টিয়াপাখি ছিল, সে কথা কহিতে পারিত।

বিমলা সরলাকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "বল্ দেখি এ কে?" পাখি বলিল, "এ কে?"

বিম। "তুই বল্ না, আমি বল্‌ব কেন।"

পাখি। "বল্‌ব কেন।"

বিম। "তবে বুঝি তুই জানিস্ না।"

পাখি। "তুই জানিস্ না।"

বিম। "আমি জানি, তুই বল্ দেখি, সরলা বাহিরের কোন লোক, না এই বাড়ীর মেয়ে?"

পাখি। "বাড়ীর মেয়ে।"

বিম। "পারিলিনি, দূর বাঁদী।"

পাখি। "দূর বাঁদী।"

সে গৃহ হইতে দুই জনে গৃহান্তরে গমন করিলেন। সরলা পাখীর কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। ভাবিল, "আমি কি এই বাড়ীর মেয়ে?"

বিমলা পাখীর কথায় কিছুমাত্র বিস্মিত হয়েন নাই, পাখীর কতদূর বিদ্যা তাহা তিনি জানিতেন,—সে পাখীকে যে কথাগুলি বলা যাইত, কিছু না বুঝিয়া তাহার শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিতে পারিত। বিমলাও এইরূপ করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

যে, শেষ দুইটী কথা উচ্চারণ করিলে একরূপ উত্তর হয়।

তাহার পর বিমলা সরলাকে অন্য একটী কক্ষে লইয়া যাইলেন। কক্ষ দেখিবামাত্র সরলার বিষণ্ণতা দ্বিগুণ হইল, হঠাৎ অন্যমনস্কা হইয়া ভাবিতে লাগিল। বিমলা স্নেহভরে বলিলেন, "আইস, আবার চিন্তা কেন?"

সরলা উত্তর করিল, "আমার মন আরও কেমন করিতেছে, যেন স্বপ্ন দেখিতেছি,—মা কোথায়?"

বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষুতে জল,—নিস্তব্ধে তাহাকে মাতার নিকট লইয়া গেলেন। সরলা দ্রুতবেগে মাতার নিকট যাইয়া অশ্রুপরিপূর্ণনয়নে মাতার বক্ষঃস্থলে লুকাইল।

মহাশ্বেতা অতিশয় ঔৎসুক্য ও স্নেহের সহিত সরলাকে চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি মা, কি হইয়াছে?"

সরলা উত্তর করিল, "মা, আমি জানি না, এ বাটীতে কি আছে, আমি আজ সমস্ত দিন যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি। সকল দ্রব্যই যেন দেখিয়াছি বোধ হইতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র যেন এক বীরমূর্ত্তি—দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। মা, আমি পাগলিনী, সহসা সেই মূর্ত্তিকে পিতা বলিয়া ডাকিলাম। মা আমি অজ্ঞান,—কিম্বা স্বপ্ন দেখিতেছি।"

মহাশ্বেতা আর শুনিতে পারিলেন না,—উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—অজ্ঞান বালিকার কথায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে মহাশ্বেতা কন্যাকে পুনরায় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন,

"সরলা, এ স্বপ্ন নহে, পূর্ব্বস্মৃতি তোমার হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে, যে কথা আমি এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, যে কথা তুমি এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছ বোধ করিয়াছিলাম, সে কথা আপনা হইতেই তোমার অন্তরে উদয় হইতেছে, আর আমি তোমার নিকট কিছু লুকাইব না।"

এই বলিয়া মহাশ্বেতা আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সরলার নিকট বলিলেন। সরলার জন্মকথা, সমরসিংহের সম্মান ও গৌরবের কথা, তাঁহার অন্যায় মৃত্যুর কথা, আপনাদিগের পলায়ন ও ছদ্মবেশের কথা; এ সমস্ত কথা বালিকার সম্মুখে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সেই সকল কথা প্রথমে সরলার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোহজাল অন্তরিত হইতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে দুই একটী কথা স্মরণ হইতে লাগিল। ঘর, দালান, স্তম্ভ দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বকথা জাগরিত হইতে লাগিল।

মহাশ্বেতার লৌহহৃদয়ও অশ্রু দ্রবীভূত হইতেছিল, মাতা কন্যায় পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

বিমলা পার্শ্বে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত, ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত, নয়ন হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। তাঁহার মনের ভাব পাঠক মহাশয় অনায়াসে অনুভব করিবেন। শকুনি যে কতদূর পামর, পিতাকে যে কতদূর পাপকর্ম্মে লিপ্ত করিয়াছে, কিজন্য মহাশ্বেতাকে বন্দী করিয়াছে এ সমস্ত চিন্তা মহা বাত্যার ন্যায় ঘোর গর্জ্জনে তাঁহার হৃদয় আহত ও ব্যথিত করিতেছিল।

বিমলা সহসা চিন্তাস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"মাতঃ, পামর শকুনির পাপ আমি এতদিনে জানিলাম,—এ বিশ্বসংসারে উহার মত পাতকী আর নাই, নরকেও উহার মত কীট নাই। কিন্তু উপরে ভগবান্ আছেন, এ ভীষণ পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত আছে।"

এই গম্ভীর কথা শুনিয়া মহাশ্বেতা আপন চিন্তা ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন.—"বৎস বিমলা, ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি আছে, কিন্তু তাঁহার অভি-প্রায়, তাঁহার লীলাখেলা আমরা বুঝিতে পারি না। না হইলে পাপের জয় কিজন্য?"

বিমলা পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন, "মাতঃ, আমার কথা অবধারণা করুন। পাপের জয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র, পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত অধিক দূর নাই। আমি এই পামরের মৃত্যুর উপায় দেখিতে পাইতেছি,— আপনার স্বামীর মৃত্যুর প্রতিহিংসার বিলম্ব নাই।" এই বলিয়া বিমলা দ্রুতবেগে সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভিখারিণীর রত্ন।

Has sorrow thy young days shaded
  As clouds o'er the morning fleet ?
Too fast have those young days faded
  That even in sorrow were sweet !
Does time with his cold wings wither
  Each feeling that once was dear ?
Come, child of misfortune ! come hither,
  I'll weep thee tear for tear !

Moore.

সন্ধ্যার সময় মহাশ্বেতা পূজার্থ যমুনাতীরে গমন করিলেন, শকুনির তাহাতে আপত্তি ছিল না। যে দুর্গে তাঁহার যৌবনাবস্থা, তাঁহার সুখের দিন গত হইয়াছিল, যথায় তিনি বঙ্গকুলচূড়ামণি সমরসিংহের রাজমহিষী হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন,—আজি সেই দুর্গের পার্শ্বে হীন, নিরাশ্রয় বিধবা বন্দী হইয়া উপাসনা করিতেছেন। পূর্ব্বে দুর্গপার্শ্বে যে তরঙ্গময়ী যমুনা কলকল শব্দে প্রবাহিত হইত, আজিও সেই নদী সেইরূপ ভ্রূকুটী করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মহাশ্বেতা পূর্ব্বে যে ভাবে ঐ নদীর প্রতি অবলোকন করিতেন, অদ্য কি সেই ভাবে অবলোকন করিতেছেন ? দূরে যে পল্লীস্থ বৃক্ষশ্রেণী দেখা যাইত, পার্শ্বে যে আম্রকানন দেখা যাইত, সম্মুখে যে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখা যাইত তাহাতে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু মানবহৃদয়ে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে ! আজি সে পূর্ব্বগৌরব কোথায়, সে দুর্গাধিপতি কোথায়, সে বীরশ্রেষ্ঠ কোথায় ? গ্রীষ্ম-

কালের প্রবল বাত্যায় যেরূপ শুষ্কপত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে বারিবিন্দু যেরূপ লীন হয়,—অতীতকালরূপ অনন্ত সাগরে সেইরূপ গৌরব লীন হইয়াছে।

অনেক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল পর্য্যন্ত যে ব্রত ধারণ করিয়াছেন, আজিও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই। সে ভীষণ ব্রত, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সে জিঘাংসা, তাঁহার জীবনের, তাঁহার ধর্ম্মের এক অংশ হইয়াছিল ; স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আজি পর্য্যন্ত সততই তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। পূর্ব্বপরিচিত অট্টালিকা, দুর্গ, নদী দেখিয়া সে কালাগ্নি দ্বিগুণ তেজে বিধবার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। সে কালাগ্নি যেন অন্য কাহারও হৃদয়ে না জ্বলে, জিঘাংসা যেন কাহারও ব্রত না হয়, কোন নরাধম প্রতিহিংসার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে যেন সাহসী না হয়। হৃদয় হইতে ক্রোধ, দর্প, অভিমান উৎপাটিত কর,—কেবল পরোপকার ও ধর্ম্মসঞ্চয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—এ সংসারে কয় দিনের জন্য আসিয়াছ ?

এ দিকে বিমলা সরলাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার ন্যায় এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা সরলাকে দেখিয়া অবধি তাহাকে ভাল বাসি-তেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও আপন পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছেন, তখন আর তাহার প্রতি যত্নের সীমা ছিল না। পিতা যে অন্যায়, যে ঘোর পাপ করিয়াছেন, তাহার যদি পরিশোধ থাকে, বিমলা, মহাশ্বেতা ও সরলার প্রতি গাঢ় যত্ন ও

স্নেহের দ্বারা তাহার পরিশোধ করিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি কথোপকথন করিতে লাগিলেন, দুই জনই অল্পবয়স্কা ও অবিবাহিতা, দুইজনের মধ্যে শীঘ্রই প্রগাঢ় ও পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইল।

বিমলা বার বার সরলা ও মহাশ্বেতার অজ্ঞাতবাস ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার পল্লীগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলার মুখ হইতে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বিমলার চক্ষু বার বার জলে পরিপূর্ণ হইল, পিতার পাপকর্ম্মে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইতে লাগিল, শকুনির চক্রান্তে তাঁহার শরীর কোপে কণ্টকিত হইতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। সে সকল কথা বলিতে সরলার কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই,—চিরকালই আপনাকে সামান্য কৃষককন্যা বলিয়া জানিত, সে কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইবে কেন? কিন্তু সরলা যে কিছুমাত্র কষ্ট বা দুঃখ অনুভব না করিয়া দারিদ্র্য ও দুঃখের গল্প করিতেছে, ইহাতেই বিমলার উন্নত হৃদয় অধিকতর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অতি স্নেহসহকারে দুই বাহু দ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠের নিকট আপন ওষ্ঠ আনিয়া বার বার সেই সরলচিত্ত বালিকার মুখে সেই দারিদ্র্যের কথা, সেই পল্লীগ্রামে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার সেই এক কথা শুনিতে লাগিলেন, বার বার চক্ষুজলে সরলার নয়ন ও বদনমণ্ডল ও কেশরাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা যখন রুদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু কে ছিল? কৃষকপত্নীরাই কি তোমাদের বন্ধু ছিল?"

কালের প্রবল বাত্যায় যেরূপ শুষ্কপত্র দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মধ্যে বারিবিন্দু যেরূপ লীন হয়,—অতীতকালরূপ অনন্ত সাগরে সেইরূপ গৌরব লীন হইয়াছে।

অনেক্ষণ উপাসনা করিতে লাগিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল পর্য্যন্ত যে ব্রত ধারণ করিয়াছেন, আজিও সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কিছুমাত্র শৈথিল্য হয় নাই। সে ভীষণ ব্রত, সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সে জিঘাংসা, তাঁহার জীবনের, তাঁহার ধর্ম্মের এক অংশ হইয়াছিল; স্বামীর মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আজি পর্য্যন্ত সততই তাঁহার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। পূর্ব্বপরিচিত অট্টালিকা, দুর্গ, নদী দেখিয়া সে কালাগ্নি দ্বিগুণ তেজে বিধবার হৃদয়ে জ্বলিতে লাগিল। সে কালাগ্নি যেন অন্য কাহারও হৃদয়ে না জ্বলে, জিঘাংসা যেন কাহারও ব্রত না হয়, কোন নরাধম প্রতিহিংসার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে যেন সাহসী না হয়। হৃদয় হইতে ক্রোধ, দর্প, অভিমান উৎপাটিত কর,—কেবল পরোপকার ও ধর্ম্মসঞ্চয়ের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর,—এ সংসারে কয় দিনের জন্য আসিয়াছ?

এ দিকে বিমলা সরলাকে আপনার ঘরে লইয়া গিয়া দুই সহোদরার ন্যায় এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বিমলা সরলাকে দেখিয়া অবধি তাহাকে ভাল বাসি- তেন, কিন্তু যখন জানিলেন যে, শকুনি ও আপন পিতার পরামর্শে সরলা অনাথা হইয়াছেন, তখন আর তাহার প্রতি যত্নের সীমা ছিল না। পিতা যে অন্যায়, যে ঘোর পাপ করিয়াছেন, তাহার যদি পরিশোধ থাকে, বিমলা, মহাশ্বেতা ও সরলার প্রতি গাঢ় যত্ন ও

স্নেহের দ্বারা তাহার পরিশোধ করিতে লাগিলেন। দুইজনে একত্র শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ অবধি কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন, দুই জনই অল্পবয়স্কা ও অবিবাহিতা, দুইজনের মধ্যে শীঘ্রই প্রগাঢ় ও পবিত্র ভালবাসার সঞ্চার হইল।

বিমলা বার বার সরলা ও মহাশ্বেতার অজ্ঞাতবাস ও কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার পল্লীগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলার মুখ হইতে সেই সকল গল্প শুনিতে শুনিতে বিমলার চক্ষু বার বার জলে পরিপূর্ণ হইল, পিতার পাপকর্ম্মে হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা হইতে লাগিল, শকুনির চক্রান্তে তাঁহার শরীর কোপে কণ্টকিত হইতে লাগিল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। সে সকল কথা বলিতে সরলার কিছুমাত্র দুঃখ হয় নাই,—চিরকালই আপনাকে সামান্য কৃষককন্যা বলিয়া জানিত, সে কথা বলিতে তাহার কষ্ট হইবে কেন? কিন্তু সরলা যে কিছুমাত্র কষ্ট বা দুঃখ অনুভব না করিয়া দারিদ্র্য ও দুঃখের গল্প করি-তেছে, ইহাতেই বিমলার উন্নত হৃদয় অধিকতর বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি অতি স্নেহসহকারে দুই বাহু দ্বারা সরলাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার ওষ্ঠের নিকট আপন ওষ্ঠ আনিয়া বার বার সেই সরলচিত্ত বালিকার মুখে সেই দারিদ্র্যের কথা, সেই পল্লীগ্রামে নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, বার বার সেই এক কথা শুনিতে লাগিলেন, বার বার চক্ষুজলে সরলার নয়ন ও বদনমণ্ডল ও কেশরাশি সিক্ত করিলেন।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা যখন রুদ্রপুরে ছিলে, তখন তোমাদের বন্ধু কে ছিল? কৃষক-পত্নীরাই কি তোমাদের বন্ধু ছিল?"

সরলা বলিল, "মা কাহারও সহিত অধিক কথা কহিতেন না, দিবাভাগে প্রায় চিন্তায় লিপ্ত থাকিতেন, সন্ধ্যার সময় উপাসনা করিতেন। আমার সহিত দুই একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের আলাপ ছিল। অমলা নামে এক মহাজনের স্ত্রী ছিল, তাহারই সহিত অধিক সময় আমার কথাবার্ত্তা হইত।"

বিম। "সে কি জাতি?"

সর। "জাতিতে কৈবর্ত্ত।"

বিম। "সে তোমাকে ভালবাসিত, তোমাকে যত্ন করিত?"

সর। "বোধ হয়, আমার মাতা ভিন্ন আর কেহ আমাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারে না, তাহার কথা মনে হইলে এখনও চক্ষে জল আসে।"

বিম। "আচ্ছা তোমারা কি ব্যবসায় করিতে?"

সর। "আমি বাড়ীতে সুতা কাটিতাম, চিত্র আঁকিতাম, আমাদের বাড়ীতে বাগান ছিল, তাহার ফল হইত, সুতরাং আমাদের কষ্ট হইত না।"

বিম। "সরলা, তোমাদের প্রতি যে কি অন্যায় হইয়াছে আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। আমার সাধ্যে যদি থাকে, আপনি ভিখারিণী হইয়াও তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা বজায় রাখিব।"

সর। "আমি সত্য বলিতেছি, পল্লীগ্রামে সেরূপ অবস্থায় আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, কিন্তু মাতা দিবারাত্রি চিন্তা করিতেন, সেই জন্য আমার দুঃখ হইত। মাতাকে সুখে রাখ এই আমার ভিক্ষা।"

বিম। "সরলা, আমারও সেই ইচ্ছা, প্রাণ দিয়াও যদি তোমার মাতাকে সুখে রাখিতে পারি, তাহাতেও সম্মত আছি।"

সর। "কেন, তোমার অসাধ্য কি?—তোমাদের এত ধন মানসম্ভ্রম।"

বিম। "সরলা, তুমি আমার সকল কথা জান না, যদি জানিতে তবে আমাকে তোমা অপেক্ষাও হত-ভাগিনী বোধ করিতে। এ ধন, মান আর আমাদের নহে।"

সর। "কেন?"

বিম। "আমি প্রাতঃকালেই বলিয়াছিলাম যে, পামর শকুনি আমার পিতার প্রাণসংহার করিয়া এই দুর্গ ও জমীদারী হস্তগত করবার উদ্যোগ করিতেছে। আমার দিবারাত্রি পিতার চিন্তায় নিদ্রা হয় না। কিন্তু কেবল সেই দুঃখ নহে।"

সর। "আর কি?"

বিম। "সরলা, তোমার নিকট কিছু লুকাইব না। এই পামর আমাকে বিবাহ করিতে চাহে, তাহা হইলে পিতার মৃত্যুর পর অনায়াসে উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে। সরলা, আমার বলিতে লজ্জা করে, এই পামর নরাধম কয়েকদিন অবধি প্রত্যহই বিবাহের প্রস্তাব করিতেছে। আমি অস্বীকার করাতে বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিতে চাহে। আজ তিন দিন হইল, আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিয়া-ছিল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া সময় চাহিলাম, অতি কষ্টে তিন দিনের সময় পাইলাম। আজি রাত্রি-শেষে সেই তিন দিন শেষ হইবে, কল্য প্রত্যূষে সেই নরঘাতক যমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সরলা, আমা অপেক্ষা হতভাগিনী আর কে আছে?"

সরলা বিস্মিত হইল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসা করিল "কাল পরিত্রাণ পাইবে কিরূপে?"

বিমলা অতি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—

"কল্য জগদীশ্বর আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাঁহার কৃপায় কল্য পরিত্রাণের অব্যর্থ উপায় পাইয়াছি। কল্য দিন গত হইলে, নিশিযোগে পিতার নিকট পলায়ন করিব, তাহারও উপায় স্থির হইয়াছে। তাহার পর, স্ত্রীলোকের হস্তে পামরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, তাহারও উপায় পাইয়াছি। ভগবান্, এই দুরূহ কার্য্যে অবলার সহায় হও।"

সরলা বিস্মিত হইয়া রহিল, বিমলা আপনার চিন্তায় অভিভূত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "হাঁ,—মুঙ্গের যাইয়া পিতার পরিত্রাণ করিব,—হত্যার প্রতিহিংসা হইবে, পাপীর শাস্তি হইবে।—তাহার পর পিতার নিকট প্রার্থনা করিয়া এই দুর্গ মহাশ্বেতাকে পুনরায় দান করিব। আমি পিতার অন্তঃকরণ জানি, শকুনির পরামর্শ হইতে মুক্ত হইলে তিনি ন্যায় কর্ম্ম করিতে অস্বীকার করিবেন না। আর তাহার পর জগদীশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, আমার হৃদয়েশ্বর মুঙ্গেরে আছেন,—সরলা, তুমি কখন প্রেমে পড়িয়াছ? তুমি বালিকা, সে চিন্তা, সে যাতনা এক্ষণও জান না।"

সরলা কোন উত্তর করিবে মনে করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ হইতে হঠাৎ একটী কথা বাহির হইল— "জানি।" বিমলা চাহিয়া দেখিলেন, সরলার চক্ষে এক বিন্দু জল!

বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলা, এ কথা আমাকে এতক্ষণ বল নাই," এই বলিয়া সরলার নিকট সমস্ত কথা বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সরলা লজ্জায় অভিভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিল।

বিমলা বুঝিতে পারিলেন, প্রগাঢ় প্রেমে বালিকার হৃদয় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে প্রেমের সীমা নাই, তল নাই। ভাবিতে ভাবিতে একবার গম্ভীর হইলেন, আর এক একবার হাসি আসিতেও লাগিল। ভাবিলেন, "সরলা আমরই মত বিপদে পড়িয়াও রমণীর প্রধান ধর্ম্ম বিস্মৃত হয় নাই;—আমারই মত উহার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ;—আমারই মত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়াছে;—হৃদয়েশ্বরের ঘর, বাড়ী, বংশ, কুল কিছুই জানে না, পরমেশ্বর সরলার মনস্কামনা পূর্ণ করুন।"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন," সরলা, তাঁহার নাম কি?"

সরলা মুখ লুকাইয়া বলিল, "ইন্দ্রনাথ"

বলিবামাত্র বিমলা বজ্রাহতের ন্যায় শিহরিয়া উঠিলেন। সরলা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল, "কি হইয়াছে"

বিমলা উত্তর করিলেন, "কিছু নহে,"—স্মরণ করিলেন জগতে সহস্র ইন্দ্রনাথ থাকিতে পারে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার সহিত কবে তোমার শেষ দেখা হইয়াছে?"

সরলা বলিল,—"অদ্য দুই মাস হইবে তিনি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য পশ্চিমে যাত্রা করিয়াছেন।"

বিমলা আরও বিস্মিত হইলেন,—ঠিক দুইমাস পূর্ব্বে তাঁহার ইন্দ্রনাথও পশ্চিমযাত্রা করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রনাথের অবয়ব আকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সরলা যে বর্ণনা করিল, ইন্দ্রনাথের প্রকৃত আকৃতি নহে, কেন না ইন্দ্রনাথ যেরূপ সুপুরুষ, সরলা তাহার দশ গুণ অধিক করিয়া ব্যাখ্যা করিল। কিন্তু বিমলার হৃদয়ে যে আকৃতি অঙ্কিত ছিল তাহার

সহিত এই বর্ণনা মিলিল,—কেন না বিমলা ও সরলা দুই জনেই ইন্দ্রনাথকে প্রেমচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন,—দুই জনেরই হৃদয়ে একরূপ আকৃতি অঙ্কিত ছিল। বিমলার হৃৎকম্প হইতে লাগিল; শরীরে ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস গাঢ় হইয়া আসিল। অবশেষে তিনি সরলাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তাঁহার শরীরে কোন্ স্থানে কোন্ চিহ্ন আছে?"—নিস্পন্দ শরীরে নির্নিমেষ নয়নে বিমলা এই প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

সরলা বলিল, "তাঁহার বামহস্তের পৃষ্ঠদেশে একটী নিবিড় কৃষ্ণ যৌতুক আছে।"

বিমলা চীৎকার করিয়া শয্যায় বদন লুকাইলেন,—তিনি সে চিহ্ন মহেশ্বরমন্দিরে বার বার লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল।

সরলা বিমলার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

"না" বলিয়া বিমলা সরলার হস্ত সজোরে নিক্ষেপ করিল।

সরলা বিস্মিত হইয়া আবার হস্ত প্রসারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাও ব্যথা পাইয়াছ?"

বিমলা পুনরায় হস্ত সরাইয়া দিয়া উত্তর করিল, "না"—"হাঁ পাইয়াছি, হৃদয়ে"—"না পাই নাই।"

সরলা অধিকতর বিস্মিত হইয়া ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। সেইক্ষণে বিমলার হৃদয়ে বজ্রের আঘাত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর সরলা অতি কাতর করুণস্বরে বলিল,—

"বিমলা, আমার উপর রাগ করিয়াছ? আমি কোন দোষ করিয়া থাকি ক্ষমা কর, আমি অতি অজ্ঞান, হত-ভাগিনী।"

সে করুণস্বরে কাহার হৃদয় দ্রবীভূত না হয়?—বিমলার হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল; বলিলেন,—

"না সরলা তুমি আমার কোন দোষ কর নাই,—আমাকে ক্ষমা কর, আমার শিরঃপীড়া আছে। নিদ্রা যাও, আমিও নিদ্রা যাই, তাহা হইলেই ব্যথা আরাম হইবে।"

সরলা আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বিমলাকে স্নেহ-ভরে আলিঙ্গন করিয়া আপনি ফিরিয়া শুইল। তাহার পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রাবশতঃ মুহূর্ত্ত মধ্যেই নিদ্রায় অভি-ভূত হইল।

বিমলার নিদ্রা হইল না,—সে রাত্রিতে বিমলার যাতনা কে বর্ণনা করিতে পারে? যে ভীষণ বাত্যায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, তাহা ক্ষণকাল পরে নীরব হইল; কিন্তু শান্ত নীরব অথচ মর্ম্মভেদী শোকের প্রবাহ থামিল না। হৃদয়ে যে ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল, সরলার শান্ত বদনমণ্ডল ও মুদিত নয়নের দিকে দেখিতে দেখিতে তাহা ক্রমে লীন হইয়া গেল।

"এই নির্দ্দোষী বালিকা—এই নিরাশ্রয় অনাথা, ইহার কি দোষ, ইহার উপর কি আমি রাগ করিতে পারি। আমরাই সরলাকে অনাথা করিয়াছি, আমরাই মহাশ্বেতাকে বিধবা করিয়াছি, আমরাই তাঁহাদিগকে গ্রামে গ্রামে ভিখারিণীর মত বাস করিতে ও ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য করিয়াছি। সেই গ্রামে বাস করিয়া যে সরলা এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে,—করিয়া জীবন ধারণ করিয়া আছে, সে কেবল এক মাত্র

আশায়,—সে প্রেমের আশা। দরিদ্রাবস্থায় সেই পল্লী-গ্রামে যে রত্ন পাইয়াছে, ভিখারিণীর সে রত্ন কি আমি কাড়িয়া লইতে পারি ?—

"ভিখারিণী কে?——আমাকেই হৃদয়েশ্বর ভিখারিণী বলিয়া জানেন, সরলা তুমিই সে ভিখারিণীর রত্ন কাড়িয়া লইতেছ। সরলা, তোমাদের মান, সম্ভ্রম, সম্পত্তি, জমীদারী আমরা কাড়িয়া লইয়াছি, সে সকল ফিরাইয়া লও,—আরও চাহ, আরও আমাদিগের যাহা কিছু আছে কাড়িয়া লও, সকল সহ্য হইবে;—কিন্তু ভিখারিণীর এ রত্ন কাড়িয়া লইও না,—এ রত্ন কাড়িয়া লইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।" বিমলা দুঃখে অভিভূত হইয়া দুঃখিনীর ক্রন্দন কান্দিতে লাগিলেন,—দরবিগলিত অশ্রুধারায় শয্যা সিক্ত করিলেন।

আজি যথার্থই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি শোকের প্রবাহে, যাতনায় অস্থির হইয়াছিলেন;—"হৃদয়েশ্বর! তুমি কাহার হইবে? সরলা! তোমার নিকট আমি কাড়িয়া লইব না,—পাপে আমাদের বংশ পরিপূর্ণ আছে, আজি হৃদয়-রত্ন তোমাকে দিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।—হায়! বৃথা চেষ্টা, এ রত্ন হৃদয়ের অংশ হইয়াছে, এ প্রেম উৎপাটন করিলে হৃদয় উৎপাটিত হইবে।" পুনরায় অবিরল অশ্রুধারায় শয্যা সিক্ত করিলেন।

আবার ভাবিতে লাগিলেন, "সরলা! এ রত্ন তুমি কোথায় পাইয়াছিলে? দরিদ্র হইলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? পল্লীগ্রামে কুটীরে বাস করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? ভিক্ষা, করিয়া জীবনধারণ করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? আমি দরিদ্র হইব, কুটীরে বাস করিব, আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব, আমাকে এ

রত্নটী দাও। চিরকাল তপস্যা করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়, সাগরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে কি এ রত্ন পাওয়া যায়? আমি ভস্ম মাখিয়া তপস্বিনী হইব, আমি সাগরে ঝাঁপ দিব,—আমাকে এ রত্নটী দাও।—না, সরলা, তোমার এ রত্ন আমি লইব না, পরের দ্রব্যে লোভ করিব না, পরমেশ্বর সহায় হউন, আমা হইতে সরলার যেন আর কষ্ট না হয়, আমি যেন পাপীয়সী না হই। না সরলা, আমি তোমার ইন্দ্রনাথকে লইব না, আমি আপন প্রেম বিসর্জ্জন করিলাম,—প্রেম উৎপাটন করিতে যদি হৃদয় উৎপাটন করিতে হয়, তাহাতেও স্বীকার আছি,—দেখিবে নারীর হৃদয়ে কত সহ্য হয়। আমি দিব্য করিতেছি, তোমার প্রণয়ে সপত্নী হইব না, সরলা! পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।"

পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিলে কোন্ অভাগিনীর দুঃখ শান্তি না হয়। বিমলা পরমেশ্বরের নাম লইয়া হৃদয় সুস্থ করিলেন; প্রতিজ্ঞা করিলেন, হৃদয়ে যাহাই থাকুক, বাহ্যে ইন্দ্রনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইবেন না।

প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্ত করিলেন বটে, কিন্তু একেবারে শোক নিবারণ করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। যে নারী কখনও মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয়ের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বক্ষঃস্থল হইতে হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি বিমলার যাতনা বুঝিয়াছেন। রজনী অধিক হইল, বিমলার চিন্তার শেষ হইল না। এক একবার সরলার চিন্তাশূন্য মুখখানি ও মুদিত নয়ন দুইটী দৃষ্টি করেন, এক একবার চিন্তায় অভিভূত হয়েন, আর এ ক একবার চক্ষু দিয়া নীরবে জলধারা পড়িতে

থাকে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি চিন্তা করিতে লাগি-লেন,—চক্ষুতে অশ্রু ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে চক্ষু পরিপূর্ণ হয়, শেষে ধীরে ধীরে সেই জল বদনমণ্ডল দিয়া বহিয়া শয্যায় পতিত হয়। আবার অশ্রু সঞ্চিত হয়, আবার চক্ষু পরিপূর্ণ হয়, আবার ধারা বহিতে থাকে। সেই গভীর রজনীতে সেই নীরব অশ্রুবিন্দু যে একের পর অন্যটী নিপতিত হইতেছিল, তাহা কে লক্ষ্য করিতেছিল? এই জগৎ-সংসারে রজনীযোগে যে কত নীরব অশ্রুধারা প্রবা-হিত হয়, তাহা কে লক্ষ্য করে?

ক্রমে রজনী প্রভাতপ্রায় হইল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল; ঘরের ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে লাগিল। রজনীযোগে অশ্রুবর্ষণে বিমলার হৃদয় শান্ত হইয়াছে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। বিমলা দেখিলেন, সরলা তখনও নিদ্রিত রহিয়াছে, গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ বদনমণ্ডল আবৃত করিয়াছে, ওষ্ঠ দুইটী ঈষৎ ভিন্ন, তাহার ভিতর দিয়া মুক্তাফলের ন্যায় দন্ত দেখা যাইতেছে। বিমলা প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা করিলেন, তাহার পর সরলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ আমি তোমা অপেক্ষাও দরিদ্র ভিখা-রিণী হইলাম,—পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন।" এই বলিয়া সস্নেহে সরলার ওষ্ঠে চুম্বন করিয়া সে কক্ষ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ অবলম্বন।

"O ! do not tempt" she said ;
O ! do not add to my distress,
I have tasted much of bitterness"
*　　　*　　　*
But ah, fair maid, thou plead'st in vain,
His heart is proof to prayers.
Albeit like darksome floods of rain
Thou shedst they scalding tears.
*　　　*　　　*
One cry she gave, one shriek of wail ;
Her hands her tresses roved among,
Thence drew her mother's parting blade,
Now let the tyrant have his meed,
Now dagger do they deed.

S. C. Dutt.

উপরের পরিচ্ছেদে যাহা লিখিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠিকা হাসিবেন,—বলিবেন, "স্ত্রীলোকে কি কখন সপত্নীর জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন প্রেম বিসর্জ্জন করিতে পারে ? এমন অন্যায় লিখিলে বিশ্বাস করিব কেন,—লেখক স্ত্রীলোকের হৃদয় জানে না।"

আমরা স্বীকার করিতেছি আমাদিগের সাধ্য কি যে স্ত্রীলোকের হৃদয় জানিব,—সে গভীর চক্রান্তে আমরা দন্তস্ফুট করিতে পারি, এরূপ সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে বিমলার সম্বন্ধে আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে, তাঁহার হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা যেরূপ দৃঢ় ও অভঙ্গুর ছিল, পুরুষের হৃদয়েও সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। পরের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিবার তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা

ছিল। ইহার পূর্ব্বে তাঁহার মুখে "হৃৎপিণ্ড উৎপাটন" করিবার কথাও আমরা দুই একবার শুনিয়াছি। আমাদের বোধ হয়, আবশ্যক হইলে তিনি তাহাও করিতে পারিতেন। এ কথাতে যদি পাঠিকাগণ সন্তুষ্ট না হয়েন, তবে আমরা নাচার!

ইন্দ্রনাথের প্রতি বিমলা যে উন্মত্তের ন্যায় আসক্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে। যে দিন দুর্গে চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছিল, সেই দিনই বিমলা পাগলিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি সেই প্রেম গাঢ়ভূত হইবারও অনেক কারণ ছিল।

গৃহে যদি বিমলার অনেক সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কালক্রমে মহেশ্বরমন্দিরের কথা বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু গৃহে অনেক পরিবার থাকিলে সতীশচন্দ্রেরও শকুনির চক্রান্ত সাধনে ব্যাঘাত হইতে পারে, এই জন্য সে গৃহে অধিক লোক থাকিতে পাইত না। সচরাচর হিন্দু জমীদারের বাটী যেরূপ জ্ঞাতি, কুটুম্ব, কুটুম্বিনীতে পরিপূর্ণ থাকে, সতীশচন্দ্রের বাটী সেরূপ ছিল না। সুতরাং বিমলা অনেক সময়ে একাকী বসিয়া থাকিতেন,—সে সময়ে প্রথম প্রেমের চিন্তার মত আর কোন্ চিন্তা ভাল লাগে? দিন গত হইতে লাগিল; মাস গত হইতে লাগিল; সেই চিন্তা গাঢ়ভূত হইতে লাগিল;—তাহার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রেম গাঢ়ভূত হইতে লাগিল।

গৃহে যদি বিমলার সুখের কারণ থাকিত, ভালবাসার পাত্র কেহ থাকিত, তাহা হইলে সেই সুখে অভিভূত হইয়া বা সেই পাত্রকে (ভ্রাতাই হউক ভগিনীই হউক)

ভালবাসিয়া বিমলা মহেশ্বরমন্দিরের চিন্তা কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের বংশের মধ্যে বিমলা একাকী, প্রাণের সহিত ভালবাসিবেন এরূপ এক জনও লোক তথায় ছিল না। আর সুখ,— বিমলার সুখ কি, জগতে বিমলার সুখের কারণ কিছুই ছিল না। পিতা দূরে গিয়াছেন,—যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন সকল সময়েই অনিশ্চিত, তাহাতে আবার শকুনির যেরূপ ধূর্ত্ততা, বিমলার পিতার জন্য সর্ব্বদাই ভয় হইত। আর গৃহে সেই পিশাচ শকুনি বিমলাকে বিবাহ করিবার জন্য দিবারাত্রি জ্বালাতন করিতেছে। তাঁহার উন্নত চরিত্র ও স্থির সহিষ্ণুতা সত্ত্বেও তিনি এত কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না, এত দুঃখচিন্তা সহ্য করিতে পারিতেন না। ভীষণ মেঘের অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতালোক দেখা দেয়, মানবজাতির ঘোর দুঃখ-দুর্দ্দিনেও মায়াবিনী আশা দেখা দেয়।—কেবল দুঃখচিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে, মনুষ্যের প্রকৃতি এরূপ নহে। বিমলার দুঃখ-মেঘের মধ্যে বিদ্যুতালোক কি? বিমলার দুঃখ-দুর্দ্দিনে এক মাত্র আশা কি?—ইন্দ্রনাথের প্রেমের চিন্তা,— রমণীর আর কি হইতে পারে? সেই দুঃখও চিন্তার্ণবে পতিত হইয়া বিমলা প্রেমস্বরূপ একমাত্র ধ্রুব নক্ষত্রে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন,—দুঃখের মধ্যেও সুখ অনুভব করিতেছিলেন।

বিমলা যদি সামান্য বালিকার ন্যায় চঞ্চলচিত্তা হইতেন, তাহা হইলে দুঃখের সময় বাটীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক থাকিত, তাহাদিগের নিকট দুঃখকথা বলিয়া তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া নিজ দুঃখ বিস্মৃত হইতে পারিতেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিমলা গম্ভীরচিত্তা, উন্নতচরিত্রা, মানিনী স্ত্রীলোক

ছিলেন,—আপনার সুখ দুঃখ নীরবে অনুভব করিতেন; আপনার পরামর্শ আপনিই করিতেন। এমন কি সতীশচন্দ্রও কখন কখন আপন ধর্ম্মপরায়ণা মানিনী কন্যাকে ভয় করিতেন, কখন কখন তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতেন। এরূপ স্থিরচরিত্রে কোন প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে প্রস্তরে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শীঘ্র বিলীন হয় না। মহেশ্বর-মন্দিরে বিমলার হৃদয়ে যে প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অনপনেয়।

এই সকল ও অন্যান্য নানাবিধ কারণবশতঃ বিমলার হৃদয়ে যে প্রেম সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে অপনীত হইতে পারে নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহেশ্বর-মন্দিরে যে বীর-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সে বীর-মূর্ত্তি, সে দেব-মূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার নয়নের সম্মুখে জাগরুক ছিল, সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে গভীরাঙ্কিত ছিল। সেই প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দেওয়া কি দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার কার্য্য,—কি বীরত্বের কার্য্য, পাঠক মহাশয় এক্ষণে আলোচনা করুন। রমণী-হৃদয়ে ইহার অধিক বীরত্ব সম্ভবে না।

আজি বিমলার পক্ষে ভীষণ দিন। কিন্তু বিমলা বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে বিমলা শয্যাগৃহ হইতে অন্য একটী গৃহে যাইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উপাসনা করিতে লাগিলেন,—অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা কপোলদেশ প্লাবিত করিয়া বহিতে লাগিল।

উপাসনা সাঙ্গ হইলে বিমলা বাহিরে আসিলেন, আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হাসিও আসিল কান্নাও আসিল। দেখিলেন সরলা একটী মৃণ্ময় কলস

কক্ষে লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সরলা বলিল, "বিমলা তোমার কলস কই? অনেক বেলা হইয়াছে, ঘাটে যাইবে না?"

বিমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? একি সরলা, কলস কেন?"

সর। "ঘাটে জল আনিতে যাইতেছি। বেলা হইয়াছে এক্ষণও জল আনিলাম না, রান্না হইবে কখন? আমি তোমার জন্যই দাঁড়াইয়া আছি।"

বিম। "রান্না অনেকক্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা ঘাটে যাইব কেন, আমরা জল আনিব কেন?"

সর। "তবে কে আনিবে? রুদ্রপুরে ত আপনারাই জল আনিতাম।"

বিমলার চক্ষে জল আসিল। সরলার হস্ত হইতে কলস লইয়া রাখিয়া দিয়া তাহাকে সস্নেহে বলিলেন,—

"আমাদের দাস দাসী আছে, তাহারা সব কার্য্য করিবে, আমাদের কিছু করিতে হইবে না। যাও তুমি মার কাছে যাও তিনি এতক্ষণ উঠিয়াছেন।"

সরলা অতিশয় লজ্জিত হইয়া মাতার নিকট গমন করিল;—বিমলা আপন কক্ষে প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন, শকুনি তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, গাত্রের রক্ত শুকাইয়া গেল।

শকুনি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বিমলার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সর্প যেরূপ ভেককে ভক্ষণ করিবার অগ্রে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ শকুনি বিমলার দিকে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিমলাও নিস্পন্দ শরীরে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমি দিকে এক দৃষ্টে চাহিতে ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভয়ে ও ক্রোধে জর্জ্জরীভূত হইতেছিল। পূর্ব্বরাত্রির কথা

স্মরণ করিলেন, আজি দুই মাস অবধি জগতে যে এক-মাত্র সুখের আশা করিয়াছিলেন, সে আশা দূর হই-য়াছে,—নারী-জীবনের একমাত্র আরাধ্য যে প্রেমের আশা করিয়াছিলেন, সে প্রেমে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন,—হৃদয়ের হৃদয়ে যে প্রতিমাকে স্থান দিয়াছিলেন সে প্রতিমা চূর্ণ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ও একেবারে চূর্ণ হইয়াছে। সেই সকল চিন্তা করিতে করিতে বিমলা অস্থির হইলেন, চক্ষে একবিন্দু জল আসিল, প্রকাশ্যে বলিলেন ;—

"শকুনি, আমি হতভাগিনী,—আমার মত হত-ভাগিনী আর নাই, আমাকে আর দুঃখ দিও না, ক্ষমা কর।"

সে দুঃখের বচনে পাষাণও দ্রবীভূত হইত, শকুনির হৃদয় হইল না। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"এই জন্য বুঝি তিন দিন সময় চাহিয়াছিলে?"

বিম। "আমাকে সময় দিয়াছিলে বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি,—কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর, আমার হৃদয়ে যে কষ্ট হইতেছে, তাহা তুমি জান না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। শকুনি, আমাকে ক্ষমা কর।"

শকু। "বিবাহের আগে সকল স্ত্রীলোকই ঐরূপ করে, শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় সকলেই কাঁদে, কিন্তু একবার গেলে আর বাপের বাড়ী আসিতে চাহে না।"

বিম। "শকুনি, উপহাস করিও না, আমি হৃদয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছি,—উপহাস ভাল লাগে না।"

শকুনি ঈষৎ ক্রোধ সহকারে বলিলেন,—"আমি উপহাস করিতে আইসি নাই। তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা পালন করিতে সম্মত আছ, কি না?"

বিমলা দুঃখের স্বর ত্যাগ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।"

শকু। "প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাক,—আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ, কি না?"

বিম। "জীবন থাকিতে সম্মত হইব না।"

শকু। "আর আমার দোষ নাই, এক্ষণে বল প্রকাশ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।"

বিম। "আমার পিতা থাকিলে তুমি এরূপ কথা বলিতে পারিতে না। পিতার অবর্ত্তমানে, রক্ষাকর্ত্তার অবর্ত্তমানে নিরাশ্রয় অবলার উপর অত্যাচার করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে।"

শকু। "আমি বালিকার নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম শিখিতে আইসি নাই।"

বিম। "তথাপি আমার কথা অবধারণা কর। দেখ, আমার পিতা তোমাকে কত অনুগ্রহ করেন;—তোমাকে দরিদ্রাবস্থা হইতে পুত্রের মত লালন পালন করিয়াছেন; তোমাকে অদ্যাপি পুত্রের মত যত্ন করেন। তাঁহার কন্যার প্রতি অত্যাচার করা তোমার বিধেয় নহে।"

শকুনি আপনার পূর্ব্বকার দরিদ্রাবস্থার কথা শ্রবণে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন,—

"তোমার পিতা সহস্র পাপ করিয়াও যে আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন, সে আমার অনুগ্রহে।"

পিতার নিন্দাবাদে বিমলা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—আরক্ত নয়নে কহিলেন,—

"পামর তুমিই আমার পিতার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, তুমি আবার তাঁহাকে তিরস্কার কর। কুক্ষণে ভৃত্যের বেশে এই দুর্গে আসিয়াছিলে, এক্ষণে প্রভু হইতে

চাহ? ভৃত্যের সহিত বিবাহে বিমলা কখনও সম্মত হইবে না।”

শকু। “কাহার সম্মুখে এরূপ কথা কহিতেছ জান?—তোমার জীবন মরণ, তোমার পিতার জীবন মরণ আমার হস্তে তাহা জান?”

বিম। “জানি,—সতীশচন্দ্রের কন্যা সতীশচন্দ্রের ভৃত্যের সহিত কথা কহিতেছে, সে দিন যে নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণপুত্র অন্নের জন্য পিতার নিকট আশ্রয় লইয়াছে, তাহারই সহিত আমি কথা কহিতেছি।”

বিমলা স্বভাবত মানিনী, পিতার নিন্দাকথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার নয়নদ্বয় কোপে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল,—আলুলায়িত কেশ কপোলে ও উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর পড়াতে তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় দেখাইতেছিল। সে অপরূপ আকৃতি দেখিয়া শকুনিও কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন ও ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা কথঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ করিলেন ও ধীরে ধীরে বলিলেন,—

“আমার মিথ্যা রাগ, শকুনি, আমি জানি আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার অধীনে আছি। তোমাকে যে ভৎসনা করিলাম সে কেবল ক্রোধে অন্ধ হইয়া, পিতৃ-নিন্দা আমি সহ্য করিতে পারি না,—আমার নিকট পিতার নিন্দা করিও না।”

শকু। “আমি তোমার পিতার নিন্দা করিতে আইসি নাই; তোমার পিতা আমার প্রতি যে দয়া করিয়াছেন তাহা আমি বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার উত্তর কি?”

বিম। “আমি জীবন থাকিতে তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।”

শকু। "বিমলা, তুমি অতিশয় বুদ্ধিমতী, আমার হৃদয়ে দয়া, ক্রোধ, দুঃখ, প্রভৃতি নানারূপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া আমার মনস্কামনা হইতে বিরত হইতে চেষ্টা করিতেছ;—বিমলা, তাহা পারিবে না। আমি যে কর্ম্মে যখন দৃঢ়ব্রত হইয়াছি, জগৎ সংসারে কোন লোকই আমাকে তাহা হইতে নিরস্ত রাখিতে পারে নাই। তুমি বালিকা হইয়া যে এত দিন আমাকে এই বিবাহ হইতে নিরস্ত রাখিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি; কিন্তু আর পারিবে না। অদ্যই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে, আমি এতক্ষণ তোমাকে বলি নাই, সকল আয়োজনই প্রস্তুত আছে। পুরোহিত নীচে অপেক্ষা করিতেছেন, দিনের মধ্যে অন্য সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রিতে আমাদিগের বিবাহ দিবেন। বিমলা, তুমি বুদ্ধিমতী, বিবেচনা করিয়া দেখ, আর বাধা দেওয়া নিরর্থক। তুমি বাধা দিলেই বল প্রকাশ করিব, তবে মিথ্যা আর কি জন্য আপত্তি কর, আইস দুই জনে নীচে যাই।"

এই কথা শুনিয়া বিমলা একেবারে জ্ঞানশূন্য হইলেন। কালসর্পে দংশন করিলেও এত চমকিত হইতেন না। তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অজ্ঞানের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—

"পিতা, এ বিপত্তির সময় সহায় হও।"

শকু। "তোমার পিতা মুঙ্গেরে, তোমার বৃথা প্রার্থনা।"

বিম। "তবে জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।" এই বলিয়া বিমলা হস্ত জোড় করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আকাশের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কেশ-

রাশিতে বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়াছে, বেশ-ভূষা বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে; নয়ন দুটী জলে পরিপূর্ণ অথচ অপার্থিব জ্যোতিতে জ্বলিতেছে; কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়াছে, উন্মত্তের ন্যায় ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"জগৎপিতা জগদীশ্বর আমার সহায় হও।"—

সে আকৃতি দেখিয়া শকুনি আবার নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এক দৃষ্টে সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য-রাশির দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিমলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন,—

"শকুনি, তুমি জগদীশ্বরকে ভয় কর, এ পৃথিবীতে এত পাপ করিয়াছ অবশ্যই জগদীশ্বরকে ভয় কর। আমি তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার ভ্রাতা স্বরূপ, আমি তোমার ভগিনী-স্বরূপা, তুমি আমার পুত্রের স্বরূপ, আমি তোমার মাতার স্বরূপা,—আমাকে বিবাহ করিতে চাহিও না।"

জগদীশ্বরের পবিত্রনামে কোন্ পাপীর হৃদয় কম্পিত না হয়?—শকুনি আর সহ্য করিতে পারিল না। বলিল,—"হতভাগিনি! নির্ব্বোধ! দেখিব, কে তোর সহায় হয়," এই বলিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কক্ষ হইতে বাহির করিবার উপক্রম করিল।

বিমলা উত্তর করিলেন,—

"পামর, নরাধম! এই বিপত্তিকালে ভগবান আমার সহায় হইবেন,"—এই বলিয়া শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন, গত তিন দিন চিন্তা করিয়া যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিলেন। বস্ত্রের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিলেন, নবজাত সূর্য্যরশ্মিতে সে ছুরিকা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। ভীরু শকুনি বিস্মিত হইয়া আট হস্ত দূরে যাইয়া দাঁড়াইল।

বিমলা গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি এই পণ করিলাম, যদি তুমি বা অন্য কেহ আমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ দিবার চেষ্টা কর,—সেই মানসে যদি এই কক্ষের ভিতর প্রবেশ কর, তাহা হইলে আমি আপন বক্ষঃস্থল এই ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া একেবারে সকল কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইব। স্ত্রীলোক স্বভাবত বলহীনা, কিন্তু এ পণ হইতে আমাকে কে বিরত করিতে পারে দেখিব!"

শকুনি ক্ষণেক চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"এ বাঘিনীর হস্ত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সেরূপ উদ্যোগ করিলে হঠাৎ হত্যাকাণ্ড হইতে পারে। থাক্, অদ্য থাক্,—নিদ্রাযোগে বিমলাকে বশ করা অনায়াসে সিদ্ধ হইবে, তাহার পর আর এক দিনও শুভকার্য্যে বিলম্ব করিব না, অদ্য পরিত্রাণ পাইল, কল্য পরিত্রাণ পাইবে না।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শকুনি ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ব্বাসন।

> And shall my life in one sad tenour run,
> And end in sorrow as it first begun.
>
> *Pope.*

সকল স্থির হইল। বিমলাকে অদ্য না হয় কল্য বিবাহ করিবেন, কিন্তু মহাশ্বেতার মুখ কিরূপে রুদ্ধ করা যায়? শকুনি তাহারও উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল। সরলা-কেও বিবাহ করিবে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহার

পর মহাশ্বেতা ভীষণ ক্রোধপরবশ হইলেও আপন জামাতার উপর প্রতিহিংসা লইয়া আপন একমাত্র কন্যাকে বিধবা করিতে সাহস করিবেন না।

এইরূপ প্রস্তাব শুনিয়া মহাশ্বেতা ক্রোধে অন্ধ হইলেন, কিন্তু যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার ক্রোধ করা বৃথা। সরলা ভয়ে অস্থির হইল, কিন্তু শকুনি যে প্রতিজ্ঞা করে, তাহা অন্যথা করা কখনও কাহারও সাধ্য ছিল না। বিমলার পরামর্শানুসারে সরলা কিছু দিনের অবসর চাহিল,—যে পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রনাথের সহিত পুনরায় মিলন হইবার ভরসা ছিল, সেই দিন পর্য্যন্ত অবসর চাহিল। শকুনির তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, মনে মনে ভাবিলেন, যত বিলম্ব হউক না কেন, সিংহ-হস্ত হইতে মেষশাবকের উদ্ধারের উপায় সম্ভাবনা নাই।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। বিমলা গোপনে মহাশ্বেতা ও সরলার নিকট বিদায় লইয়া ছদ্মবেশে একখানি নৌকায় আরোহণ করিলেন, সে নৌকা মুঙ্গেরাভিমুখে যাইতেছিল। দুর্গের অতি গুপ্ত স্থান হইতে কতকগুলি কাগজাদি লইয়া যাইলেন, শকুনির জীবন মরণ তাহার উপর নির্ভর করিত।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী বিমলা মুঙ্গেরনিবাসী পুরুষ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া অন্য যাত্রীদিগের সহিত যাইয়া মিশিলেন।

আকাশ অন্ধকারময়, যত দূর দৃষ্ট হয় সম্মুখে ও পশ্চাতে নদীর জল ধূ ধূ করিতেছে, রাশি রাশি মেঘ সেই নীল জলে প্রতিফলিত হইতেছে, অল্প বায়ুতে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তরঙ্গমালা ও ফেনরাশির মধ্য দিয়া নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে। উভয় পার্শ্বে কোথাও বা আম্রকানন, নিশাচরশ্রেণীর ন্যায়

নিবিড় অন্ধকারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ও বায়ুতে গম্ভীর শব্দ করিতেছে, কোথাও বা যতদূর শুভ্র বালুকা-রাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, আকাশে দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, মেঘ ক্রমাগত উড়িতেছে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ পশ্চিমদিকে রাশীকৃত হইতেছে ;—নৌকা কল কল শব্দে চলিতেছে।

বিমলা নৌকার পশ্চাৎভাগে বসিয়া চতুর্বেষ্টিত দুর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে কত যে চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল, কে বলিবে? ছয় বৎসর কাল যে দুর্গে অতিবাহিত করিয়াছেন, স্নেহময়ী মাতার যে দুর্গে মৃত্যু হইয়াছে, যথায় বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়াছেন, আজি সেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসারসাগরে ঝাঁপ দিলেন। সে সাগরের কি কূল আছে, বিমলা কি সেই কূল পাইবেন, আশ্রয়হীনা রমণী কি পিতাকে ফিরিয়া পাইবেন,—সে দুর্গ কি আর কখন দেখিতে পাইবেন? এইরূপ সহস্র চিন্তাতরঙ্গে বিমলার নারীহৃদয় প্রতিহত হইতে লাগিল।

যিনি কখন অনেক দিনের জন্য দেশত্যাগী হইবার মানসে যাত্রা করিয়াছেন, পোতে আরোহণ করিয়া মাতৃভূমির দিকে সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, নিরীক্ষণ করিতে করিতে একেবারে সহস্র সুখদুঃখের কথা স্মরণ করিয়াছেন, সহস্র চিন্তায় অভিভূত হইয়াছেন, পৃথিবীর মধ্যে যাহাকিছু প্রিয় ও সুখকর আছে, সজল নয়নে সকলের নিকট বিদায় লইয়াছেন, অল্প বয়সে সহায়হীন, বন্ধুহীন প্রবাসী হইয়া অনন্তসংসারসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, তিনিই বিমলার সে রাত্রির ঘোর চিন্তা ও ঘোর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন! একাকী নৌকার

পশ্চাৎভাগে বসিয়া সেই গভীর অন্ধকার রজনীতে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের দিকে দেখিতে লাগিলেন। জলের কল কল শব্দ শুনিতে ছিলেন না, আম্রকাননে গম্ভীর শব্দ শুনিতেছিলেন না, তরঙ্গমালার উচ্ছ্বাস ও ফেনরাশির খেলা দেখিতেছিলেন না, ঘোর মেঘের ছটা দেখিতেছিলেন না, কেবল চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ দেখিতেছিলেন, আর সহস্র গভীর চিন্তায় অভিভূত রহিয়াছিলেন। সে ভাবনার শেষ নাই, আকাশ যেরূপ অনন্ত, নদীর স্রোত যেরূপ অবারিত, সে চিন্তাস্রোতও সেইরূপ অনন্ত ও অবারিত। ভাবিতে ভাবিতে বিমলা চারিদিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বভাবত বীরান্তঃকরণ অদ্য দ্রবীভূত হইতে লাগিল,—যখন চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর সে দুর্গ দেখিতে পাইলেন না, কেবল দুর্ভেদ্য তিমিররাশি দেখিতে লাগিলেন, তখন হস্তদ্বয়ে মুখ আবরণ করিয়া দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিলেন, অনেক শোক, অনেক আঘাত না হইলে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বসহ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয় না ;—এতক্ষণ ও এত অধিক ক্রন্দন করিলেন যে তাঁহার অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া অশ্রুজল বাহির হইয়া হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল একেবারে সিক্ত হইয়া গেল।

হা সংসার! হা অসার জগৎ! তোমার মধ্যে বিমলার ন্যায় কত উন্নতচরিত্রা ধর্ম্মপরায়ণা অভাগিনী অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া দিন দিন রোদন করিতেছে, সে রোদন কেহ দেখে না, কেহ শুনে না, কেহ জানে না, সে রোদন অলক্ষিত, অবারিত, অশান্তিপ্রদ! কত নির্ম্মলচরিত্রা অনাথার জীবন জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত কেবল শোক দুঃখে পরিপূর্ণ, সে দুঃখ কেহ জানে না, যদি জানে তবে মোচন করে না। সে দুঃখিনীর সম-

দুঃখিনী কেহ হয় না, কেবল অকূল নদীর জল কল কল শব্দে ও অনন্ত আম্রকানন মর্ম্মর শব্দে সে দুঃখের জন্য রোদন করে! হা অসার জগৎ! তোমার মধ্যে কত পাপিষ্ঠ, পাপপরায়ণ ধনে মানে গৌরবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, লোকের প্রশংসাভাজন হইতেছে। যদি আমাদের ইচ্ছাধীন হইত, কে এ জগতে জন্মগ্রহণ করিত?

বিমলা যে নিরাপদে মুঙ্গের পঁহুছিয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয় জানেন। যে দিন পঁহুছেন সেই দিনই ইন্দ্রনাথের প্রাণরক্ষা করেন। তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ ব্যূহ।

Yet though thick the shafts as snow,
Though charging knights like whirlwinds go,
Through billmen ply their ghastly blow,
 Unbroken was the ring.
The stubborn spearmen still made good,
Their dark impenetrable wood,
Each stepping where his comrade stood,
The moment that he fell.

Scott.

শত্রুরা এক্ষণও মুঙ্গের অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে, টোডরমল্ল এক্ষণও, অসাধারণ যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিয়া, দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। ইন্দ্রনাথ দিন দিন খ্যাতি লাভ করিতেছিলেন, সুযোগ পাইলেই আপনার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ

করিতেন,—অল্পসংখ্যক শত্রু-সৈন্য কোথাও আছে এরূপ সংবাদ পাইলেই, মহারাজের অনুমতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতেন, অধিক শত্রু আসিবার পূর্ব্বেই দুর্গে প্রবেশ করিতেন। বার বার এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া শত্রুরা ব্যতিব্যস্ত হইল,— দুর্গবাসিগণ নব সেনাপতির রণকৌশল, সাহস ও বীরত্ব দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, দিন দিন তাঁহার বীরত্বের যশ বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল।

এক দিন সূর্য্য অস্ত যাইবার সময়, রাজা টোডরমল্ল শত্রুদিগের শিবির দর্শনার্থ দুর্গের প্রাচীর ছাড়িয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গিয়াছিলেন। শত্রুর শিবির সে স্থান হইতে অনেক দূরে, সুতরাং কোন ভয়ের কারণ ছিল না। বিশেষ মহারাজ ছদ্মবেশে গিয়াছিলেন ও তাঁহার সঙ্গে পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী ছিল। অশ্বারোহীগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, রাজা এক দৃষ্টে শত্রুর দিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। সহসা শত্রুপক্ষীয় চারি জন অশ্বারোহী পার্শ্বস্থ বনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজার অনুচরগণ না আসিতে আসিতেই শত্রুপক্ষীয়দিগের মধ্যে একজন খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিল, এমন সময় নিকটস্থ আম্রকানন হইতে সহসা অপর একজন অশ্বারোহী তীরবেগে বহির্গত হইয়া নিমেষ মধ্যে সেই খড়্গাধারীর মস্তক ছেদন করিলেন। সকলেই চাহিয়া দেখিল, ইন্দ্রনাথ! শত্রুগণ বেগে পলায়ন করিল।

ইন্দ্রনাথের বীরত্বের সাধুবাদ করিবার অবকাশ ছিল না। সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, দূরে ধূলিরাশি দেখা যাইতেছে। আরও দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী বায়ুবেগে রাজার দিকে ধাবমান হইতেছে,—দেখিলে

বোধ হয়, যেন অশ্ব ভূমি স্পর্শ করিতেছে না। সে অশ্বারোহী মুহূর্ত্ত মধ্যে নিকটবর্ত্তী হইল, সকলেই চিনিলেন; সে মহারাজের একজন চর। রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া সে লম্ফ দিয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইল, অশ্ব এত বেগে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল যে, অশ্বারোহী অবতীর্ণ হইবামাত্র ঘোটক পড়িয়া গেল ও দুই চারিবার চীৎকার ও শূন্যে পদবিক্ষেপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

ঘোটকের দিকে দেখিবার কাহারও অবকাশ ছিল না। চর প্রণাম করিয়া ভীতচিত্তে বলিল, "মহারাজ! আমাদের শিবিরস্থ কোন বিদ্রোহোন্মুখ সেনার নিকট হইতে শত্রুরা সংবাদ পাইয়াছিল যে, অদ্য মহারাজ সন্ধ্যার সময় দুর্গপ্রাচীরের বহির্গত হইবেন। এই সংবাদ পাইয়া আপনার প্রাণনাশের জন্য এই আম্রকাননে চারি জন অশ্বারোহী লুকাইয়াছিল। আর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে দুই সহস্র অশ্বারোহী অপেক্ষা করিয়াছিল,—সেই দুই সহস্র অশ্বারোহী এক্ষণে আসিতেছে।" চর এইমাত্র বলিয়া শ্রান্তিবশতঃ ভূমিতে পড়িল।

রাজার অনুচরেরা আশঙ্কায় জ্ঞানশূন্য হইল, রাজা আজ্ঞা দিলেন,—

"তোমরা ও অশ্বারোহী, দুর্গের দিকে ধাবমান হও, শত্রুরা আসিবার অনেক পূর্ব্বেই আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিব।"

সকলেই বেগে দুর্গাভিমুখে অশ্বচালন করিলেন।

প্রত্যুৎপন্নমতি ইন্দ্রনাথ দূরে ধূলি দেখিয়াই আপন রণভেরী বাজাইয়াছিলেন, তাঁহার পঞ্চশত অশ্বারোহীও সেই আম্রকাননের এক অংশে কোন কারণবশতঃ স্থাপিত ছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহারা আসিয়া মিলিত হইল। তখন ইন্দ্রনাথ রাজাকে বলিলেন,—

"মহারাজ! যদি আজ্ঞা পাই, আমার পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুদিগকে ক্ষণেক বাধা দিতে পারি। ততক্ষণে আপনারা সচ্ছন্দে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন।"

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন,

"অজ্ঞান বালক! যুদ্ধের উচিত সময় হইলে টোডরমল্ল কখনও পলায়নতৎপর হয় না। বৃথা প্রাণ নষ্ট করা যুদ্ধ নহে, নরহত্যা মাত্র।"

ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন,—

"মহারাজ! ক্ষমা করুন, দিল্লীশ্বরের অধীনের পঞ্চশত অশ্বারোহী বিদ্রোহীদিগের দুই সহস্রের সহিত সমতুল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।"

রাজা সরোষে উত্তর করিলেন,

"সেনাপতির আজ্ঞার উপর উত্তর করিলে প্রাণদণ্ড হয়,—এবার তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" কিঞ্চিৎ পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! আমার দুর্গের মধ্যে সেনাগণ যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহোন্মুখ হইয়াছে, তোমার অধীন পঞ্চশত অশ্বারোহীই আমার প্রধান সম্বল, তাহাদিগকে আমি অন্যায়যুদ্ধে প্রেরণ করিতে পারি না।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সকলে দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলেন। দুর্গের সম্মুখে পরিখা; সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া দেখিলেন, পরিখার উপরিস্থ সেতু ভগ্ন হইয়াছে! যে নরাধম শত্রুদিগকে গোপনে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং অশ্বারোহীদিগের দুর্গে প্রবেশ করিবার উপায় নাই!

সকলেই সন্তরণ করিয়া পরিখা পার হইবার প্রস্তাব করিল। রাজা শত্রুদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া

বলিলেন,—“পার হইতে না হইতে শত্রু আসিয়া পড়িবে, তখন কাপুরুষের ন্যায় শত্রু কর্ত্তৃক সকলে আহত হইয়া জলমগ্ন হইবে। বীরপুরুষের কার্য্য কর, শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ দাও, এইক্ষণেই কাষ্ঠের নূতন সেতু নির্ম্মিত হউক, যতক্ষণ নির্ম্মিত না হয়, শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিব। ইন্দ্রনাথ, তুমি সেনাপতি, এবার সেনাপতির কার্য্য কর।”

“ভৃত্য সাধ্যমত কার্য্য করিবে,” বলিয়া ইন্দ্রনাথ ব্যূহ নির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল। ব্যূহ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতি শ্রেণীতে এক শত অশ্বারোহী। প্রথম শ্রেণীর পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে তৃতীয় শ্রেণী, ইত্যাদি। সুতরাং যুদ্ধের সময় প্রথম শ্রেণী পরিশ্রান্ত হইলে দ্বিতীয় শ্রেণী অগ্রসর হইতে পারিবে, তাহাদের পর আবার তৃতীয় শ্রেণী সম্মুখীন হইবে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক শ্রেণীই এক একবার করিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। সম্মুখে শত্রুর আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, পশ্চাতে পরিখার জল, সেদিক্ হইতে আক্রমণের সম্ভাবনা নাই,—সেই পরিখার নিকট কয়েক জন দুই চারিটী নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া সেতু বন্ধন করিতেছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে শত্রু আসিয়া পড়িল, ইন্দ্রনাথের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইল!

আজি প্রায় তিন চারি মাস পর্য্যন্ত মুঙ্গের নগর বেষ্টিত ছিল, কিন্তু অদ্য যেরূপ দুই পক্ষই ভীষণ সাহস প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল, এরূপ কখনও দেখা যায় নাই। ব্যূহ ভেদ করিতে পারিলেই রাজা টোডর-মল্ল পরাস্ত হইবেন, এই জ্ঞানে শত্রুরা সাগর-তরঙ্গের ন্যায় বার বার ভীষণ আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু

সে ব্যূহ ভাঙ্গিবার নহে,—পর্ব্বতশেখরের ন্যায় বার বার শক্রদলের তরঙ্গমালা দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শক্ররা অধিকসংখ্যক বলিয়া তাহাদিগের বড় উপকার হইল না, কেননা ইন্দ্রনাথ যেরূপ কৌশলে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে একেবারে এক শত জনের অধিক শক্র আসিয়া সে ব্যূহ আক্রমণ করিতে পারিল না, বরং সেই অল্প স্থানের মধ্যে দুই সহস্র সৈন্যের চলাচলের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। তথাপি শক্ররা অদ্য বার বার সিংহ-গর্জ্জন করিয়া সিংহ-বিক্রম প্রকাশ করিতেছিল, বীরমদে উন্মত্ত হইয়া বার বার ভীষণ শব্দ করিয়া সেই ব্যূহভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরাও সাহসে হীন ছিল না। অদ্য তিন চারি মাস অবধি ইন্দ্রনাথের অধীনে যুদ্ধ করিয়া যে যুদ্ধকৌশল শিখিয়াছিল, তাহা অদ্য প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশেষ অদ্য স্বয়ং রাজা টোডরমল্লের দ্বারা চালিত হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ ও উল্লাসের সীমা ছিল না। ইন্দ্রনাথ তীরের মত ব্যূহের এ পার্শ্ব হইতে ও পার্শ্বে, এ দিক্ হইতে ও দিকে অশ্ব চালন করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে শক্ররা অতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিতেছিল, দেখিয়া দেখিয়া সেই সেই স্থানে সম্মুখীন হইতে লাগিলেন এবং আপনার বিচিত্র অস্ত্রচালনা দ্বারা শক্রপক্ষকে কম্পিত করিতে ও স্বপক্ষকে উৎসাহে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আজি মহারাজ স্বয়ং তোমাদের যুদ্ধ দেখিতেছেন," "আজি মহারাজের রক্ষার ভার তোমাদের হস্তে," "আজি দিল্লীশ্বরের নাম ও গৌরব তোমরা রক্ষা করিবে।" এইরূপ উৎসাহবচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ

উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল, সে ভৈরব গর্জ্জনে আকাশ ভিন্ন হইতে লাগিল, শত্রুর হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।

তথাপি দুই সহস্র সৈন্যের সহিত পঞ্চশত সৈন্যের যুদ্ধ সম্ভবে না,—ইন্দ্রনাথের সেনাগণ একে একে নিহত হইতে লাগিল, শত্রুদিগেরও অনেক জন হত ও আহত হইল, কিন্তু দুই সহস্রের মধ্যে এক শত কি দুই শত যুদ্ধে অক্ষম হইলে ক্ষতি নাই, দেখিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন, সেতু নির্ম্মাতাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে বলিলেন ও আপনি সিংহবীর্য্য প্রকাশ করিয়া সেনাদিগকে সাহস দিতে লাগিলেন। একবার ইন্দ্রনাথকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন,—

"ইন্দ্রনাথ তুমি আপন সৈন্যদিগকে যেরূপ রণশিক্ষা দিয়াছ, তাহাতে আমি চমৎকৃত হইলাম। কিন্তু যেরূপ সেনাগণ হত ও আহত হইতেছে, ভয় হয় রণে ভঙ্গ দিবে।"

ইন্দ্রনাথের মুখ রক্ত বর্ণ হইল,—বলিলেন,—

"মহারাজ, আমার সৈন্যদিগকে সম্মুখ যুদ্ধ করিতেই শিখাইয়াছি, রণে ভঙ্গ দিতে কখনও শিখাই নাই। যতক্ষণ একজন অশ্বারোহী থাকিবে, ততক্ষণ সম্মুখ যুদ্ধ হইবে।"

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া বেগে অশ্বধাবণ করাইয়া সকল সৈন্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন ও আপন নৈসর্গিক সিংহতেজ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যেরা উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথও লম্ফ দিয়া পুনরায় সম্মুখে গমন করিলেন। উচ্চৈঃস্বরে আবার বলিতে লাগিলেন, "আজি আমাদের

উৎসবের দিন, নিজের শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিব'; দিল্লীশ্বরের নাম, গৌরব বর্দ্ধন করিব। যোদ্ধার ইহা অপেক্ষা আর কি আনন্দ আছে? বীরগণ অগ্রসর হও।”

সন্ধ্যার ছায়ায় ক্রমে ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্র আবৃত হইতে লাগিল, কিন্তু সে চমৎকার ব্যূহ ভঙ্গ হইল না! একজন অশ্বারোহী হত হয়, তাহার স্থানে অপর একজন অশ্বারোহী আসিয়া দণ্ডায়মান হয়; সে হত হয়, আর একজন আসিয়া তথায় দণ্ডায়মান হয়। শ্রেণী যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, সৈন্যদিগের উৎসাহ ও উল্লাস যেন ততই বর্দ্ধন হইতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছিলেন, পলায়ন কাহাকে বলে, তাঁহার সৈন্যেরা শিখে নাই। আজি রাজার জীবনরক্ষার ভার আমাদের হস্তে, সকলেরই এই কথা স্মরণ ছিল, সকলেই সম্মুখে দৃষ্টি করিতেছে, কেহই পশ্চাতে দেখিতে জানে না। ক্রমে ক্রমে রজনীর অন্ধকার সেই যুদ্ধক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিল, যোদ্ধা ও প্রতিযোদ্ধাদিগকে আচ্ছন্ন করিল, হত ও আহতদিগকে আচ্ছন্ন করিল, অশ্ব ও অশ্বারোহীকে আচ্ছন্ন করিল; কিন্তু সে অপরূপ যুদ্ধ সাঙ্গ হইল না, সে আশ্চর্য্য ব্যূহ ভঙ্গ হইল না। শত্রুগণ হতাশ হইয়া একবার বেগে শেষ আক্রমণ করিল, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া একবার শেষ আক্রমণ করিল। দুই সহস্র অশ্বারোহীর সে ভীষণ গর্জ্জন চারিদিকে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, আকাশের মেঘ পর্য্যন্ত কম্পিত হইল,—দুই সহস্র অশ্বের যুগপৎ পদবিক্ষেপে মেদিনী কম্পিত হইল, কিন্তু সে শব্দে ও সে পদবিক্ষেপে ইন্দ্রনাথের ব্যূহ কম্পিত হইল না। সে ভীষণ গর্জ্জন ভীষণতর গর্জ্জন দ্বারা প্রতিধ্বনিত করিল, সে আক্রমণ-

কারীদিগকে আবার তাহারা দূরে নিক্ষেপ করিল। যুদ্ধ সাঙ্গ হইল না, সে অপরূপ ব্যূহ ভঙ্গ হইল না।

অবশেষে সেতু নির্ম্মিত হইল। রাজা পরিখা পার হইলেন, রাজা নিরাপদে আসিয়াছেন শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সৈন্যগণ একেবারে সিংহ-গর্জ্জন করিল,—সে গর্জ্জন এক ক্রোশ দূরে শত্রু-শিবির প্রবেশ করিল। তখনই তাহারা জানিল, যে জন্য দুই সহস্র সৈন্য পাঠান হইয়াছিল, তাহা বৃথা হইয়াছে।

আক্রমণকারীগণ ভগ্নোদ্যম হইয়া নীরবে নিজ শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল, যতক্ষণ রাজা টোডরমল্ল সেতু পার হইতেছিলেন, ইন্দ্রনাথ একদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, রাজা নিরাপদে দুর্গে প্রবেশ করিয়াছেন, ইন্দ্রনাথ সহসা আপন অশ্ব হইতে পতিত হইলেন। শত্রুর বর্শাতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভিন্ন হইয়াছিল, শোণিতে তাঁহার শরীর প্লাবিত হইয়াছিল। বলশূন্যতাবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রনাথের সৈন্যেরা অনেকেই সেতু পার হইয়াছিলেন। শত্রুগণ যাইবার সময় দেখিল, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়াছেন। উল্লাসে চীৎকার করিয়া ইন্দ্রনাথকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। ইন্দ্রনাথ বন্দী হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

The soldier's hope, the patriot's zeal,
For ever dimmed, for ever crossed,
Oh ! who shall say what heroes feel,
When all but life and honor's lost.

The last sad hour of freedom's dream,
And valor's task moved slowly by.
While mute they watched till morning' beam,
Should rise and give them light to die.

There's yet a world where souls are free,
Where tyrants taint not nature's bliss,
If death that world'sbright opening be,
Oh ! who would live a slave in this.

Moore.

রাজা টোডরমল্ল যখন শুনিলেন, যে ইন্দ্রনাথ আহত হইয়া শত্রুদিগের বন্দী হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকিল না। বলিতে লাগিলেন, "আজি দিল্লীশ্বরের যথার্থই পরাজয় হইয়াছে! ইন্দ্রনাথ, তুমি আমার জন্য বন্দী হইলে? তোমার পিতা যখন আমার নিকট একমাত্র পুত্রকে ফিরিয়া চাহিবেন, আমি কি বলিব।" ইন্দ্রনাথের জন্য শিবিরের সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। গৌরব ও সম্পদের দিনে ইন্দ্রনাথ সকলের সহিত সদাচরণ করিতেন, সামান্য সেনার প্রতিও অতিশয় বাৎসল্য ও দয়ার সহিত আচরণ করিতেন; সকলের সহিত আত্মনির্ব্বিশেষে কথা কহিতেন। সুতরাং আজি ইন্দ্রনাথের বিপদের দিনে সকলেই তাঁহার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

রাজার দুই এক জন বিশ্বস্ত সেনাপতি রাজাকে বলিলেন,—

"মহারাজ! আর আমাদের দুর্গের ভিতর থাকিবার আবশ্যক নাই। আজ্ঞা করুন, শত্রুকে আক্রমণ করি। তাহা হইলে এক্ষণও ইন্দ্রনাথকে পাইব,—আমাদের অবশ্যই জয় হইবে।"

রাজা উত্তর করিলেন, "ইন্দ্রনাথকে হারাইয়াছি, ভগবান জানেন পুত্রশোকেও আমার এরূপ দুঃখ হইত না, কিন্তু এক্ষণে যুদ্ধে গমন করিলে তোমাদের মত বিশ্বাসী আর দুই চারি জন যে সেনাপতি আছেন, তাঁহাদেরও হারাইব।"

সেনা। "কেন? আপনি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছেন কিজন্য?"

রাজা। "আমাদের সৈন্যেরা যদি যুদ্ধ করে, তাহা হইলে অবশ্য জয়লাভ হইবে। কিন্তু তোমাদের মত কয় জন বিশ্বাসী সেনাপতি আছে? আমি আশঙ্কা করি, যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেই আমার অধিকাংশ সৈন্য শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিবে।"

সেনা। "আপনি এরূপ আশঙ্কা কিজন্য করিতেছেন?"

রাজা। "সেনাপতি! টোডরমল্ল কখনই অমূলক আশঙ্কা করে না। কল্য যখন আমরা দুর্গের বাহিরে গিয়াছিলাম, কি প্রকারে আমাদের পশ্চাতে সেতু ভগ্ন হইয়াছিল? কিরূপে শত্রুরা আমাদিগের গূঢ় বিষয়ের সংবাদ পাইয়াছিল? এক প্রহর কাল আমরা যুদ্ধ করিতেছিলাম, কিজন্যই বা তাহার মধ্যে দুর্গ হইতে কেহই পরিখা পার হইল না, আমাদিগের সাহায্যার্থ আইসে নাই?"

সেনা। "মহারাজ, আমাদের সৈন্যেরা জানিতে পারে নাই, জানিলে অবশ্যই আপনার সাহায্যে যাইত। তাহারা সকলেই দুর্গের অপর পার্শ্বে ছিল, কল্য একটা মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই সকলে রত ছিল।"

রাজা। "সত্য, অধিকাংশ সৈন্য উৎসবে মত্ত ছিল, আমাদিগের যুদ্ধকথা কিছুই জানিতে পারে নাই। কিন্তু আমি জানি, একজন সেনাপতি ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পরিখার অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিল। পামর গোপনে যেরূপ বিদ্রোহাচরণ করিয়াছে, আমার সমক্ষে যদি সেইরূপ বিদ্রোহাচরণ করিতে সাহস করিত, তাহা হইলে কল্যই আমাদের বিপদের সময় বিপক্ষ সৈন্যের সহিত যোগ দিত। সেনাপতি! এইরূপ সৈন্য লইয়া তুমি আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দাও? তাহা হইলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শত্রুর কৌশলজালে পতিত হইতে হইবে।"

ইন্দ্রনাথের জন্য সকলেই দুঃখিত হইলেন, কিন্তু হতভাগিনী বিমলা একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। বিমলা যে দিন নদী হইতে ইন্দ্রনাথকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ইন্দ্রনাথ বিমলাকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। সরলার প্রতি ইন্দ্রনাথের প্রগাঢ় প্রেম ছিল; ছয় বৎসর কাল হইতে যে বালিকাকে ভাল বাসিয়াছিলেন, তাহাকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ সরলার পূর্ব্বগৌরব, এক্ষণকার দারিদ্র্য ও নিরাশ্রয়তা, সরলার সুন্দর অকপট বদনমণ্ডল ও সরল অকপট অন্তঃকরণ, সরলার রুদ্রপুরে কুটীরে বাস ও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম,—এ সকল কথা যখন ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে জাগরিত হইত, তখন লৌহ বর্ম্মের

ভিতরও তাঁহার হৃদয় স্ফীত হইত, তখন যুদ্ধসজ্জায়ও ইন্দ্রনাথের চক্ষু শুষ্ক থাকিত না। যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ পরিশ্রমের পরও ইন্দ্রনাথ নিশিযোগে সেই নিস্তব্ধ শান্ত পাদপাচ্ছাদিত রুদ্রপুর স্বপ্নে দেখিতে পাইতেন,— সেই সরলচিত্ত বালিকা ঘাটে জল আনিতে যাইতেছে, অথবা বৃক্ষতলে বসিয়া সূতা কাটিতেছে, অথবা চন্দ্রা-লোকে উদ্যানে দাঁড়াইয়া সজলনয়নে ইন্দ্রনাথের সহিত কথা কহিতেছে! সে কথা কি সুধাময়—ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তের জন্য স্বর্গসুখ ভোগ করিতেন, স্বপ্নে যেরূপ সুখ অনুভব করা যায়, জগতে কি সেরূপ সুখ আছে?

কিন্তু যদিও সরলার প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম ছিল, তথাপি বিমলাকে দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়ে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ রমণী কে? অদৃষ্টপূর্ব্বা, অসীম রূপরাশিসম্পান্না এ অল্পবয়স্কা যুবতী কে? মহেশ্বরমন্দিরে সহসা দেখা দিয়াছিলেন, ভিখারিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন, দুই চারিটি সুধাপরিপূর্ণ কথায় ইন্দ্রনাথের হৃদয় আনন্দিত করিয়া-ছিলেন। আবার সহসা একদিন অপরূপ বেশে দেখা দিয়া ইন্দ্রনাথকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়া ছিলেন, আপ-নাকে প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন অথচ প্রেমাশায় জলাঞ্জলি দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন! এ অপরূপ কন্যা কে? মানুষী না দেবকন্যা? যেরূপ উজ্জ্বল লাবণ্যবিভূষিতা, তাহাতে দেবকন্যা বা বিদ্যা-ধরী বলিয়া বোধ হয়,—সেরূপ উজ্জ্বল রূপরাশি ইন্দ্রনাথ কখনও দেখেন নাই, সরলার স্তিমিত সৌন্দর্য্য তাহার সহিত তুলনা হয় না।

আর বিমলা! হতভাগিনী, দগ্ধহৃদয়া বিমলা মুঙ্গেরে পিত্রালয়ে কিরূপে ছিলেন? তিনি প্রেমের আশায়

জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমের চিন্তায় জলাঞ্জলি দেওয়া রমণীর সাধ্য নহে। সে গূঢ় চিন্তা কোরকের ভিতর কীটের ন্যায়, বস্ত্রের ভিতর অগ্নির ন্যায় নিভৃত রহিল।—নিভৃত রহিল, কিন্তু হৃদয়কে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতে লাগিল। আশ্রয়হীনা সরলা যেরূপ ইন্দ্রনাথের প্রেমে নিমগ্ন হইয়াছিল, হতভাগিনী বিমলাও সেইরূপ হইলেন। তথাপি বাহ্যিক ভাবভঙ্গী ও কার্য্যে সরলার ও বিমলার প্রেমে অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। বনাশ্রমের শান্ত বৃক্ষতলে দিবারাত্রই বালিকার নয়ন দুইটী অশ্রুতে আপ্লুত হইত,—সরলা সময় পাইলেই কমলা বা অমলার নিকট দুঃখ-কথা বলিয়া শান্তি লাভ করিত। বিমলাকে কেহ কখন প্রেমের নাম উচ্চারণ করিতে শুনে নাই, কেহ কখন নয়নবারি বর্ষণ করিতে দেখে নাই। প্রেমচিন্তারূপ অগ্নিশিখায় হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছিল, কিন্তু মুখে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না, কার্য্য কর্ম্মে সকল সময়ে মনোযোগী, ধীর, শান্ত। দিন গেল, সপ্তাহ অতীত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, বিমলার আকৃতিতে কেহ কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিল না, কেবলমাত্র বদনমণ্ডল দিনে দিনে ঈষৎ রক্তশূন্য হইল ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, কেবলমাত্র তাঁহার উজ্জ্বল নয়ন দিনে দিনে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ধারণ করিতে লাগিল, তাহা ভিন্ন দৈনিক কার্য্যে বিমলার দাসদাসীরাও কোন বৈলক্ষণ্য দেখিল না। বিমলার পিতা রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক কোন বিশেষ কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বিমলার মুখমণ্ডলে যে অল্প পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল দাসদাসীরা স্থির করিল, পিতার চিন্তাই তাহার কারণ।

এরূপ সময়ে বিমলা একদিন সহসা শুনিলেন, ইন্দ্রনাথ আহত হইয়া শত্রুদিগের বন্দী হইয়াছেন! রমণীর হৃদয়ে অনেক সহ্য হয়, সকল সহ্য হয় না—বিমলার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইল। তথাপি সে মর্ম্মান্তিক ব্যথাও কাহাকে বলিলেন না, নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন, নীরবে রজনী দুই প্রহরের সময় সপ্তদশ বর্ষীয়া কামিনী একাকী অসহায় পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, অসহায় সংসারসাগরে ঝাঁপ দিলেন।

পরদিন প্রাতে দাস দাসীগণ বিমলাকে আর দেখিতে পাইল না। বিমলা কোথায়? হতভাগিনী কি আর জীবিত আছে, পাগলিনী কি আত্মহত্যা দ্বারা অসহনীয় দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, উৎক্ষিপ্ত হৃদয়কে শান্তি দান করিয়াছে?—ভীষণ চিন্তা!—কিন্তু না করিবে কি জন্য? যাহার ইহকালে সুখ নাই, সুখের আশা নাই, যাহাকে ভগবান্ কেবল মাত্র দুঃখভার বহন করিবার জন্য জীবন দান করিয়াছেন সে যদি সে জীবন বহন করিতে অস্বীকৃত হয়,—সে যদি সেরূপ জীবনকে উপলখণ্ডের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া সেই দুঃখভারের সহিত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কালের অতল সমুদ্রে নিক্ষেপ করে,—কে বলিবে সে পাপাত্মা বা অকৃতজ্ঞ,—কে বলিবে তাহার সে কার্য্যে দোষ স্পর্শে?

এদিকে শত্রুরা ইন্দ্রনাথকে অচেতন অবস্থায় বন্দী করিয়া শিবিরে লইয়া চলিল। অনেকক্ষণ পর পুনরায় ইন্দ্রনাথের চেতনা সঞ্চার হইল। তখন যাহা দেখিলেন, তাহাতে সামান্য লোক হইলে ভয়ে হতজ্ঞান হইত।

দেখিলেন তাঁহার চারিদিকে শত্রুসমূহ আসীন রহিয়াছে। সম্মুখে এক উচ্চ সিংহাসনে মাসুমী কাবুলী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে মহা-

মান্য পাঠান ওমরাহ ও অমাত্যগণ বসিয়া রহিয়াছে। ইন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের মধ্যে টোডরমল্লের বিদ্রোহী সেনাপতি তর্খান ও হুমায়ুনকে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রনাথের পশ্চাতে নিষ্কোষিত অসিহস্তে এক শত সেনা দণ্ডায়মান রহিয়াছে,—যদিও ইন্দ্রনাথ এক্ষণে হীনবল তথাপি শত্রুরা তাঁহাকে বিশ্বাস করে না, আহত সিংহও লম্ফ দিয়া ব্যাধদিগকে সংহার করিতে পারে, এই ভয়ে শত খড়্গধারী ইন্দ্রনাথকে রক্ষা করিতেছিল। ইন্দ্রনাথের নিকটে ভীষণাকৃতি জল্লাদ কুঠারহস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, প্রভুর দিকে নিমেষশূন্য লোচনে চাহিয়া রহিয়াছে, আজ্ঞা বা ইঙ্গিত পাইলেই এই ভীষণ বৈরীর শিরশ্ছেদন করিবে। ইন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত হইলেন না। তীব্রদৃষ্টিতে মাসুমীর প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

মাসুমীও ইন্দ্রনাথকে চেতনাবস্থায় দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

"হিন্দু! তুমি বীরপুরুষ, কিন্তু বিদ্রোহাচরণ করিয়াছ,—বিদ্রোহাচরণের দণ্ড শিরশ্ছেদন!"

ইন্দ্রনাথ ভীষণ স্বরে উত্তর করিলেন, "যোদ্ধা মৃত্যু আশঙ্কা করে না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, যাহা ক্ষমতায় থাকে কর, আমি বিদ্রোহাচরণ করি নাই।"

মাসুমী ইন্দ্রনাথের উগ্রভাবে কিছুমাত্র কুপিত না হইয়া বলিলেন,—

"টোডরমল্লের সহিত যোগ দিয়া বঙ্গদেশের প্রাচীন শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্রোহাচরণ নহে?"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "বঙ্গদেশের অধীশ্বর, সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর আকবর-

সাহের জন্য আমি বিদ্রোহী পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি।”

সকলেই ভাবিলেন, ইন্দ্রনাথ আপনি আপনার মৃত্যু ঘটাইতেছেন, সকলেই ভাবিলেন মাসুমী সেই ক্ষণেই ইন্দ্রনাথের শিরশ্ছেদনের আদেশ দিবেন। কিন্তু মহানুভব সাহসী মাসুমী হীনবল, অসহায় হিন্দুর এরূপ নির্ভীকতা দর্শনে কুপিত হইলেন না, বরং আহ্লাদিত হইলেন। ধীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—

“বীর! তুমি যেপ্রকারে আমার সহিত আচরণ করিতেছ, অন্য কেহ হইলে তাহার সমুচিত দণ্ড দিত, আমি এবার তোমার উগ্রতা ক্ষমা করিলাম, তোমার বীরত্ব দেখিয়া আনন্দিত হইলাম—কিন্তু তুমি বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজবংশকে আর কখন বিদ্রোহী বলিও না। যাঁহারা ক্রমান্বয়ে চারি শত বৎসর এই বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন,—বখ্‌তীয়ার খিলিজীর সময় হইতে যে পাঠানেরা একাধীশ্বর হইয়া হিন্দুদিগকে শাসন করিয়াছেন, তোমার পিতা, তোমার পিতামহ, তোমার প্রপিতামহ যে রাজবংশের অধীনে বাস করিয়াছেন, সেই পাঠান বিদ্রোহী, না অদ্য যে অন্যায়াচারী দিল্লীর অধীশ্বর চাতুরী ও প্রতারণা দ্বারা আমাদের পুরাতন সাম্রাজ্য লইতে চাহে সে বিদ্রোহী?”

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন,—

“পাঠানরাজ! আপনারা বঙ্গদেশের পুরাতন অধিপতি আমি অস্বীকার করি না। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগের অধীনে বাস করিতেন অস্বীকার করি না। কিন্তু কোনও জাতির জয় পরাজয় চিরস্থায়ী নহে, কোনও জাতির সুদিন বা দুর্দ্দিন চিরস্থায়ী নহে, উন্নতি অবনতি চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যদি তাহা না

হইত, যদি পুরাতন রাজাদিগের শাসন চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে মুসলমানেরা কোথায় থাকিত, তাহা হইলে আজি হিন্দুরাজ্যের গৌরব-সূর্য্য চিরান্ধকারে অস্ত যাইত না; তাহা হইলে আমি অদ্য দিল্লীশ্বরের জন্য যুদ্ধ না করিয়া রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি চিরস্মরণীয় ভারতবর্ষের একাধিপতি রাজাদিগের অধীনে যুদ্ধ করিতাম। কিন্তু সে পুরাতন হিন্দু-গৌরব অস্তমিত হইয়াছে, পাঠানরাজ! আপনাদিগের গৌরবও তিরোহিত হইয়াছে, বিধির নির্ব্বন্ধের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কেন শোণিতস্রোতে সুন্দর বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন?"

ইন্দ্রনাথের সগৌরব কথা শুনিয়া সকলেই নিস্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া রহিলেন, অনিমেষলোচনে সেই হীনবল আহত যোদ্ধার দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মাসুমীর বীরান্তঃকরণে মর্ম্মান্তিক পীড়া জন্মিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ যখন তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তিনি অধিক বিরক্ত হয়েন নাই, কিন্তু স্বজাতীয়দিগের গৌরব অস্তে গিয়াছে, এ কথায় তাঁহার হৃদয়ে শূল বিঁধিতে লাগিল। যে স্বজাতির পুনরুন্নতির জন্য তিনি দিবানিশি চিন্তা করিতেছিলেন, যে পাঠানরাজ্য স্থাপনার জন্য তিনি মহাপরাক্রান্ত দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে কোপের সঞ্চার হইতেছিল, শরীরে উষ্ণ শোণিত সঞ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু সে কোপ প্রকাশ না করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হিন্দু! তোমরা বিধির নির্ব্বন্ধের উপর প্রত্যয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী পাঠানেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না,

অধীনতা স্বীকার করিবে না। পাঠান-গৌরব-সূর্য্য এক্ষণও অস্ত যায় নাই।”

ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, “যে দিন কটকের মহা-যুদ্ধে দায়ুদ খাঁ পরাজিত হয়েন, সেই দিনই পাঠানের গৌরব-সূর্য্য অস্তে গিয়াছে। যে দিন সন্ধিকথা বিস্মৃত হইয়া দায়ুদ খাঁ পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই দিন পাঠানদিগের বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ হয়। দায়ুদ খাঁ নিজ শোণিতে সে বিদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করেন;—সেই অবধি যে যে পাঠান সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেন, সেই সেই পাঠানই সেইরূপ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন।”

মাসুমী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল। ভীষণ স্বরে বলিলেন,—

“হিন্দু! তোমার জীবন, মৃত্যু আমার হস্তে, তোমার কি জীবনের অভিলাষ নাই যে আমার সম্মুখে এইরূপ কথা কহিতেছ?”

নির্ভীক ইন্দ্রনাথ সেইরূপ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, “আমার জীবনের সুখের দ্রব্য, মায়ার দ্রব্য, ভাল-বাসার দ্রব্য এক্ষণও সকলই আছে;—কিন্তু এ সকল থাকিতেও যখন তোমাদের হস্তে পড়িয়াছি, তখন জীবনের আশা রাখি না।”

মাসুমী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, “সাহসী পুরুষ শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে,—যাঁহারা জয় নিশ্চয় জানেন, তাঁহারা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা ভীরু, যাঁহারা নিজের জয় সংশয় করেন, তাঁহারা শত্রুকে কখনও ক্ষমা করিতে পারেন না, পাঠানের হস্তে আমি ক্ষমার প্রত্যাশা করি না।”

অনেকক্ষণ কথা কহিতে কহিতে ইন্দ্রনাথের হীনবল শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছিল, বিশেষতঃ শেষে যে কথা কহিতেছিলেন তাহাতে বক্ষ হইতে পুনরায় শোণিত-স্রোত নির্গত হইতে লাগিল।

মাসুমী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "পামর! কৌশলবাক্যের দ্বারা ক্ষমা পাইবার প্রত্যাশা করিও না।"

ইন্দ্রনাথ পুনরায় সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "আমি কোন প্রত্যাশা করি না,—কেবল এই প্রত্যাশা করি যে, জল্লাদ আপন কার্য্য শীঘ্রই নিষ্পন্ন করিবে। আমার শরীর সবসন্ন হইয়া আসিতেছে, বিলম্ব করিলে যোদ্ধা কিরূপে মরে তাহা দেখিতে পাইবে না।"

মাসুমী উত্তর করিলেন, "তাহাই হইবে। জল্লাদ! বিলম্বে কার্য্য নাই।"

কিন্তু জল্লাদকে সে ভীষণ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইল না। ইন্দ্রনাথের ক্ষত হইতে রক্তস্রোত ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ত্বরায় শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, পুনরায় চেতনশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

মাসুমীর হৃদয় স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর নহে। আহত, বল-হীন, চৈতন্যহীন যোদ্ধার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন না। বলিলেন, "অধুনা কারাগারে লইয়া যাও।"

ইন্দ্রনাথ কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

রমণীর বীরত্ব।

The midnight passed, and to the massy door
A light step came—it paused—it moved once more;
Slow turns the grating bolt and sullen key—
'Tis as his heart foreboded—that fair she!
Whate'er her sins to him a guardian saint,
And beauteous still as hermit's hope can paint:
* *
"Why shouldst thou seek an outlaw's life, to spare
"And change the sentence I deserve to bear?"
* *
"Why should I seek?—hath misery made thee blind,
"To the fond workings of a woman's mind?
And must I say? Albeit my heart rebel
"With all that woman feels but should not tell—
* *
"Reply not, tell not now thy tale again,
"Thou lov'st another—and I love in vain;
"Though fond as mine her bosom, form more fair,
"I rush through peril which she would not dare."

Byron.

একটী ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কারাগারে একজন বীরপুরুষ তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কারাগারের একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়া প্রাতঃকালের তরুণ রৌদ্র আসিতেছে, অন্ধকাররাশির মধ্যে সেই রৌদ্রের রেখা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সেই রৌদ্ররেখায় খেলা করিতেছে,—উঠিতেছে—নাবিতেছে—একবার রৌদ্ররেখায় দেখা যাইতেছে, আবার অন্ধকাররাশিতে লীন হইতেছে। দুই একটা ক্ষুদ্র পক্ষী সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেছে, আবার ক্ষণেকপর উড়িয়া যাইতেছে,—সে বন্দী নহে,—পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষশাখায় বিচরণ করিতে

পারে, জগৎ-সংসারে ও আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে পারে। বীর পুরুষ সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া সেই বাতায়নের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন,—অন্ধকার-স্থিত লতাপল্লব যেরূপ বাহু বিস্তার করিয়া আলোকের দিকে ধায়, বন্দীর নয়ন সেইরূপ বাতায়নের দিকে রহিয়াছে। বন্দী কি চিন্তা করিতেছেন? রৌদ্ররেখায় পতঙ্গসমূহের খেলা দেখিয়া ও নিজ অবস্থা স্মরণ করিয়া কি খেদ করিতেছেন? পতঙ্গগণ একদিন মাত্র কি এক প্রহর মাত্র জীবিত থাকে,—বন্দী কি সেই এক প্রহর বা এক দিনের নিশ্চিন্ত সুখের জীবন অভিলাষ করিতেছেন? বাতায়নাগত পক্ষীগণ যখন পুনরায় পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া যাইতেছে, বন্দীও কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে মানসপক্ষ বিস্তার করিয়া সুন্দর জগৎ সংসার ও অনন্ত নীল আকাশে পর্য্যটন করিতেছেন?

ইন্দ্রনাথ এ সকল চিন্তা করিতেছেন না। তাঁহার হৃদয়কন্দরে ইহা অপেক্ষা দুঃখজনক চিন্তার উদ্রেক হইতেছে। তাঁহার আর জীবনের আশা নাই,—পাঠানেরা যদি সেই সময়েই তাঁহাকে হত্যা করিত, তাহাতে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠুর পামরেরা তাঁহাকে কারাবাসে রাখিয়া চিন্তাগ্নিতে দগ্ধ করিতেছে। ইন্দ্রনাথ যোদ্ধা,—যোদ্ধার মৃত্যুতে ভয় নাই। কিন্তু তিনি মরিলে অন্যের কি ক্লেশ হইবে, সেই চিন্তায় তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা পুণ্যাত্মা নগেন্দ্রনাথ এই বার্দ্ধক্যে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিলে জীবন ত্যাগ করিবেন। নগেন্দ্রনাথের আর কেহই নাই, ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই, অন্য পুত্র নাই, বৃদ্ধ একমাত্র পুত্রের উপর চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলেন, সেই

পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে নগেন্দ্রনাথের গৃহ শূন্য হইবে, হৃদয় শূন্য হইবে, বৃদ্ধ প্রাণত্যাগ করিবেন। পিতার কথা স্মরণ করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের চক্ষুতে জল আসিল, যোদ্ধা চক্ষুর জল মোচন করিলেন।

আর সেই অজ্ঞান বালিকা, সেই প্রেমবিহ্বলা সরলা, সেই সহায়হীনা, সম্পত্তিহীনা, কুটীরবাসিনী সরলা, তাহারই বা কি দশা ঘটিবে? সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—সে সপ্তম পূর্ণিমা অতীত হইবে, বালিকা আশানেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে নয়ন মুদিত করিবে, জীবন অভাবে অপরিস্ফুট পুষ্পের ন্যায় নীরবে অসময়ে শুকাইবে। চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রনাথের মস্তক ঘুরিতে লাগিল, নয়ন দৃষ্টিশূন্য হইল,—বলিলেন, "ভগবন! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, বিধির নির্ব্বন্ধে যাহা আছে হউক, আমি আর এ চিন্তাযাতনা সহ্য করিতে পারি না।"

পাঠানদিগের মধ্যে ইন্দ্রনাথকে পীড়ার সময় যত্ন করে এরূপ কেহই ছিল না। কারাগারের পার্শ্বে প্রহরীগণ নিঃশব্দে খড়্গহস্তে দিবারাত্রি দণ্ডায়মান থাকিত। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একজন ব্রাহ্মণ নিঃশব্দে আহারীয় দ্রব্য আনয়ন করিয়া দিত,—আহার সাঙ্গ হইলে একমাত্র দাসী নিঃশব্দে সেই স্থান পরিষ্কার করিয়া যাইত। ইহা ভিন্ন আর কেহই সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে কোন নিষ্ঠুর পাঠান সেনাপতি ইন্দ্রনাথের এই দুর্দ্দশায় উপহাস করিতে আসিতেন, অথবা কোন যথার্থ সাহসী, উন্নতচরিত্র সেনাপতি, শত্রুপক্ষীয় বীরপুরুষের হীনাবস্থা দেখিয়া যথার্থ শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে আসিতেন। শত্রুর উপহাসে ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে কিছুমাত্র বেদনা

হইত না,—যাহার যথার্থ গুণ আছে, সে কবে সামান্য লোকের উপহাসে কাতর হয়?—কিন্তু শত্রু হইয়াও ইন্দ্রনাথের দুঃখে যথার্থ দুঃখ প্রকাশ করিলে ইন্দ্রনাথের হৃদয় দ্রবীভূত হইত।

পাঠানশিবিরের মধ্যে ইন্দ্রনাথের কেবল একমাত্র বন্ধু ছিল। যে দাসী প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেই কারা-গৃহ পরিষ্কার করিতে আসিত, সেই ইন্দ্রনাথের দুঃখে যথার্থ দুঃখিনী। দাসী স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের পাঠান মোগল জ্ঞান নাই, শত্রু মিত্র জ্ঞান নাই, পরের দুঃখে চিরকালই দুঃখিনী। আমাদের সুখের সময়, সম্পদের সময়, আহ্লাদের সময় রমণী কতবার দ্বেষ করেন; কতবার ক্রোধ করেন, কতবার মুখরা হইয়া কলহ করেন, কিন্তু যখন জীবনাকাশে দুঃখরূপ মেঘরাশি সঞ্চিত হইতে থাকে, যখন আমাদের আশাপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে আমরা ভীষণ নৈরাশ-তিমিরে আচ্ছন্ন হই, যখন ক্লেশ বা শোকে বা পীড়ায় আমরা বিহ্বল হই, তখনই রমণী যথার্থ আপন ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, তখন রমণীর মত আমাদের দুঃখে কে দুঃখিনী হয়, আমাদের পীড়ায় কে শুশ্রূষা করে, আমাদের শোকে কে ভরসা দান করে, আমাদের বিপদে কে আশ্বাস দেয়? পীড়ার শয্যায় অনিদ্র, অবিশ্রান্ত হইয়া দিবা-নিশি কে উপবেশন করিয়া পীড়িতের শুষ্ক ওষ্ঠে জল, দুগ্ধ দান করে? শোকের সময় আপনার হৃদয়কবাট উদ্ঘাটন করিয়া কে অবারিত অশ্রুবর্ষণে আপন বসন সিক্ত করিয়া আমাদের সমদুঃখিনী হয়? বিপদের সময় কে অনন্ত মায়ার ভাণ্ডার হইতে অনন্ত অজস্র মায়া-স্রোত দ্বারা আমাদের সান্ত্বনা দেয়? জগতে রমণী-রত্নের মত রত্ন নাই। স্বর্গে কি আছে?

ইন্দ্রনাথের দুঃখে সেই দাসীই যথার্থ দুঃখিনী। প্রত্যহ নীরবে আসিয়া নীরবে প্রস্থান করিত বটে, কিন্তু সেই সুপুরুষের দুঃখ দেখিয়া অন্তরালে অশ্রুবিন্দু বর্ষণ করিত। নির্দ্দয় পাঠান বন্দীকে অতিশয় কষ্টে রাখিয়াছিল,—শয়নের জন্য ভূমিতে কেবলমাত্র তৃণশয্যা রচিত হইয়াছিল,—দাসী ইন্দ্রনাথের জন্য আপন বস্ত্র দ্বারা সেই তৃণশয্যা মণ্ডিত করিয়া যাইত। পাঠানেরা ইন্দ্রনাথকে দিনের মধ্যে কেবল একবার মাত্র অপকৃষ্ট আহার দিত, দাসী আপনি অনাহারে থাকিয়া ইন্দ্রনাথকে নানাপ্রকার সুপথ্য আনিয়া দিত, ইন্দ্রনাথ তাহা জানিতে পারিতেন না। ইন্দ্রনাথের পীড়ার সময় পাঠানেরা কোন চিকিৎসক পাঠায় নাই। দাসী, ইন্দ্রনাথ সুপ্ত বা পীড়ায় জ্ঞানশূন্য থাকিলে তাঁহার ক্ষতগুলি জলে ধৌত করিয়া পুনরায় পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিত। সেই করুণা-জলসেচনে ইন্দ্রনাথের ক্ষত আরাম হইতে লাগিল, তিনি দিন দিন আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ প্রায় আপন চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন, তথাপি সময়ে সময়ে দাসীর দুঃখ এক একবার লক্ষ্য করিতেন। অন্ধকারে দাসীকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন না, সস্নেহে কথা কহিতে চাহিলে দাসী ধীরে ধীরে প্রহরীর দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিত। ইন্দ্রনাথ আবার নিস্তব্ধ হইয়া আপন চিন্তায় অভিভূত হইতেন।

প্রহরীগণ দাসীর এই স্বাভাবিক করুণা দেখিয়া কখন কখন উপহাস করিত, বলিত, "এ বিবি, এ হিন্দু কি তোমাকে শাদী করিবে?" এরূপ উপহাসে দাসী বিরক্ত হইত না, কখন কখন উত্তর দিত, কখন কখন প্রহরীদিগকে সুরাপান করিতে দিত। সুতরাং সকল প্রহরীই দাসীর উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। সমস্ত রাত্রি দণ্ডায়-

মান হইয়া চৌকী দিবার সময় সেই নবপ্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী দাসীর কথা ভাবিত,—নিদ্রার সময়ে স্বপ্নে সাকী ও সুরাপেয়ালার কথা ভাবিত।

অদ্য রজনীতে দাসী রক্ষকদ্বয়কে সুরাপান করিতে দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। রজনী প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, দাসী সুরা লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিয়া প্রহরীদ্বয়ের মন একেবারে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল। একে সেই স্বর্গীয় সুরা তাহার উপর কুরঙ্গনয়না সাকী স্বহস্তে ঢালিয়া দিতেছে,—প্রহরীদ্বয় কখন কখন দুই একটী বায়েৎ শুনিয়াছিল, সুরাদেবীর প্রভাবে সেই বায়েৎ মনে পড়িতে লাগিল। ক্রমে সুরা মস্তকে উঠিতে লাগিল, রজনী দ্বিপ্রহরের মধ্যে প্রহরীদ্বয় অজ্ঞানাবস্থায় শয়ন করিয়া পেয়ালা ও সাকীর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। দাসী কারাগারে প্রবেশ করিল।

রজনী দ্বিপ্রহর হইয়াছে। আজি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গভীর নীল আকাশে সহস্র মেঘ রাশীকৃত হইতেছে, দূরে কিছুই দেখা যায় না। দূরে গঙ্গানদী অতি শান্ত মৃদু কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার অপর পার্শ্বে অনন্ত বৃক্ষাবলী সেই অনন্ত বারিরাশির উপর লম্বিত হইয়া রহিয়াছে। জগতে শব্দমাত্র নাই—কেবল মধ্যে মধ্যে বৃক্ষকোটর হইতে পেচক ভীষণ শব্দ করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে প্রহরীগণ ভীষণতর স্বরে শিবির রক্ষা করিতেছে।—আর সমস্ত জগৎই সুষুপ্ত।

ঘরের ভিতর তৃণশয্যায় বীরপুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। আজি ইন্দ্রাপুর নগরস্থ তাঁহার বহুমূল্য পালঙ্ক কোথায়? পিতার স্নেহ, সরলার ভালবাসা, রাজা টোডরমল্লের বাৎসল্যভাব এ সমস্ত কোথায়? বীর-

পুরুষ সেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছেন। জগৎ তাঁহার পক্ষে অন্ধকারময়, জীবন শোকপরিপূর্ণ, নিদ্রাই তাঁহার পক্ষে ক্ষণস্থায়ী আরাম।

ইন্দ্রনাথের ললাট পরিষ্কার, ওষ্ঠে হাসির চিহ্ন,—এ দুঃখসাগরে তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, যেন আজি সপ্তম পূর্ণিমা,—যেন অদ্য তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পুনরায় রুদ্রপুরে গিয়াছেন,—যেন বহুদিন পরে হৃদয়ের সরলাকে পাইয়া হৃদয়ে স্থান দিতেছেন,—যেন তাঁহার নয়নজলে সরলার কৃষ্ণ কেশরাশি সিক্ত হইতেছে, যেন সরলার আনন্দাশ্রুতে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইতেছে। নিদারুণ বিধি! যে হতভাগার পক্ষে কিছুই নাই, জগতে সুখ নাই, তাহাকে এমন স্বপ্ন হইতে কেন জাগরিত কর,—এমন সুখের নিদ্রা থাকিতে থাকিতে কেন সে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয় না?

সরলার অশ্রুজলে যেন ইন্দ্রনাথের হৃদয় অধিকতর সিক্ত হইতে লাগিল, ক্রমশঃ অধিক শীতল হইতে লাগিল। শীত বোধ হওয়াতে ইন্দ্রনাথ জাগিয়া উঠিলেন, দেখিলেন, যথার্থই শ্রাবণ মাসের বারিধারার ন্যায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে অশ্রুধারা পড়িতেছে—নিকটে দাসী বসিয়া নীরবে দরবিগলিত অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছে!

ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিলেন। দাসীর মায়া ও দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল, আপনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "দাসী! হতভাগার দুঃখে তুমি কি জন্য দুঃখিনী, আমার জন্য ক্রন্দন করিও না, আমার আর জীবনের আশা নাই,—পরমেশ্বর তোমাকে সুখী করুন। তুমি আমার দুঃখ

বিস্মরণ হও;—আমি আমার কারাবাসের একমাত্র বন্ধুকে জন্মান্তরেও বিস্মৃত হইব না।”

দাসী উত্তর করিল না,—নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ আপন দুঃখবেগ সম্বরণ করিয়া আবার বলিলেন,—“দাসি! আমি তোমাকে কিছু দিয়া পুরস্কার করি এরূপ আমার কিছুই নাই, যাহা আছে তাহা তোমাকে দিলাম” এই বলিয়া আপন বাহু হইতে সুবর্ণ বলয় দাসীকে দিতে উদ্যত হইলেন।

দাসী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন, “ইন্দ্রনাথ! আমি ভিখারিণী বটে, কিন্তু অর্থভিক্ষা করি না।”

বিমলার কণ্ঠধ্বনি যে একবার শুনিয়াছে সে কদাচ বিস্মৃত হইতে পারে না। ইন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

“একি ভিখারিণি! তুমি আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়াছ, দাসীবেশ ধারণ করিয়াছ,—শত্রু-শিবিরে আগমন করিয়াছ?”

বিমলা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—“জগতে কোন্ স্থান আছে,—নরকে কোন্ স্থান আছে যথায় প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধির জন্য নারী যাইতে ভয় করে।”

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া এক দৃষ্টিতে বিমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বিমলা বলিলেন, “ইন্দ্রনাথ! আমি আপনার উদ্ধা-রের উপায় সংকল্প করিয়াছি,—প্রহরীগণ চৈতন্য-শূন্য হইয়াছে,—আপনি রমণীর বেশ করিয়া চলিয়া যাউন, পথে জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই,—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে বলিবেন,‘আমি ভিখারিণী দাসী।’”

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "আমি শত্রুর হস্ত হইতে, মৃত্যুর হস্ত হইতে অন্ধকারে রমণীর বেশ ধারণ করিয়া পলাইব না,—সে পুরুষের কার্য্য নহে।"

মানিনী বিমলার বদনমণ্ডল আরক্তবর্ণ হইল, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"স্ত্রীজাতি আপনাদিগের ঘৃণার পাত্র, বীরপুরুষ তাহাদিগের বেশ ধারণ করিতে স্বীকার করিবে কিজন্য?"

ইন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "ভিখারিণি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি তাহা বলি নাই। রমণী আমাদিগের প্রেমের পাত্র, আমাদিগের জীবনের জীবন। বিশেষ তুমি আমার এক দিন জীবন রক্ষা করিয়াছ, অদ্য আমার রক্ষার জন্য দাসীবৃত্তি স্বীকার করিয়াছ, যে দিন আমি এ উপকার বিস্মৃত হইব, যে দিন তোমাকে তাচ্ছল্য করিব, ভগবান যেন সেই দিন আমার নিধন সাধন করেন।"

বিমলা ধীরস্বরে বলিলেন, "তবে রমণীর বেশ পরিধান করিতে সঙ্কোচ করিতেছেন কিজন্য?"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—

"রমণী কোমলা, প্রেমবিহ্বলা, ক্লেশসহনে অক্ষমা! এগুলি রমণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে, কিন্তু কোমলতা ও অসহিষ্ণুতা যোদ্ধার পক্ষে খাটে না,—যোদ্ধা এই জন্যই রমণীর বেশ ধারণ করিতে সঙ্কোচ করে।"

বিমলার বদনমণ্ডল আবার রক্তবর্ণ হইল,—বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ! আপনি রমণীজাতিকে জানেন না, রমণী-জাতির সহিষ্ণুতা কখনও আপনি দেখেন নাই। গত কয়েক মাস হইতে আপনার যশে মুঙ্গের পরিপূরিত হইয়াছে, আপনি বন্ধুবান্ধব ত্যাগ করিয়া, আহার নিদ্রা

ত্যাগ করিয়া কেবল যুদ্ধকার্য্যে যে সহিষ্ণুতা দেখাইতে-ছেন, সমস্ত বঙ্গদেশে তাহা রাষ্ট্র হইয়াছে! কিন্তু আমি এই অন্ধকার নিশি সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, এই মুঙ্গেরে একজন রমণী আছেন, যে আপনা অপেক্ষাও দুর্ব্বহনীয় ভার, ভীষণতর যাতনা, আপনা অপেক্ষা অপরূপ সহিষ্ণুতার সহিত নীরবে বহন করিয়াছে,—আহতা কপোতীর ন্যায় নীরবে আপন হৃদয়ের ক্ষত সহ্য করিয়াছে! ইন্দ্রনাথ! ভগবান আপনাকে অনেকদিন নিরাপদে রাখুন, কিন্তু বিধির ইচ্ছা কেহই জানিতে পারে না।—কল্য যদি আপনি সিংহবিক্রম প্রকাশ করিয়া বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হয়েন, আর আপনাকে উদ্ধার করিয়াছি বলিয়া নিষ্ঠুর পাঠানগণ যদি আমাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হত্যা করে, জানিবেন যে আপনি যেরূপ ভয়শূন্য উল্লাস-পরিপূর্ণ হৃদয়ে যোদ্ধার মরণ স্বীকার করিবেন,—আপনার উদ্ধার সাধন করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছি, এই বিশ্বাসে এই অভাগিনী তদপেক্ষা উল্লাসের সহিত মরিতে সম্মত হইবে! সে অগ্নিরাশি দর্শনে মস্তকের একটী কেশও কম্পিত হইবে না, নয়নে একবিন্দু জলও লক্ষিত হইবে না! যখন অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইবে, তখন পর্য্যন্ত ওষ্ঠে উল্লাস ও সহিষ্ণুতার হাস্য বিরাজমান থাকিবে,—পাঠানগণ রমণীর শরীর ভস্মীভূত করিতে পারে, কিন্তু রমণীর বীরত্ব জয় করিতে পারিবে না। ইন্দ্রনাথ, নারীজাতিকে সহিষ্ণুতায় অক্ষম বলিও না,—সহিষ্ণুতার জন্যই নারীজাতি জন্মগ্রহণ করে।”

এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,—অনিমেষ লোচনে সেই বীরাঙ্গণার প্রতি দৃষ্টি করিতে

লাগিলেন, সেই গম্ভীর আকৃতি, সেই উন্নত প্রশস্ত ললাট, সেই কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে সেই অনলবিক্ষেপী নয়নদ্বয়, সেই রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল, সেই কম্পিত হৃদয় লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—অনেকক্ষণ পর বিমলা আবার অতি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,—

"ইন্দ্রনাথ, ক্ষমা করুন, আমি প্রেমের পরিচয় দিতে আইসি নাই, আপন অহঙ্কারার্থও আইসি নাই, যাহা বলিলাম বিস্মরণ হইবেন।"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন,—"ভিখারিণি! আজি যাহা দেখিলাম জন্মান্তরেও বিস্মৃত হইব না,—স্ত্রীলোকের বীরত্ব নাই, একথা আর আমি কখনও বলিব না;—কি করিতে হইবে বল, আমি তোমার বেশ ধরিতে সম্মত আছি—কিন্তু আমি গেলে কিরূপে তোমার উদ্ধার হইবে?"

বিমলা বলিলেন, "আমার জন্য চিন্তা করিবেন না, আমার উদ্ধারের উপায় আছে,—উদ্ধার না হইলেও অধিক ক্ষতি নাই। ভিখারিণীর জন্য চিন্তা করিবে, ভিখারিণীর জন্য শোক করিবে জগতে এরূপ কেহ নাই। অনন্ত সাগরের মধ্যে একটী জলবিম্ব যেরূপ লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই জগৎসংসারে একজন হতভাগিনীর মৃত্যু অশ্রুত, অলক্ষিত ও অচিন্তিত থাকিবে। ভগবান আমার স্থানে জগতে যাহাকে পাঠাইবেন, তাহাকে যেন আমা অপেক্ষা সুখী করেন।"

ইন্দ্রনাথ বিমলার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধীর ভাবে বলিলেন, "ভিখারিণি! তুমি আমার উদ্ধারে যত্নবতী হইয়াছ, তাহার জন্য আমি আজন্মকাল তোমার নিকট বাধিত রহিলাম, কিন্তু

তোমাকে এই স্থানে রাখিয়া আমি কারাগার ত্যাগ করিব না,—উপরোধ করিও না।”

এবার বিমলা পরাস্ত হইলেন। অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক কারণ দর্শাইতে লাগিলেন,—কিছুতেই বীরপুরুষের প্রতিজ্ঞা বিচলিত করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রনাথের একই উত্তর,—“যিনি আমাকে একবার প্রাণদান করিয়াছেন, তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিয়া আমি উদ্ধারপ্রার্থনা করি না;—এরূপ উদ্ধারে, এরূপ জীবনে আমার কায নাই।”

বিমলা পরাস্ত হইলেন। বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন,

“ইন্দ্রনাথ, আপনাকে দুঃখ দেওয়া আমার সঙ্কল্প নহে, কিন্তু আর উপায়ান্তর নাই,—আমি আর একটী কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ করুন, আপনার উদ্ধার বাঞ্ছনীয় কি না, বিচার করুন।”

ইন্দ্রনাথ শুনিতে লাগিলেন;—বিমলা অনেকক্ষণ পর অতি কষ্টে বলিলেন,

“আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী সরলা আজি চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আগামী পূর্ণিমার পরপূর্ণিমার মধ্যে যদি আপনি তাঁহার উদ্ধার না করেন, তবে পামর শকুনি তাঁহাকে বিবাহ করিবে।”

ইন্দ্রনাথ সহসা বজ্রাহতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,—ললাট হইতে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতে লাগিল, নয়নে নিমেষ নাই, স্পন্দ নাই! বিমলা তাঁহাকে অনেক আশ্বাস দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। ইন্দ্রনাথ নীরবে শুনিলেন,—নীরবে হস্তের উপর ললাট ন্যস্ত করিয়া অধোবদনে রহিলেন। মস্তকে শিরা স্ফীত হইতেছিল, নয়ন হইতে

অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল, হৃদয়ের ভিতর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন বজ্রাঘাত হইতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিলেন,

"ভিখারিণি! তোমার কথাই থাকিবে, আমি পলায়ন করিব,—কিন্তু একটী প্রতিজ্ঞা কর।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রতিজ্ঞা?"

ইন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, "যদি কল্য উদ্ধারের অন্য উপায় না দেখ,—যদি নৃশংস পাঠানেরা তোমার বধের আজ্ঞা দেয়, অঙ্গীকার কর মাসুমীর নিকট এক দিবসের সময় প্রার্থনা করিও। আমি মাসুমীকে বিলক্ষণ জানি,—অবলার এ যাচ্ঞায় কখনই অস্বীকৃত হইবেন না—এক দিনের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে।"

বিমলা প্রতিশ্রুত হইলেন।

তখন বিমলা ইন্দ্রনাথকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন। ইন্দ্রনাথ আপনার নূতন রূপ দেখিয়া হাসিলেন। আবার বিমলার দিকে চাহিলেন,—সে হাসি শুকাইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণলোচনে বিমলার হস্ত দুইটী আপনার দুই হস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন,—

"ভিখারিণি! দুইবার তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিলে, আমি চিরকাল তোমার নিকট ঋণী রহিলাম।" নয়নের অশ্রু বেগে বহিতে লাগিল, বিমলার হস্ত সিক্ত হইল, ইন্দ্রনাথ বেগে বহির্গত হইলেন। বিমলা তখন বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন, তাহার হৃদয়ে বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল, অপার্থিব সুখে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইতেছিল! ইন্দ্রনাথের মধুর বাক্যে তাঁহার কর্ণ পরিতৃপ্ত হইতেছিল, ইন্দ্রনাথের প্রীতিসূচক নয়নজলে তাঁহার হস্ত সিক্ত হইতেছিল,—বিমলা স্ত্রীলোক,—মুহূর্ত্তের জন্য

একবার বীরপ্রতিজ্ঞা ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য ইন্দ্রনাথকে লইয়া সুখী হইবেন, এইরূপ আশা জাগরিত হইল! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভুলিলেন,—মুহূর্ত্তের জন্য সেই প্রেমময় বীর পুরুষকে মনে মনে আপন স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। অভাগিনি! তোমার স্বামী কে? বিমলা সহসা সুখস্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন,—তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল,—ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিলেন,—ইন্দ্রনাথ নাই,—হৃদয় শূন্য হইল,—মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের বীরত্ব।

Heard ye the din of battle bray,
Lance to lance and horse to horse.

Grey.

ইন্দ্রনাথকে সহসা শিবিরে দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ সেনাদিগের বিস্ময় ও আহ্লাদের সীমা ছিল না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না আমার অধীনস্থ পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক বর্ম্ম পরিধান ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হও,—এইক্ষণেই নিঃশব্দে শত্রুশিবির আক্রমণ করিব।"

সৈন্যেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া রণসজ্জা করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ এই অবসরে নিকটস্থ এক শিবমন্দিরে যাইলেন। ক্ষণেক উপাসনা করিলেন, পরে দণ্ডবৎ প্রণি-

পাত করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! অদ্যকার মত অসংসাহসী কার্য্যে আমি কখনও লিপ্ত হই নাই, অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমাকে বিজয়লাভ করিতে দিন, বিজয়লাভ করিয়া যদি প্রাণহানি হয়, ক্ষতি নাই,—পিতাকে কুশলে রাখুন—পিতার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী নাম ইন্দ্রনাথ উচ্চারণ করিলেন,—আর একজনের কুশল প্রার্থনা করিলেন, নিঃশব্দে সকলে শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

রজনী দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, চারিদিকে গভীর অন্ধকার। আকাশে দুই একটী তারা দেখা যাইতেছে, আবার মেঘরাশিতে আবৃত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে পেচকের ভীষণ শব্দ ও নিশার ভীষণ রব শুনা যাইতেছে ও নিকটস্থ গঙ্গার ভীম কল্লোল শ্রুতিগোচর হইতেছে। সে গভীর অন্ধকারে ইন্দ্রনাথের সেনা নিঃশব্দে শত্রু-শিবিরাভিমুখে চলিল।

ক্ষণেক যাইতে যাইতে দূর হইতে একটা আলোক দৃষ্টিগোচর হইল, সে আলোক একবার দেখা যায়, অন্যবার নির্ব্বাণপ্রায় হয়। ইন্দ্রনাথ দাঁড়াইলেন। একজন দূতকে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। দূত নিঃশব্দে যাইয়া নিঃশব্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, বলিল," শত্রুপক্ষের চারিজন শিবিররক্ষক ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে, অন্ধকারে কেহ না যাইতে পারে বলিয়া অগ্নি জ্বালাইতেছে।" ইন্দ্রনাথ দশ জন তীরান্দাজকে অগ্রে যাইতে বলিলেন ও আদেশ করিলেন, "যদি ঐ চারিজনের মধ্যে একজনও পালাইয়া যাইয়া শিবিরে সংবাদ দেয়, তবে তোমাদের দশ জনের প্রাণসংহার করিব।" তীরান্দাজগণ ধীরে ধীরে যাইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে চারি জনকেই ভূতলশায়ী করিল। ইন্দ্রনাথের সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল।

আরও দুই তিন স্থানে ঐরূপ পাহারা ছিল, রক্ষক-গণ ঐরূপে নিহত হইল। এক স্থানের একজন রক্ষক পলায়ন করিল। ইন্দ্রনাথ চিন্তিত হইলেন, আদেশ দিলেন, "অশ্ব ধাবিত করিয়া আইস, রক্ষক শিবিরে পঁহুছিবার অগ্রে আমরা যাইব।"

ইন্দ্রনাথ অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠানদিগের পরিখার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার অশ্বারোহীরা তাঁহার সঙ্গে ছিল, পদাতিকেরা পশ্চাতে পড়িয়াছিল। পরিখার বাহিরেও প্রায় তিন চারি সহস্র পাঠানসেনা রণসজ্জা করিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

শত্রুরা সম্মুখে তিন রেখায় সজ্জিত ছিল, প্রথম রেখার সৈন্যেরা উপবেশন করিয়া অশ্বারোহীদিগের গতি-রোধের জন্য বর্শা উত্তোলন করিয়াছিল,—দ্বিতীয় রেখার সৈন্যেরা কিঞ্চিৎ নত হইয়া সেইরূপ বর্শা ধারণ করিয়াছিল ও কিঞ্চিৎ দূরে তৃতীয় শ্রেণীর সৈন্যেরা দণ্ডায়মান হইয়া বর্শা ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের আকৃতি দেখিলে বোধ হয় যে, যদি ভীষণ পর্ব্বতরাশি আসিয়া তাহাদিগের মস্তকে পতিত হয়, তাহারা সেই পর্ব্বতরাশির গতিরোধ করিতেও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথের গতিরোধ করিতে পারিল না।

ইন্দ্রনাথ আদেশ করিলেন," এস্থানে যুদ্ধের আবশ্যক নাই, অগ্রসর হও।" অশ্বারোহীগণ কাহারও উপর অস্ত্রক্ষেপ না করিয়া অশ্ব ধাবিত করিলেন।

বর্ষাকালে পর্ব্বতশেখর হইতে নদী যেরূপ বেগে অবতরণ করিয়া নিম্নস্থ বৃক্ষ, কুটীর, গ্রাম একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়, পঞ্চশত অশ্ব সেইরূপ সৈন্য-রেখাত্রয়ের উপর আসিয়া পড়িল। কাহার সাধ্য সে বেগগতি রোধ করে, নদীর বেগ কে ফিরাইতে পারে?

তিন রেখা ভগ্ন ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, অশ্বের পদাঘাতে অনেক সৈন্য প্রাণত্যাগ করিল, অনেক সৈন্যের উপর দিয়া অশ্ব লম্ফ দিয়া উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইল, কতকগুলি অশ্ব ও অশ্বারোহী শত্রুর অনিবার্য্য বর্শাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কার্য্য সাধন হইল, সে রেখা উত্তীর্ণ হইলেন। পাঠানগণ ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলাইল, ইন্দ্রনাথের পদাতিক সৈন্যগণ আসিয়া তাহাদের শিবিরে অগ্নিদান করিল।

তখন ইন্দ্রনাথ একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, শত্রুর চিহ্নমাত্র নাই, শত্রুদের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইল। দেখিলেন, নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। সম্মুখে দেখিলেন শত্রুসেনা রাশি রাশি সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও পরিখা রক্ষা করিতেছে। মনে মনে ভাবিলেন, "এ পর্য্যন্ত আমাদের অধিক ক্ষতি হয় নাই, বোধ হয়, অশ্বারোহী ও পদাতিক এক শত মাত্র হত হইয়াছে, শত্রুরা পরিখার বাহিরে যে তিন সহস্র ছিল সমস্তই প্রায় হত হইয়াছে। সম্মুখে নিশ্চয় বিনাশ, এই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ভিখারিণি! দুইবার আমার জীবনরক্ষা করিয়াছ, তোমার জীবনরক্ষা করিব অথবা প্রাণত্যাগ করিব।" "পরিখা পার হও" এই বলিয়া বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন।

কিন্তু এবার তাঁহার গতিরোধ হইল। পরিখার অপর পার্শ্বে সৈন্যরাশি সজ্জিত ছিল, অশ্বারোহীগণ উঠিতে উঠিতে তাহারা আসিয়া গতিরোধ করিল, মুহূর্ত্তমাত্র ভীষণ যুদ্ধ হইল, অশ্ব ও অশ্বারোহীগণ বেগে নীচে নিক্ষিপ্ত হইল, অনেকের প্রাণসংহার হইল। সতর্ক পাঠানেরা স্বয়ং নীচে না থাকিয়া পুনরায়

উপরে যাইয়া পুনরায় আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অশ্বারোহীদিগের মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত শোণিত ও কর্দ্দমে আপ্লুত হইয়াছে। নিঃশব্দে ধীরে ধীরে তাঁহারা উঠিলেন। ইন্দ্রনাথ মনে মনে স্থির করিলেন, "এই পরিখা পার হইব কিম্বা এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিব।"

দ্বিতীয়বার ভীষণ বেগে অশ্বারোহীগণ পরিখা পার হইবার চেষ্টা করিলেন,—দ্বিতীয়বার ভীষণ যুদ্ধ হইল, দ্বিতীয়বার অশ্ব ও অশ্বারোহী নীচে নিক্ষিপ্ত হইল। ক্ষতি নাই। তৃতীয়বার ভীষণতর বেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন, এবার সৈনাদিগের মস্তকের উপর লম্ফ দিয়া অশ্বগণ উঠিল,—পরিখা পার হইল। ইন্দ্রনাথ ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। পঞ্চ শত অশ্বারোহীর মধ্যে তখন কেবল তিন শত জীবিত, আর অন্য দুই শত পরিখায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথের অশ্বারোহী ও তৎপরে পদাতিক সৈন্য পরিখা পার হইল বটে কিন্তু সম্মুখে সহস্র সহস্র পাঠান সৈন্য সজ্জিত রহিয়াছিল; ইন্দ্রনাথ সসৈন্যে বিনাশ ভিন্ন অন্য উপায় দেখিলেন না। অচিরাৎ ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

কাহার সাধ্য সে ভীষণ যুদ্ধ বর্ণনা করে? চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, আকাশে ভীষণ মেঘরাশি বায়ুতে ধাবিত হইতেছে, ইন্দ্রনাথের চতুর্দ্দিকে ভীষণতর সৈন্যমেঘ প্রধাবিত হইতেছে। সেনা ভয় কাহাকে বলে জানে না, ইন্দ্রনাথ যতক্ষণ আছেন, অবশ্য জয় হইবে। সেই সেনাগণের বীরত্বকে বর্ণনা করিবে। চক্ষুতে নিমেষ নাই, অস্ত্রসঞ্চালনে বিশ্রাম

নাই, সহস্র সহস্র সৈনিক চারিদিকে আঘাত করিতেছে, অনায়াসে প্রতিহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে,—ভীষণ বায়ুপ্রপীড়িত সমুদ্রের মধ্যে পর্ব্বতশেখরবৎ ভীষণ বাত্যার মধ্যে লৌহ স্তম্ভবৎ তাঁহারা অচল অটল হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। একজন, দুই জন, দশ জন হত হইলেন,—ক্ষতি নাই,—চারিদিকে সেনাতরঙ্গ ভীম কলরবে "আল্লা হু আকবর" শব্দ করিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বার বার আক্রমণ করিতেছে,—ক্ষতি নাই, শত্রুসৈন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, বর্ষার মেঘের মত জড় হইতেছে, বর্ষার বজ্রের মত গর্জ্জন করিতেছে,—ক্ষতি নাই, নিঃশব্দে নিঃশঙ্কে বঙ্গীয় যোদ্ধা যুদ্ধ করিতেছেন। ধন্য যুদ্ধ-কৌশল! ধন্য বীরত্ব!

অপার্থিব রাক্ষসের মত বলিষ্ঠ ও ভীষণ শত্রুগণ অপার্থিব সাহস ও তেজে আক্রমণ করিতেছে,—ক্ষতি নাই। অসুর তুল্য পাঠানেরা তরঙ্গে তরঙ্গে আসিয়া আঘাত করিতেছে, দেবতুল্য অশ্বারোহীগণ নিঃশব্দে তাহাদিগকে প্রতিহত করিতেছেন, শীঘ্রই সেই রণ-স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে মৃতদেহের প্রাচীর হইয়া উঠিল, কিন্তু রণস্তম্ভ ভগ্ন হইল না! ধন্য বীরত্ব!

সহসা সহস্র বজ্রের অধিক শব্দ হইয়া উঠিল। পাঠান-দিগের শিবিরে যে অগ্নি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা কোন রূপে যাইয়া বারুদে পড়িয়াছিল, একেবারে কত শত মণ বারুদ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। যে বৃহৎ অট্টালিকায় বারুদ ছিল, তাহা চূর্ণ হইয়া আকাশে উঠিল, মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল, আকাশ ও পৃথিবী আলোকে ঝল্‌সাইয়া যাইল। সে তেজ ও সে ভীষণ রবের সম্মুখে মনুষ্যের তেজ স্তব্ধ হইল, সহসা যুদ্ধ থামিয়া যাইল, সকলেই সেই দিকে একদৃষ্টিতে চাহিল। ইন্দ্র-

নাথ এই অবসরে কেবল পঞ্চ জন মাত্র অতি বিশ্বাসী অশ্বারোহী সঙ্গে লইয়া সহসা বিদ্যুতের ন্যায় তেজে একদিক্ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইলেন। পাঠানেরা তাঁহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া সম্মুখের সহস্র মোগল পদাতিক ও অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাইয়া কারাগারের নিকট পঁহুছিলেন, তিন চারি জন সেনা বর্শার আঘাতে তাহার লৌহ কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ইন্দ্রনাথ বিদ্যুতের মত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

"ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" কৈ! ভিখারিণি তথায় নাই। ইন্দ্রনাথের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সহসা শরীর অবসন্ন হইল।

তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিলেন, স্ত্রীলোকদিগের জন্য ভিন্ন কারাগার আছে। তৎক্ষণাৎ সেই কারাগারে দৌড়াইয়া যাইলেন। ভরসা ও ভয়ে হৃদয় দুরু দুরু করিতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে লাগিলেন, হৃদয় এরূপ স্ফীত হইতে লাগিল, বোধ হয় যেন অস্থি চর্ম্ম ও উপরিস্থিত লৌহ বর্ম্ম বিদীর্ণ হইবে।

স্ত্রীলোকের কারাগারের কবাট সহসা উৎপাটিত হইল। ইন্দ্রনাথ দ্রুতবেগে যাইয়া ডাকিলেন, "ভিখারিণি" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!"—ভিখারিণী নাই, ইন্দ্রনাথের মুখে আর কথা নাই, ধীরে ধীরে মুখ অবনত করিলেন, হস্ত দিয়া চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন, ললাট, ভ্রূযুগল ও সমস্ত বদনমণ্ডল ভীষণ বিকৃতি ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবন্! এই কি তোমার মনে ছিল, আমার সকল যত্ন বিফল করিলেন!"

সহসা একটা কথা মনে পড়িল, নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে কারাগারের রক্ষককে যাইয়া ধরিলেন, বলিলেন, "যে রমণীকে ইন্দ্রনাথের কারাগারে পাওয়া গিয়াছিল, সে কোথায়? বলিতে বিলম্ব করিলে মস্তক ছেদন করিব।"

রক্ষক ভীত হইয়া বলিল, "বধ্যভূমি," ভয়ে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, কথা বাহির হইল না।

তৎক্ষণাৎ পঞ্চ জন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে বধ্যভূমিতে যাইলেন। ইন্দ্রনাথ সভয়ে দেখিলেন চারিদিকে পাঠান সেনা জড় হইতেছে, অলক্ষিতরূপে অন্ধকারে বধ্যভূমিতে যাইয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার হৃদয় তখনও ভরসা ও ভয়ে স্ফীত হইতেছে। যাইয়া দেখিলেন, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার! "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" একবার, দুইবার, তিন বার ডাকিলেন, উত্তর নাই,—অন্ধকার বধ্যভূমি হইতে সেই নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রোষে, খেদে ইন্দ্রনাথ জ্ঞানশূন্য হইলেন, লৌহমণ্ডিত হস্ত দ্বারা আপন ললাটে আঘাত করিলেন, ঝন্‌ঝনা করিয়া শব্দ হইল, ললাট হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল।

. আবার ডাকিলেন, "ভিখারিণি!" "ভিখারিণি!" ভিখারিণি!" কোন উত্তর নাই, এক পার্শ্বে দেখিলেন, অগ্নিরাশি নির্ব্বাণপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। নৃশংস পাঠান ভিখারিণীকে কি দাহ করিয়াছে? ইন্দ্রনাথের হৃৎকম্প হইল, ভূমিতে পতিত হইলেন। আকাশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন,—সহসা নিকটস্থ তরুকোটর হইতে যেন সেই দীর্ঘনিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হইল!

ইন্দ্রনাথ লম্ফদিয়া উঠিলেন, সেই বৃক্ষের অন্তরালে যাইয়া দেখিলেন, কোথাও কিছু নাই, কেবলমাত্র রজনী-বায়ু এক একবার ভীষণ উচ্ছ্বাসে বহিতেছে, কেবলমাত্র দূর হইতে ভীষণ যুদ্ধ-শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে, চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এক একবার ভীষণ অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে—ইন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া আবার ভূমিতে পতিত হইলেন, সহস্র শত্রু-কর্তৃক পরিবৃত হইয়া সেইস্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন,—ভিখারিণীর দশা চিন্তা করিয়া আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আবার সে নিশ্বাস যেন প্রতিধ্বনিত হইল। ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন, আবার চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন, সহসা অন্ধকারে এক মানবাকৃতি দেখিতে পাইলেন,—হরি হরি! একি ভিখারিণী!

ভিখারিণীকে যে অবস্থায় দেখিলেন, তাহাতে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয়। বিমলা দণ্ডায়মান রহি-য়াছেন, কিন্তু সেই বৃক্ষে আপাদ মস্তক বদ্ধ রহিয়াছে। হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, পদ-দ্বয় বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, কক্ষ ও বক্ষঃস্থল রজ্জুদ্বারা এরূপ সজোরে বদ্ধ রহিয়াছে, যে সেই সেই স্থান হইতে শোণিত নির্গত হইতেছে, কেশপাশ কতক পশ্চাতে বৃক্ষের সহিত বদ্ধ রহিয়াছে, কতক শরীরের উপর লম্বিত রহিয়াছে। মুখের উপর এক খণ্ড বস্ত্র বদ্ধ রহিয়াছে, কথা কহিবার উপায় নাই। কটীদেশে কেবল একখানি জীর্ণ বস্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর উলঙ্গ. কেবল নিবিড় কেশরাশি জানু পর্য্যন্ত লুটাইয়া পড়িয়া শরীর আবৃত করিতেছে। বিমলা দুর্গের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছিলেন,

বাহ্যিক বস্তুতে তাঁহার মন নাই, বিমলা পরমেশ্বরের পবিত্র নাম জপ করিতেছিলেন, তাঁহার ক্লেশ নাই, খেদ নাই, ভয় নাই, লজ্জা নাই, তাঁহার বদনমণ্ডলে কেবল পবিত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল।

ইন্দ্রনাথের নয়নে শূল বিদ্ধ হইতে লাগিল। বলিলেন, "ভগবন্! আজি পাঠানদিগের যাতনা দেখিয়া একবার আমি দুঃখ করিয়াছিলাম,—আর করিব না, নরকেও তাহাদিগের পাপের উপযুক্ত যাতনা নাই।"

নিঃশব্দে বিমলার শরীরের রজ্জু খণ্ডন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পর বিমলার একবার চেতনা হইল,—ইন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ, কি জন্য আমার উদ্ধারের জন্য আসিয়াছ? আমার জীবনের কার্য্য সমাধা হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় আমি এ পাপ প্রাণ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি," এই মাত্র বলিয়া আবার প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

যে স্বরে একথা উচ্চারিত হইল, ইন্দ্রনাথ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। অতি ক্ষীণ মৃদু পবিত্র স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন। ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ভিখারিণি! কথার সময় নাই তোমার জন্য এক্ষণে বস্ত্র কোথায় পাইব, আমি একবার তোমার বেশ ধারণ করিয়াছিলাম, তুমি একবার আমার বেশ ধারণ কর," এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ আপন শরীর হইতে লৌহবর্ম্ম খুলিয়া বিমলাকে পরাইয়া দিতে লাগিলেন। বিমলার সংজ্ঞা নাই, বস্ত্রহীন হইয়াছিলেন, স্মরণ ছিল না। ইন্দ্রনাথ যাহা পরাইলেন, অজ্ঞান সংজ্ঞাশূন্যের ন্যায় তাহাই পরিলেন।

ইন্দ্রনাথ সমস্ত লৌহবর্ম্ম বিমলাকে দিয়া আপনি কেবল শরীরে যে বস্ত্র ছিল তাহাই রাখিয়া অশ্বারোহণ

করিলেন। তাঁহার আদেশে একজন অশ্বারোহী বিমলাকে আপনার পশ্চাতে উঠাইয়া লইলেন, না পড়িয়া যান এই জন্য একটা পেটী দিয়া বিমলার শরীর আপনার শরীরের সহিত বদ্ধ করিলেন। পরে পঞ্চ অশ্বারোহী, যে দিকে যুদ্ধ হইতেছিল, সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। বিমলা তখনও সংজ্ঞাশূন্য অচেতনপ্রায়।

পাঠান-সেনা-সমুদ্র ভেদ করিয়া কিরূপে শিবিরে ফিরিয়া যাইবেন, তাহা ইন্দ্রনাথ স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল ভগবান ও আপন খড়্গের উপর বিশ্বাস করিয়া যুদ্ধশ্রেণীতে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেনাপতিকে পাইয়া মোগল সৈন্যগণ পুনরায় জয়রব করিয়া উঠিল, সে জয়রব আকাশ ভেদ করিয়া উঠিল।

বারুদে যে অগ্নি লাগিয়াছিল, তাহা হইতেই ইন্দ্রনাথের অদ্য পরিত্রাণ হইল ও পাঠানদিগের সর্ব্বনাশ হইল। সে অগ্নি নিবৃত্ত না হইয়া ক্রমশঃ অন্যান্য তাম্বু ও অট্টালিকাকে ভস্মসাৎ করিতে লাগিল। পাঠানেরা ভগ্নচেতা হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। সেই জন্য এক সহস্র মাত্র মোগল সেনা এতক্ষণ অধিক সংখ্যক পাঠান সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অগ্নি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে যে দিকে সেনাদিগের স্ত্রীপরিবার ছিল, সেই দিকে অগ্নি লাগিল। পাঠানেরা ব্যাকুলচিত্ত হইল, এই সময়ে ইন্দ্রনাথেব আগমনে মোগল সৈন্যেরা জয় জয় করিয়া উঠিল। ভীত পাঠানেরা স্থির করিল, পুনরায় অধিক মোগল সৈন্য আসিয়াছে, একেবারে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ইন্দ্রনাথের আদেশে মোগল সৈন্য পরিখা পুনরায় পার হইয়া শিবিরাভিমুখে চলিল। প্রাতঃকাল প্রায়

হইয়া আসিয়াছে,—ইন্দ্রনাথ ভাবিলেন, "যদি এখনও শত্রুরা জানিতে পারে যে আমরা কেবল সহস্র জনমাত্র আসিয়াছি, তাহা হইলে এক্ষণও ফিরিয়া আসিয়া আমাদের ধ্বংস করিতে পারে, আর বিলম্বে আবশ্যক নাই।"

ইন্দ্রনাথ পাঠান শিবিরের এক অংশ মাত্র ভেদ করিয়া বিমলার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, সে অংশে কেবল ৯ কি ১০ সহস্র সেনা ছিল। এক্ষণে দেখিলেন, পাঠানদিগের সমস্ত শিবিরের সেনা জাগরিত হইয়া যুদ্ধসজ্জা করিয়া আসিতেছে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র কি তদধিক পদাতিক ও অশ্বারোহী ইন্দ্রনাথের অল্প সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে আসিতেছে। ইন্দ্রনাথ সসৈন্যে দ্রুতবেগে দুর্গাভিমুখে চলিলেন, পাঠান সেনা নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই মুঙ্গেরে পঁহুছিলেন।

সমস্ত শিবির জয় জয় রবে পরিপূরিত হইল। "ইন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়াছেন,—হইয়াই শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। মোগলদিগের সহস্র সৈন্যে পাঠানদিগের পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন, মোগলদিগের পঞ্চশত সেনা মাত্র হত হইয়াছে, পাঠানদিগের ন্যূনকল্পে পঞ্চ সহস্র সেনা হত হইয়াছে ও অনেক তাম্বু, বারুদ, খাদ্যদ্রব্য দাহ হইয়াছে," এরূপ সংবাদ পাইয়া মোগল সৈনাগণ উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইল। টোডরমল্ল স্নেহকারে ইন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিলেন,—তিনি কিরূপে উদ্ধার পাইলেন জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অবসর রহিল না।

কয়েক জন অশ্বারোহী ভিন্ন বিমলার কথা কেহ জানিল না। বিমলা রজনীযোগে আপন বস্ত্র পরিধান করিয়া ধীরে ধীরে পিত্রালয়ে যাইলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

Out ! Out ! brief candle !
Shakespeare.

উপরি উক্ত ঘটনার দুই তিন দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় রাজা টোডরমল্ল ও ইন্দ্রনাথ দুই জন দুর্গের প্রাচীরোপরি পদচারণ করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকক্ষণ কথোপকথন হইতেছিল। রাজা বলিলেন,—

"তুমি বালক বলিয়া এরূপ বলিতেছ, যুদ্ধে কেবল সাহস আবশ্যক করে না, রণকৌশলও আবশ্যক।"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "কিন্তু আপনি কি বোধ করেন, যদি আমরা দুর্গ ছাড়িয়া সম্মুখরণে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পরাস্ত হইব ?"

রাজা। "যুদ্ধ করিলে পরাস্ত হইব না, কিন্তু কয় জন যুদ্ধ করিবে ?"

ইন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। ক্ষণেক পর বলিলেন, "মহারাজ, তবে আমরা কয় দিন এই অবস্থায় দুর্গের ভিতর থাকিব ?"

রাজা। "আর অধিক দিন নহে। ঐ যে একখানি শিবিকা আসিয়াছে, উহার আরোহী আমাদিগকে এই ক্ষণেই সংবাদ দিবেন, যে আর অল্প দিনের মধ্যে শত্রুর বিনাশ হইবে,—আমাদের বিনা যুদ্ধে জয় হইবে!"

ইন্দ্রনাথ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, বলিলেন,—"মহারাজ! আপনার যুদ্ধকৌশল জগৎ-বিখ্যাত। কিন্তু আপনি মন্ত্রবলে ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন, তাহা আমি জানিতাম না।"

সেই শিবিকা নিকটে আসিলে তাহার ভিতর হইতে দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র অবতরণ করিলেন। ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্রের সহিত রাজা টোডরমল্লের যে যে কথা হইল, তাহা বিস্তারিত বিবরণ করিবার আবশ্যক নাই, সংক্ষেপে, সতীশচন্দ্র রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তৃক বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান হিন্দু জমীদারের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র কার্য্যদক্ষ, বাক্‌পটু ও বুদ্ধিমান। সেই সকল জমীদারের নিকট নানারূপ কারণ দর্শাইয়া তাঁহাদিগকে একে একে পাঠানপক্ষ ত্যাগ করিয়া মোগলপক্ষ অবলম্বন করিতে লওয়াইয়াছিলেন। পাঠানেরা চারিশত বৎসরাবধি হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেছে, আকবরসাহ হিন্দুদিগের পরম বন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় করসমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দুরমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচারব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন ও বঙ্গদেশে জাতিবিদ্বেষ রহিত করিবার জন্য হিন্দু সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন; বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং সে সেনাপতির পত্নীস্বরূপ, ছায়াস্বরূপ, কখনও তাঁহাকে ত্যাগ করেন না; তিনি দুইবার বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এবারও অবশ্য করিবেন; জয় করিলে বিদ্রোহী জমীদারদিগকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার সহায়তা করিলে

সে ক্ষত্রিয় মহাত্মা কখন সে ঋণ বিস্মৃত হইবেন না—ইত্যাদি নানারূপ প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া সতীশচন্দ্র অনেক জমীদারকে মোগলপক্ষাবলম্বী করিয়াছিলেন। সেই জমীদারগণ এক্ষণে পাঠান সৈন্যদিগকে খাদ্যদ্রব্য পাঠাইবেন না স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং আর পাঁচ সাতদিনের মধ্যে পাঠান সৈন্যের পরাজয়ের আর সংশয় রহিল না।

রাজা সতীশচন্দ্রকে বহু সম্মানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন, ইন্দ্রনাথের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইন্দ্রনাথ, আমার কথা সত্য কি না ?"

ইন্দ্র। "মহাশয়, আমি অদ্যাবধি আপনাকে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া জানিলাম। কিন্তু——

রাজা। "কিন্তু কি ?"

ইন্দ্র। "আমি কাহারও বিপক্ষে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমার একটী কথা ক্ষমা করিবেন,—সতীশচন্দ্রের সমস্ত কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না।"

রাজা। "তরুণ সেনাপতি কি টোডরমল্লকে রাজনীতি শিক্ষা দিতে চাহেন ? কাহাকে বিশ্বাস করিতে হইবে, কাহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে, তাহা ইন্দ্রনাথ কি আমা অপেক্ষা ভাল জানেন ?"

ইন্দ্র। "মহারাজ ! আমার অপরাধ লইবেন না, কিন্তু হইতে পারে এই সতীশচন্দ্রের সম্বন্ধে আপনি যাহা জানেন, আমি তাহা অপেক্ষা অধিক জানি।"

রাজা। "হইতে পারে ইন্দ্রনাথ যতদূর জানেন, আমিও ততদূর জানি ;—হইতে পারে ইন্দ্রনাথের মনে এইক্ষণে কি চিন্তা হইতেছে, তাহাও আমি জানি।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রাজার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; রাজা পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ঈষৎ হাসিতে

হাসিতে বলিলেন, "এই সতীশচন্দ্র রাজা সমরসিংহকে হত্যা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহাই চিন্তা করিতেছেন।"

ইন্দ্রনাথ বিস্ময়ে নিঃসংজ্ঞের ন্যায় হইলেন, বলিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা করুন, আপনি অন্তর্যামী।"

রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "বৎস এরূপ কথা বলিওনা, কেবল ভগবানই অন্তর্যামী। কিন্তু দিল্লীশ্বরের সেনাপতি চারিদিকের সন্ধান না রাখিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, কেবল এই মাত্র তোমাকে দেখাইলাম।"

ইন্দ্রনাথ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। রাজা আবার বলিতে লাগিলেন,—

"এক্ষণে তোমাকে বলি, আমি কেবল সতীশচন্দ্রের কথায় কখন প্রত্যয় করিতাম না, কিন্তু যেরূপ সতীশ-চন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলাম, সেইরূপ আরও দশ জনকে দশ দিকে পাঠাইয়াছিলাম। তাহারা সকলেই ফিরিয়া আসিয়া এই কথাই বলিয়াছে, সুতরাং সন্দেহের স্থল নাই। সেই জন্যই সতীশচন্দ্রের শিবিকা দেখিয়াই তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, অগ্রেই বলিতে পারিয়া-ছিলাম। ইন্দ্রনাথ! আমি ভবিষ্যদ্বক্তাও নহি, অন্তর্যামীও নহি কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ে আমার কেশ শুক্ল হইয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় যুদ্ধকৌশল কিছু শিখিয়াছি।"

ইন্দ্রনাথ ক্ষণেক মৌনভাবে থাকিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মহারাজ! আর একটী কথা নিবেদন করি;—আপনি কি তবে রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিলেন?"

রাজা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন,—"আমার পুত্রকে হত্যা করিলে হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে ক্ষমা করিতে পারি

না,—সে অপরাধের মার্জ্জনা নাই। সমরসিংহ! সমর-সিংহ! তোমার ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বীর আমি জীবনে কখনও দেখি নাই; অথবা বাল্যকালে কেবল একজন দেখিয়াছিলাম। তাঁহারও সমরের ন্যায় বিশাল শরীর, সমরের ন্যায় অসুরবলসম্পন্ন অঙ্গ, সমরের ন্যায় অপ্রতিহত তেজ ছিল। রাঠোর তিলকসিংহকে এ জীবনে আর দেখিব না!" টোডরমল্ল ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিলেন।

ইন্দ্র। "তিনিও কি প্রভুর ন্যায় সম্রাটের অধীনে কোনও দেশ শাসন করিতেছেন?"

টোডরমল্লের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল; তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "তিলক আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; আকবরের বিরুদ্ধে চিতোর রক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছেন।"

নিস্তব্ধে চিন্তা করিতে করিতে টোডরমল্ল শিবিরাভি-মুখে যাইলেন; ইন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন।

নিশীথ সময়ে সতীশচন্দ্র গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতে-ছেন। আজি তিনি রাজার নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া-ছেন,—তাঁহার হৃদয় উল্লাসে পরিপূরিত হইয়াছে,—মায়াবিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিতেছে, "তুমি এক দিন পাপের দণ্ডের ভয় করিয়াছিলে,—সে পাপ কে জানিতে পারিয়াছে? দণ্ড কোথায়? এখন দিন দিন তোমার সম্মান বৃদ্ধি হউক, পদ বৃদ্ধি হউক।" সূর্য্য অস্তে যাইবার সময় অবধি কুহকিনী আশা তাঁহার কাণে কাণে এই প্রকারে বলিতেছিল,—সেই সূর্য্য পুনরায় উদয় হইবার অগ্রে সতীশচন্দ্র বুঝিলেন, আশা মায়াবিনী, কুহকিনী, মিথ্যাবাদিনী।

অর্দ্ধরাত্রে চন্দ্রালোকেস তীশচন্দ্র একটী ভীষণ আকৃতি দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই আকৃতি ছুরিকা হস্তে সতীশচন্দ্রের দিকে দৌড়াইয়া আসিল। সতীশচন্দ্র চীৎকার শব্দ করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে বৃথা, সেই হত্যাকারী খড়্গহস্তে সতীশচন্দ্রের উপর আসিয়া পড়িল।

হটাৎ বৃক্ষপার্শ্ব হইতে একজন সৈনিক পুরুষ আসিয়া সতীশচন্দ্রের উদ্ধার সাধন করিলেন। দূর হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া আসিলেন,—এক আঘাতে দস্যুকে ভূতলশায়ী করিলেন।

তখন সতীশচন্দ্র শত সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সেই সৈনিক পুরুষকে আলিঙ্গন করিতে গমন করিলেন। সৈনিক আপন দুই হস্ত বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্গামী হইলেন।

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন," আপনি আমার মহৎ উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে কোপ প্রকাশ করিতেছেন কি জন্য ?"

সৈনিক উত্তর করিলেন, "আমি আপনার উপকার করিতে আইসি নাই। দস্যুর প্রাণদণ্ড করা সৈনিকের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মপালনে আসিয়াছিলাম। সে দস্যু হত হইয়াছে,—আমি বিদায় হইলাম।"

সতীশচন্দ্র অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আপনি কে বলুন,—আপনার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, আপনি আমাকে প্রাণদান করিয়াছেন।

সৈনিক উত্তর করিলেন," আমি রাজা সমরসিংহের বিধবা ও অনাথা কন্যার বন্ধু! দস্যুহস্ত হইতে আপনার প্রাণরক্ষা করিলাম, কেন না বিচারে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে, এই আমার মানস।"

এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ বেগে প্রস্থান করিলেন।

সতীশচন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল;—একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন, সভয়চিত্তে পাপী অগত্যা নৈশগগনের দিকে চাহিল। হঠাৎ মৃতপ্রায় দস্যু বলিল,—

"সতীশচন্দ্র তোমার মৃত্যু সন্নিকট।"

ভীতচিত্ত পাপী আরও ভীত হইয়া সেইদিকে চাহিলেন,—সে আবার বলিল, "আমি যে আঘাত করিয়াছি, তাহা হইতে আপনার নিস্তার নাই।"

তখন সতীশচন্দ্রের মুখ হইতে কথা বাহির হইল,—বলিলেন, "নরাধম! ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিয়াছেন,—তোর আঘাতে সামান্য মাত্র রক্ত পড়িয়াছে।"

দস্যু বলিল, "সেই সামান্য আঘাতে আপনার প্রাণনাশ হইবে,—আমার ছুরিকা বিষাক্ত। প্রভু! আপনি আমাকে কি জানেন না?"

সতীশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ আপনার পুরাতন ভৃত্যকে চিনিলেন, বলিলেন,—"নরাধম! তোকে কে এরূপ প্রভুভক্তি শিখাইয়াছিল?"

ভৃত্য অতি ক্ষীণ ও স্খলিত স্বরে উত্তর করিল, "পা—পা—পাপিষ্ঠ শকুনি।"

সতীশচন্দ্র তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, "আমিও ভাবিয়াছিলাম সেই পামরেরই এই কার্য্য। পৃথিবীতে তাহার মত ভীষণ পাপী আর নাই,—নরকেও নাই। কিন্তু তুই আমার পুরাতন ভৃত্য তুই আমার বধের সঙ্কল্প করিয়াছিলি?"

ভৃত্য আরও ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল, "শ—শ—শকুনি অনেক লোভ দেখাইয়াছিল,—লো—লোভে

পড়িলে জ্ঞান থাকে না, লোভে পড়িয়া পাপ করিলাম, প্রাণ হারাইলাম—প্র—প্র—প্রভু ক—ক্ষমা।”

আর কথা বাহির হইল না, শরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইল, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে স্থির হইল; নয়ন দুইটী আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রালোকে সে আকৃতি ভীষণ দেখাইতে লাগিল, বিশেষ সতীশচন্দ্রের হৃদয় যেরূপ ভয়ে ও চিন্তায় প্রপীড়িত হইতেছিল, তিনি সে দর্শন সহ্য করিতে পারিলেন না, মৃতদেহের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভৃত্য! তোর অপেক্ষা জ্ঞানী লোকও লোভে পড়িয়া জ্ঞান হারাইয়াছে,—তোর অপেক্ষা ভীষণ পাপ করিয়াছে,—তোর মত প্রাণ হারাইবারও বিলম্ব নাই। পরমেশ্বর তোকে ক্ষমা করুন,—আমার পাপের ক্ষমা নাই!”

প্রাতঃকালে রাজার নিকট সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী সতীশচন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। রাজা তৎক্ষণাৎ সতীশচন্দ্রের গৃহে গমন করিলেন, ইন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তথায় যাইয়া দেখিলেন, সতীশচন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, চারিদিকে চিকিৎসক বসিয়া রহিয়াছে, কিন্তু যে ভীষণ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে পরিত্রাণ নাই। রাজা এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, পার্শ্বস্থ অনুচরগণ সবিশেষ অবগত করাইল। তখন সতীশচন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ! আমি পাপী, পাপিষ্ঠকে ক্ষমা করুন।”

রাজা নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, “আমি ভীষণ দোষ করিয়াছি—সে অপরাধ ক্ষমা করুন।”

রাজা তথাপি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন—সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিলেন, "মহারাজ! আমি নরহত্যাকারী মৃত্যুশয্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।"

সে কাতরস্বর শ্রবণ করিয়া রাজা আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "রাজা সমরসিংহের হত্যাকারীকে আমি কখনও ক্ষমা করিব ভাবি নাই, কিন্তু জগদীশ্বর তোমাকে শাস্তি দিয়াছেন, আমি ক্ষমা করিলাম, তোমার জীবিত থাকিবার আর অধিক কাল নাই, ভগবানের নাম গ্রহণ কর, তিনি দয়ার সাগর, মৃত্যুকালে তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিলে জীবনের পাপ খণ্ডন হয়।"

সতীশচন্দ্র জগতের আদি পুরুষের নাম লইলেন, পাপীর নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র আবার রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! তবে আপনি সমরসিংহের মৃত্যুর কারণ সবিশেষ অবগত আছেন?"

রাজা উত্তর করিলেন, "আছি।"

সতীশচন্দ্র বিস্মিত হইলেন,—আবার নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর আবার বলিলেন, "মহারাজ! আমার আর একটী নিবেদন আছে। আমি পাপী বটে, কিন্তু জন্মাবধি পাপী ছিলাম না, যৌবনে আমার জীবন পবিত্র ছিল, উচ্চ মতি, উচ্চ আশয়, উচ্চ প্রবৃত্তি ছিল। লোভে, মহালোভে পড়িয়া সে সকল হারাইয়াছি, জীবন পাপে কলুষিত হইল, আজি প্রাণ হারাইলাম"—

সতীশচন্দ্রের ক্ষীণস্বর অধিকতর ক্ষীণ হইয়া আসিল,—আর কথা নিঃসৃত হইল না। রাজা সস্নেহে ওষ্ঠে দুগ্ধ দিলেন, রসশূন্য ওষ্ঠ পুনরায় সিক্ত হইল। সতীশচন্দ্র পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমি পাপী বটে, কিন্তু আমার অপেক্ষাও ঘোরতর ভীষণতর পাপী আছে। মহারাজ! আমার ভৃত্য শকুনিই যথার্থ সমরসিংহকে বধ করিয়াছে,—সেই অদ্য আমাকে বধ করিল," আবার কণ্ঠরোধ হইল।

ক্রোধে রাজা টোডরমল্লের নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "চিন্তা নাই, জগদীশ্বর পাপীর দণ্ড দিবেন।"

আবার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে নীরব হইয়া রহিল। সতীশচন্দ্রের আয়ু নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে সতীশচন্দ্র অধিকতর ক্ষীণ ও কাতরস্বরে বলিলেন, "কন্যা,—স্নে—স্নেহময়ী—ধর্ম্মপরায়ণা কন্যা"—সহসা বাক্ রুদ্ধ হইল।

রাজা পুনরায় অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠে দুগ্ধ দান করিলেন। ক্ষণেক পর আবার বলিতে লাগিলেন, "হতভাগিনী কন্যা,—তোমার মা—মা—মাতা নাই,"—বলিতে বলিতে পার্শ্বের গৃহ হইতে হৃদয়বিদারক রমণীকণ্ঠজাত ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল, সে ধ্বনি শুনিয়া সতীশচন্দ্রের স্পন্দনহীন নয়নদ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিমলা বেগে পিতার নিকটে আসিলেন,—ঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু সে সময়ে সে জ্ঞান কোন্ রমণীর থাকে?

ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বপরিচিত ভিখারিণীকে সতীশচন্দ্রের কন্যা বিমলা বলিয়া জানিতেন না,—আজি তাহা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন।

সতীশচন্দ্র কন্যাকে দেখিয়া বলিলেন, "আলিঙ্গন।—তোমাকে পরমেশ্বর"—আর কথা সরিল না।

বিমলা পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিলেন। বোধ হইল যেন সেই পবিত্র আলিঙ্গনে সতীশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেগশূন্য হইল, মুখমণ্ডল শান্তিভাব ধারণ করিল, নয়ন দুইটী চিরনিদ্রায় মুদ্রিত হইল।

তখন বিমলা বার বার সেই মৃতদেহকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আজ বিমলার নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইল, আজি চারিদিক্ অন্ধকার হইল, আজি হৃদয় বিদীর্ণ হইল, আজি জগৎ শূন্য হইল।

সে দর্শন দৃষ্টি করিয়া রাজা নয়নদ্বয় আবরণ করিয়া বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ইন্দ্রনাথ খড়্গের উপর ভর দিয়া বালিকার ন্যায় অবারিত নয়নধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * * * *

ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশের জমীদারগণ রাজা টোডরমল্লের দলভুক্ত হইয়া বিদ্রোহীদিগকে খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ বন্ধ করিলেন। তজ্জন্য ও অন্যান্য কারণবশতঃ বিদ্রোহী সৈন্য অবশেষে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বিদ্রোহী সেনাপতির মধ্যে আরববাহাদুর পাটনা হস্তগত করিবার মানসে সহসা তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজা টোডরমল্ল তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই নগর রক্ষার্থ পূর্ব্বেই তথায় কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং আরববাহাদুর বিফলমানস হইলেন। মাসুমী কাবুলী নামক পাঠান

বীর বিহারদেশ আক্রমণ করিলেন, কিন্তু টোডরমল্ল স্বয়ং সাদীকখাঁর সহিত যাইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন, মাসুমী মোগলের অধীনতা স্বীকার না করিয়া বরং উড়িষ্যা দেশের রাজার নিকট শরণাপন্ন হইলেন। রাজা টোডরমল্ল অল্প দিনের মধ্যে দিল্লীর সম্রাটকে লিখিলেন যে, সমগ্র বিহার দেশ জয় হইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ এ সকল যুদ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন না। সরলার বিষয় যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিলম্বের আর সময় ছিল না। যেদিন মুঙ্গেরের সম্মুখে শত্রুর শিবির ভঙ্গ হইল, সেই দিনই তিনি রাজা টোডরমল্লের নিকট বিদায় লইতে গেলেন। সে প্রার্থনা করাতে রাজা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। বলিলেন,—

"সে কি ইন্দ্রনাথ! কি হইয়াছে?"

ইন্দ্র। "মহারাজ! যুদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসনে পদধূলি দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।"

রাজা। "যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহা করিব, তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছ কেন?"

ইন্দ্র। "মহারাজ, যদি আজ্ঞা করেন তবে আমি অগ্রে যাই।"

রাজা। "আমাদের এক্ষণও যুদ্ধ সমাধা হয় নাই, আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকে আমার সঙ্গে লইয়া তোমার পিত্রালয়ে যাইব, কিন্তু যদি তোমার বিশেষ আবশ্যক থাকে, অগ্রে যাইতে পার।"

ইন্দ্র। "মহারাজের নিকট আমার আর একটী ভিক্ষা আছে।"

রাজা। "নিবেদন কর, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

ইন্দ্র। "আপনি শকুনিকে ধরিবার জন্য চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে লোক পাঠাইতেছেন,—আদেশ করুন আমি সে কার্য্য সম্পাদন করিব।"

রাজা। "কেন, ইন্দ্রনাথ কি আমাদের অন্য সৈন্যের উপর প্রত্যয় করেন না?"

ইন্দ্র। "মহারাজ! সে জন্য নহে, অন্য কারণ আছে," বলিয়া ইন্দ্রনাথ লজ্জায় মুখ অবনত করিলেন।

রাজা। "আমাদের কোন কথাই আমারা ইন্দ্রনাথের নিকট গোপন রাখি না, ইন্দ্রনাথের কি আমাদিগের নিকট গোপন রাখিবার কোন কথা আছে?"

ইন্দ্রনাথ অধিকতর লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "মুঙ্গের আসিবার সময় এক জনের নিকট পূর্ণিমা তিথিতে বিদায় লইয়া আসিয়াছিলাম,—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সপ্তম পূর্ণিমার মধ্যে পুনরায় দেখা করিব। তিনি এক্ষণে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে আছেন, সেই জন্য আমার এই ভিক্ষা।"

রাজা। "কাহার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ আছ, যে তাঁহার কার্য্যের জন্য এরূপ ব্যাকুল হইতেছ?"

ইন্দ্রনাথ অধিকতর লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। রাজা সহাস্যবদনে বলিলেন—"আচ্ছা যাও, কিন্তু আমরা আকবরসাহকে পত্র লিখিব যে একজন নবীন সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়াছেন—দিল্লীশ্বরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আপন হৃদয়েশ্বরীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

ইন্দ্রনাথ সম্মতি পাইয়া সেই দিনই মুঙ্গের ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু নাবিকের নৌকায় উঠিলেন। ইন্দ্রনাথের অনুরোধে, অনাথা নিরাশ্রয়া বিমলাও অপর একটী নৌকায় উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

বিমলা এক্ষণে আর পূর্ব্বমত নাই। তাঁহার বদন-মণ্ডল রক্তশূন্য ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট, অথচ নয়নের তারা অনৈসর্গিক উজ্জ্বলতায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাঁহার কথার স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন, শ্মশানের নৈশবায়ুর ন্যায় ভীষণ ও নৈরাশ-প্রকাশক! আজি বিমলার হৃদয়ের আশা ভরসা সকলই দগ্ধ হইয়াছে,—ইন্দ্রনাথের প্রতি যে অনুরাগ ছিল, তাহাও সেই ঘোর সন্তাপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিল, হৃদয় প্রকৃত দগ্ধ শ্মশান হইয়াছে। এ অনন্ত জগতে কত অভাগিনীর মায়ার সমস্ত বস্তুই একে একে কালগ্রাসে পতিত হয়,—কত অভাগিনীর হৃদয় শূন্য শ্মশানের ন্যায় হয়, তাহা কে বলিবে?

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পূর্ণিমা।

> If after every tempest come such calms,
> May the winds blow till they have
> wakened death.
>
> *Shakespeare.*

আজি পূর্ণিমা তিথি, কিন্তু আকাশ দেখিলে কে বলিবে আজি পূর্ণিমা? গভীর ধূম্রবর্ণ মেঘরাশিতে আকাশ অদ্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে, জগৎ ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ-লতার ভীষণ আলোকে সেই অন্ধকার মুহূর্ত্তের জন্য উদ্দীপ্ত হইতেছে। আবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর অন্ধকার হইতেছে। আশার ক্ষণস্থায়ি জ্যোতি লীন হইলে, হতভাগ্যের পক্ষে

সংসার যেরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হয়, বিদ্যুৎ-আলোকের পর জগৎ সেইরূপ অধিকতর ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাইতে ছিল। মুসলধারা বৃষ্টিতে ক্ষেত্র, গ্রাম, পথ, ঘাট সকল ভাসিয়া যাইতেছিল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যেন সেই বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইতেছে বোধ হইতেছিল। বায়ু রহিয়া রহিয়া অতিশয় ভীষণ শব্দে প্রবাহিত হইতেছিল, নদীতে কোন কোন নৌকা, ছিন্ন-বন্ধন হইয়া মগ্ন হইতেছিল, কোন কোন খান বা ঘূর্ণিত হইতেছিল, বৃক্ষের শাখা, ঘরের চাল ভীষণবেগে উড়িয়া যাইতেছিল। সেই বায়ুর শব্দের মধ্যে মধ্যে ভীষণতর মেঘের অনেকক্ষণস্থায়ী গর্জ্জন জগৎসংসার ত্রস্ত ও কম্পিত করিতেছিল।

এরূপ ভীষণ বাত্যায় সরলা একাকী চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অন্ধকারাচ্ছন্ন উদ্যানের মধ্যস্থ একটী জনশূন্য কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া আছে, কিজন্য? বালিকার হৃদয়ে কি ভয় নাই, এই অন্ধকারে এই ভয়াবহ মেঘগর্জ্জনে বালিকার হৃদয়ে কি শঙ্কা হইতেছে না?

না, অদ্য সরলার চিত্তে আর ভয় নাই, অদ্য সরলা কাহাকেও ভয় করে না। সুখের আশা, জীবনের আশা অদ্য শেষ হইয়াছিল, যাহার আশা নাই, তাহার ভয় কিসের? আকাশে যে ভীষণ বিদ্যুৎ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন ঝলসিতে ছিল, সরলা স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে অবলোকন করিতেছিল। তাহার পর যে ভয়ানক মেঘগর্জ্জন হইতেছিল, সরলা স্থিরচিত্তে তাহাও শ্রবণ করিতেছিল। ভয়শীলা, বিহ্বলা বালিকা অদ্য ভয়শূন্যা হইয়াছে, কেন না জীবনে আর তাহার আশা ভরসা নাই। আজি সপ্তম পূর্ণিমা, ইন্দ্রনাথ অদ্যও আসিলেন না, সরলার জীবনের আশা অদ্য ফুরাইল।

একবার বাল্যাবস্থার কথা মনে আসিল। মহামান্য সমরসিংহের একমাত্র দুহিতা এই প্রশস্ত দুর্গে এই বিস্তীর্ণ উদ্যানে বেড়াইত, পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া শাখা হইতে ফুল পাড়িত, মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া এক দিন একটা পাখী ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পাখী উড়িয়া গেল, নির্ব্বোধ শিশু কাঁদিল, নির্ব্বোধ শিশু জানিত না যে, জীবনের আশা ভরসা সকলই সেই পাখীর মত একে একে উড়িয়া যাইবে।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল রুদ্রপুরে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র পল্লীগ্রামে দরিদ্র কুটীরে সেই ছয় বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু ধন হইলেই সুখ হয় না, দরিদ্রতা হইলেই দুঃখ হয় না। সরলার অন্তঃকরণে সেই ছয় বৎসর পরম সুখের কাল বলিয়া বোধ হইল। প্রাণের সখী অমলা! তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে! প্রাতঃকালে সেই অমলার সহিত প্রত্যহ ঘাটে জল আনিতে যাইত, সন্ধ্যার সময় সেই অমলার সহিত অনন্ত উপকথা, অনন্ত প্রণয়ের কথা হইত। সুখের সময় সেই অমলা নিকটে থাকিলে সুখ দ্বিগুণ হইত, দুঃখের সময় অমলার প্রবোধবাক্যে দুঃখ শান্তি হইত। আজি সে অমলা কোথায়? পাখীর মত উড়িয়া গিয়াছে!

আর সেই ইন্দ্রনাথ! যাহার চিন্তায় আজি ছয় মাস সরলার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, যাহার আশায় আজি ছয় মাস সরলা জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছে, সে হৃদয়ের ইন্দ্রনাথ কোথায়? বাল্যকালে ইচ্ছামতীতীরে যাহার ক্রোড়ে বসিয়া বালিকা গল্প শুনিত, গল্প শুনিত আর একদৃষ্টে সেই মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত; যৌবনের প্রারম্ভে যে প্রেমময় মুখখানির কথা সদাই ভাবিত, ভাবিত আবার রহিয়া রহিয়া সেই মুখখানি

দেখিয়া হৃদয় শীতল করিত, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? রুদ্রপুরের কুটীর পার্শ্বে চন্দ্রালোকে যে ইন্দ্রনাথ বিদায় লইয়াছিলেন, সেই অবধি যে ইন্দ্রনাথের চিন্তা দিবা-রাত্রি সরলার হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে, সে ইন্দ্রনাথ কোথায়? হায়! তিনিও পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছিলেন, অনন্ত সংসারাকাশে বিচরণ করিতেছেন!

সরলা ভাবিয়া ভাবিয়া হতজ্ঞান হইল। মাথা ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষুতে জল নাই। বালিকার হৃদয়ে আজি যে যাতনা কে জানিবে? যতদিন জীবনে একটী আশা থাকে, ততদিন জীবন সহনীয় হয়, কিন্তু সরলার পক্ষে এক একটী করিয়া সকল আশাই তিরো-হিত হইয়াছিল। পৃথিবী শূন্য হইয়াছিল, সংসার তমোময় হইয়াছিল। এক একটী করিয়া নাট্যশালার দীপ নির্ব্বাণ হইল, সরলা ধীরে ধীরে সেই নাট্যশালা হইতে বিদায় হইবার উদ্যোগ করিল।

"আজি হৃদয়েশ্বরের আসিবার শেষ দিন, আজি তিনি আসিলেন না কেন? তিনি কি হতভাগিনীকে ভুলিয়া গিয়াছেন? তিনি কি জীবিত আছেন? ভগ-বান তুমিই জান, তোমার অচিন্তনীয় মানস কে বুঝিতে পারে, তোমার যাহা মনে লয় কর। ইন্দ্রনাথ! তোমার নিকট ইহজন্মে বিদায় লইলাম, তুমি যদি আমাকে ভুলিয়া থাক, হতভাগিনী তোমাকে ভুলে নাই, হত-ভাগিনী মৃত্যুর সময় তোমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মরিবে,—তোমার কথা ভাবিতে ভাবিতে মরিবে, তোমার দেবমূর্ত্তি জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে দেখিতে মরিবে। আর তুমি যদি জীবিত থাক, যে অভাগিনী তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে একবার তাহার কথা ভাবিও,—যে ভিখারিণী বিপদে, দুঃখে, দারিদ্র্যে মুহূর্ত্ত-

মাত্র তোমার নাম, তোমার চিন্তা বিস্মৃত হয় নাই, একবার তাহার কথা মনে স্থান দিও। আমার আর ভিক্ষা নাই,—পরমেশ্বর তোমাকে ধন দিবেন, মান দিবেন, ক্ষমতা দিবেন, লক্ষ্মীর মত পত্নী দিবেন; কিন্তু ইন্দ্রনাথ! সরলার মত তোমাকে কেহ ভালবাসিতে পারিবে না। দুঃখিনীর ধন! ভিখারিণীর রত্ন! জীবনের বায়ু! নয়নের মণি! পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, আর আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই।" সরলার কষ্ট হইল, অজস্র বিগলিত অশ্রুধারায় শুষ্ক বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল।

এক্ষণও প্রবল বেগে ঝড় বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে সরলার বোধ হইল যেন এক অপরূপ ঝন্‌ঝনা শব্দ হইল। সরলা ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া চারিদিকে দেখিল, কিন্তু সে নিবিড় অন্ধকারে কিছুমাত্র দেখিতে পাইল না। অন্য দিন হইলে সরলা ভীত হইত, কিন্তু আজি বালিকার হৃদয়ে ভয় ছিল না,—হতভাগিনীর আর কি হইতে পারে? যাহা হইবার হউক!

এমত সময়ে উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-আলোক দেখা দিল। সে আলোকে সরলা সম্মুখে কি দেখিতে পাইল? হরি হরি! একি ইন্দ্রনাথ!

চারিচক্ষুর মিলন হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল।

অনেকক্ষণ দুইজনই বাক্‌শূন্য হইয়া নীরবে রহিলেন, সে সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিতে অক্ষম, যাঁহারা পারেন অনুমান করুন। তাঁহারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বিস্মৃত হইলেন; জগৎসংসার বিস্মৃত হইলেন; বৃষ্টি, বায়ু, মেঘগর্জ্জন বিস্মৃত হইলেন; চিন্তা, দুঃখ, বিপদ্ বিস্মৃত হই-

লেন; স্থান, কাল, বিস্মৃত হইলেন। কেবলমাত্র পরস্পরের আলিঙ্গনসুখ ভিন্ন তাঁহাদের পক্ষে জগৎসংসারে যেন আর কিছুই নাই।

ইন্দ্রনাথ সরলার অশ্রুপ্লাবিত কপোলদ্বয় পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, ললাট ও ওষ্ঠদয় পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। সরলা প্রায় সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া বৃক্ষোপরি বল্লরীর ন্যায় ইন্দ্রনাথের শরীরের উপর গলিয়া পড়িল।

তাঁহাদিগের সুখ বর্ণনাতীত। এ জগতে সেরূপ সুখের মুহূর্ত্ত অতি বিরল,—সেরূপ অসীম আনন্দ যাহার জীবনে একবার ঘটে সেই ভাগ্যবান, অধিকবার কাহারও ঘটে না।

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "সরলা তোমার জন্য আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি।"

সরলা উত্তর করিতে পারিল না, জলে নয়ন ভাসিয়া গেল। সে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচন চুম্বন করিয়া ইন্দ্রনাথ আবার বলিলেন, "সরলা তুমি আমার জন্য ভাবিতে?"

এ কথায় সরলা কি উত্তর দিবে? মনে মনে ভাবিল, "ভাবিতাম কি না ভগবান জানেন।" প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিল না। আবার নয়নজলে বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

কাহার অধিক কথা নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের মনের কি ভাব, পরস্পরের প্রতি সেই অবারিত আনন্দাশ্রুর বিন্দুতে তাহা প্রকাশ পাইতেছিল।

আবার অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে রহিলেন। পরে ইন্দ্রনাথ পুনরায় বলিলেন, "সরলা, এ ছয়মাস তোমাকে না দেখিয়া যে আমার কিরূপে কাটিয়াছে, স্মরণ করিলে হৃৎকম্প হয়। যুদ্ধের সময়, বিশ্রামের

সময়, কার্য্যের সময়, নিদ্রার সময়, তোমার নির্ম্মল মুখচন্দ্রিমা আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত থাকিত।”

সরলা উত্তর করিল—“ইন্দ্রনাথ”——

কথা আপনা হইতেই রুদ্ধ হইল, ছয় মাসের পর ইন্দ্রনাথের নিকট তাহার এই প্রথম কথা, একটী কথা কহিতেই লজ্জায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইল! মুখে কথা আসিয়াছে, ওষ্ঠ কম্পিত হইতেছে, কিন্তু কথা বাহির হইতেছে না, লজ্জায় অধোবদন হইল।

সে অমৃতবর্ষী পূর্ব্বপরিচিত স্বর শুনিয়া ইন্দ্রনাথের হৃদয়কন্দর পর্য্যন্ত বিলোড়িত ও কম্পিত হইল! সে অপরিস্ফুট “ইন্দ্রনাথ” কথাটী ছয়মাস পরে শুনিয়া ইন্দ্রনাথের নয়নে আনন্দাশ্রু আসিল। ধীরে সরলার বদনখানি তুলিয়া গাঢ় চুম্বনে সেই কম্পিত ওষ্ঠ একেবারে রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

সে সুখের রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যায় নাই। সমস্ত রাত্রি সেই গৃহে বসিয়া দুইজনে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সরলা কত দুঃখের কথা কহিল,—আশায় হতাশ, ভরসায় নৈরাশ, চিন্তায় দুঃখ এই সকল কথা কহিতে লাগিল। সে কাহিনী কি শেষ হয়,—জগতের মধ্যে যাহাকে হৃদয়ের স্পর্শমণি বলিয়া গণ্য করি, তাহার নিকট যখন মনের কবাট খুলিয়া মনের কথা বলিতে আরম্ভ করি, সে কথার কি শেষ আছে? ইন্দ্রনাথও সেই অনন্ত কথা শুনিতে লাগিলেন, সরলার সেই সরল মুখখানির দিকে চাহিতে লাগিলেন,—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না।

প্রাতঃকালে ইন্দ্রনাথ আপন নৌকা হইতে কয়েক জন সৈনিক পুরুষকে ডাকাইলেন। পরে রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে শকুনিকে বন্দী করিয়া লইয়া

ইচ্ছাপুরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাশ্বেতা, সরলা ও বিমলা এক নৌকায় যাত্রা করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যার সময় ইচ্ছাপুরে পঁহুছিলেন। ইন্দ্রনাথ পিতার চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার চিন্তা দূর করিলেন।

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

When wild war's deadly blast was blown,
And gentle peace returning
With many a sweet babe fatherless,
And many a widow mourning,
I left the lines and tented field,
Where long I'd been a lodger.

Burns.

বহুকালের পর পরস্পরের সহিত পরস্পরের মিলনে যে কি অপর্য্যাপ্ত সুখ লাভ করিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। নগেন্দ্রনাথ বহুকাল পরে পুত্রকে পাইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পুত্রকে বার বার আলিঙ্গন করিয়া সহস্র আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

বনাশ্রম হইতে চন্দ্রশেখর আপন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া ইচ্ছাপুরে আসিলেন। রুদ্রপুর হইতে অমলা বৃদ্ধ স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা টোডরমল্ল আসিবেন শুনিয়া সকলেই সকল দিক্ হইতে ইচ্ছাপুরে আসিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ যে জমীদার নগেন্দ্রনাথের পুত্র তাহা সকলেই জানিতে পারিল। সরলা একদিন গোপনে

সুরেন্দ্রনাথকে কহিল,—"আমি তোমাকে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র বলিয়া ভাল বাসিতাম, জমীদারপুত্র জানিলে ভয়ে কথা কহিতাম না।"

ইন্দ্রনাথ সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, "দোহাই ধর্ম্ম! সেজন্য এখন যেন পুরাতন ভালবাসা ভুলিও না।"

সরলা বলিল, "পারিব কেন?" বলিয়াই বেগে পলায়ন করিল।

অমলা অধিকতর লজ্জিত হইল। রুদ্রপুরে ইন্দ্রনাথকে সামান্য ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া কত তামাসা করিত, এক্ষণে তাঁহাকে জমীদারপুত্র জানিয়া লজ্জায় কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অল্পে ছাড়িবার লোক নহেন। এক দিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া নবীনদাসের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া দেড় হাত ঘোম্‌টা টানিল।

ইন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বটে, এই বুঝি পুরাতন ভালবাসা?"

অমলা লজ্জিত হইল, অথচ তামাসা ছাড়িল না, অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বলিল,—

"আপনি পরের বাড়ীর ভিতর গিয়া এইরূপ মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন, আমি সরলাকে বলিয়া দিব।"

ইন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "অমলা তুমি আমাকে পর মনে কর,—আমি তোমাকে পর মনে করি না।"

অমলা এবার অপ্রতিভ হইল। অবগুণ্ঠন তুলিয়া বলিল, "ইন্দ্র——সুরেন্দ্রনাথ আমায় ক্ষমা কর, আর আমি তোমার নিকট লজ্জা করিব না।"

সেই অবধি অমলার লজ্জা ভঙ্গ হইল।

মহাশ্বেতা যে রাজা সমরসিংহের বিধবা, তাহা জানিয়া লোকে অধিকতর বিস্মিত হইল। এখন আর মহাশ্বেতা দরিদ্রা নহেন, রাজা টোডরমল্লের আজ্ঞানুসারে সমরসিংহের বিস্তীর্ণ অধিকার তাঁহার বিধবা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে মহাশ্বেতা আপন কন্যার সহিত সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ দিতে অসম্মত ছিলেন না।

এক দিন অমলা আসিয়া সরলাকে বলিল, "সই, এখন তোমরা বড় মানুষ হইলে, এবার আমাদের ভুলিয়া যাইবে।"

সরলার চক্ষুতে জল আসিল, বলিল, "সই জীবন থাকিতে আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না।"

অমলা সরলার চক্ষুর জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "ছি সই তামাসা বুঝ না, আমি তোমাকে কেবল তামাসা করিয়াছিলাম, তাহাতেই চক্ষুতে জল? তুমি আমাকে কখনও ভুলিবে না তাহা জানি,—কিন্তু পৃথিবীতে কয় জন আছে যে বড়লোক হইলে আপন পুরাতন বন্ধুদিগকে ভুলে না। সকল স্ত্রীলোক যদি সরলার মত হইত, আর সকল পুরুষ যদি সুরেন্দ্রনাথের মত হইত, তাহা হইলে সংসার স্বর্গ হইত।"

সকলের সুখ দেখিয়া বিমলাও আপনার দুঃখ কিয়দংশ বিস্মৃত হইলেন। সরলার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ হইয়াছিল, সেই সরলা আজি বিস্তীর্ণ জমীদারির উত্তরাধিকারিণী, পাপাত্মা শকুনি এক্ষণে বন্দী এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া আপন মনের ক্লেশ কথঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

চিন্তাশীলা কমলাও তাঁহাদিগের সহিত থাকিতেন, কিন্তু পূর্ব্বের মত সততই চিন্তায় অভিভূতা। যখন কথা

কহিতেন তাঁহার সারগর্ভ কথা শুনিয়া সকলেই চরিতার্থ হইতেন, সকলেই একাগ্রচিত্তে আরও শুনিতে চাহিতেন। এইরূপে চারি জন বয়স্যা সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক মহাশয়! আমাদের উপন্যাস প্রায় শেষ হইল। আপনি যদি আমাদের উপর সন্তুষ্ট না হইয়া থাকেন, তবে আইসুন এই স্থানেই বিদায় লই। আর যদি আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকি, তবে আপনার একটী মনের কথা বলুন দেখি; এই কথাটী কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিব, আপনি কাণে কাণে উত্তর করিবেন, অপর লোকে যেন কেহ টের পায় না। বলুন দেখি, এই চারিটী সমবয়স্যার মধ্যে কোন্‌টীকে আপনার মনে ধরে?

সৌন্দর্য্যে বিমলা সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই উজ্জ্বল রূপরাশি দেখিয়া বোধ হয়, কোন কোন পাঠক তাঁহাকেই মনোনীত করিবেন। বিশেষ বিমলা তেজস্বিনী, উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, বীরপুরুষের যোগ্যা বীরাঙ্গনা। কিন্তু না! অনেকেই বোধ হয় তাঁহাতে নারাজ। অনেকেই বলিবেন, "বীরাঙ্গনায় আমাদের কাজ নাই, রূপে কাজ নাই, তেজে কাজ নাই, একেই গৃহিণীর মুখঝাম্‌টায় প্রাণ অস্থির, তার উপর তেজ! শেষকালে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবে! বাবা! ও মেয়েকে রেখে দাও, বরং আর কাহাকেও দাও।"

পাঠক মহাশয়, কমলাকে লইতে সম্মত আছেন? কমলা সুন্দরী, শান্ত, চিন্তাশীলা। গ্রীষ্মের দিন গত হইলে শীতল সায়ংকাল যেরূপ শান্ত, নিস্তব্ধ, সুখপ্রদায়ি-চিন্তা-উত্তেজক, কমলা সেইরূপ শান্ত, গম্ভীর, সুখদায়িনী, চিন্তাশীলা। হৃদয়ে কোন উৎপাত নাই, নয়ন

দুইটী প্রশস্ত, শান্ত ও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, কেশরাশিও নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ, অধিক সময়েই আলুলায়িত হইয়া পৃষ্ঠে লম্বিত হইয়া থাকে, বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া থাকে। সমস্ত অবয়বে শান্তভাব লক্ষিত হইতেছে। বোধ হয় এরূপ নায়িকা পাইলে অনেকেরই মনে ধরিবে। কিন্তু কোন কোন পাঠক বলিবেন, "না, অত চিন্তা করিলে চলে না। বাঙ্গালীর মেয়ে, ঘরের কায করিতে হইবে, অত চিন্তা করিলে হবে কেন? খোলায় মাছ দিয়া উনি যে চিন্তা করিতে বসিবেন, আর আমাকে যে প্রত্যহ চোঁয়া মাছ খেতে হবে, তা পারিব না। চন্দ্রশেখর যোগী পুরুষ, ওঁর খাওয়ায় ভাল মন্দ আইসে যায় না, কিন্তু আমার ভাল খাওয়া টুকু না হইলে চলে না। চিন্তাশীলায় আমার কায নাই, অন্য এক জনকে দেখ।"

সরলচিত্তা প্রেমবিহ্বলা সরলাকে বোধ হয় অনেক পাঠকেরই মনে ধরিবে। আমাদের ত ইচ্ছা মনে ধরে কিন্তু পাঠক মহাশয় তাহাতে সম্মত হয়েন কই। কোন কোন পাঠক বলিবেন, "না বাপু, ও প্যানপেনে ভ্যানভেনে মেয়েকে আমার কায নাই। উপন্যাসে পড়িতে ভাল কিন্তু কাযের সময় কিছু নয়। একটু বুদ্ধি শুদ্ধি থাকে, একটু চালাক চতুর হয়, দুই একটা ঠাট্টা তামাসা করিবে, দুই একবার মুখনাড়া দিবে, তবে বাড়ীর গৃহিণী বলিয়া বোধ হয়। তা নয় এ কোথাকার বোবা মেয়ে, কথা বার্ত্তা জানে না, ওকে আমার কায নাই।"

চঞ্চলহৃদয়া, প্রশস্তনয়না, চতুরা, রূপলাবণ্যসম্পন্না অমলাকে বোধ হয় অনেক পাঠক মহাশয়েরই মনে ধরিবে। তবে কৈবর্ত্তের মেয়ে বলিয়া যদি কেহ কেহ

ঘৃণা করেন, আর——বৃদ্ধস্বামী বর্ত্তমান! বিধবা হইলেও বরং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকাইয়া কোন রকম চেষ্টা দেখা যাইত, কিন্তু বুড় এখনও মরে নাই।

তবে হইল না, পাঠক মহাশয়! আপনার কপালে নাই! আমাদের দোষ নাই। অন্য উপন্যাসে একটী করিয়া নায়িকা থাকা রীতি, আমরা আপনার মনোরঞ্জনার্থ চার চারিটী নায়িকা আনাইয়াছিলাম। তাহাতেও যদি মন না উঠে, তবে আর আমাদের দোষ কোথায়। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?"

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

অপরূপ পুনর্ম্মিলন।

She gazed—she reddened like a rose,
Sine pale like ony lily;
She sank within my arms and cried,
"Art thou my ain dear Willie?"
"By Him who made you, sun and sky,
By whom true love's regarded,
I am the man; and thus may still
True lovers be rewarded."

Burns.

সন্ধ্যাকাল আগত। কমলা একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে ইচ্ছাপুর হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন। একাকী যমুনার তীরে বসিয়া স্বভাবের নিস্তব্ধ ভাব অবলোকন করিতেছিলেন, ঘন বৃক্ষাবলির মধ্যে পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোৎমালা খেলা করিতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। নীল আকাশে দুই একটী শুভ্র মেঘ ভাসিয়া

যাইতেছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। শান্ত নদীর উপর একখানি মাত্র ক্ষুদ্র তরী ভাসিতেছে তাহাই দেখিতেছিলেন। নদীজলে দুই একটী তারা প্রতিফলিত হইয়া কম্পিত হইতেছে, দূরস্থ গ্রামের মধ্য হইতে দুই একটী প্রদীপ দেখা যাইতেছে।

কমলা সততই চিন্তাশীলা, কিন্তু অদ্য বোধ হইতেছে, যেন কেন বিশেষ চিন্তায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। সেই নদীতীরে বসিয়া শান্ত নয়ন দুইটী ফিরাইয়া আকাশের দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন। তারার শান্ত জ্যোতি সেই শান্ত নয়ন ও মুখমণ্ডলের উপর পড়িতেছে। আলুলায়িত কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত রহিয়াছে, বা বদনমণ্ডল ঈষৎ আবৃত করিয়া উন্নত বক্ষঃস্থলের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুর উপর বদনমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। আজি এই গম্ভীরভাবে কমলা কি চিন্তা করিছেন?

কমলা আজি পূর্ব্বকালের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার স্মরণ নাই, কিন্তু তাহার পর পীড়ার সময় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কমলা তাহাই স্মরণ করিতেছেন। স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যেন গভীর নীল আকাশে এক খানি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে;—চাহিয়া দেখিলেন, অদ্য যথার্থই সেইরূপ গভীর নীল আকাশে সেইরূপ একখানি শুভ্র মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। আরও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, সেই মেঘের উপর কোন দেবপুরুষ একখানি ক্ষেপণী হস্তে করিয়া অনন্ত আকাশে সেই মেঘখানি চালনা করিতেছেন। চাহিয়া দেখিলেন, মেঘের উপর কোন দেবপুরুষ নাই, কিন্তু নদীর উপর সেইরূপ দেবাকৃতি এক জন মনুষ্য এক খানি তরী চালন করিতেছে। স্বপ্নে দেখিয়া-

ছিলেন, সেই দেবপুরুষের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সেই নৌকাচালক নাবিকের স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত লম্বিত রহিয়াছে। পাঠক মহাশয়কে বলা বাহুল্য যে, সে পূর্ব্বপরিচিত মুঙ্গেরের নাবিক।

কমলা বার বার সেই দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সহস্র চিন্তা জাগরিত হইতে লাগিল। "এ নাবিক কে? জাতিতে ব্রাহ্মণ! ব্যবসায়ে নাবিক! আর আমি যে দেবপুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম, আকৃতি অবয়ব সেইরূপ! সেইরূপে দাঁড় ধরিয়াছে, সেইরূপ গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছে! ইনি কি সেই দেবপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন?"

সহসা চন্দ্রোদয় হইল, সেই নীল আকাশ, সেই অনন্ত বৃক্ষাবলী, সেই নদী আলোকে পরিপূর্ণ করিয়া চন্দ্রোদয় হইল। সেই চন্দ্রালোকে নাবিকের মুখমণ্ডল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইল। দেখিবামাত্র পূর্ব্বস্মৃতি অবারিত সহস্র সাগরতরঙ্গের ন্যায় বেগে কমলার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। কমলা ক্ষণেক উন্মত্তার ন্যায় কম্পিতকলেবরে সেই মুখমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া পরে চীৎকার শব্দে "উপেন্দ্রনাথ" এই মাত্র উচ্চারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া জলে নিপতিত হইলেন!

নাবিকও অনেকক্ষণ অবধি সেই রমণীর দিকে দৃষ্টি করিতেছিলেন, নবোদিত চন্দ্রালোকে সহসা সেই রমণীর মুখমণ্ডল দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হইল! রমণী জলে পড়িবামাত্র তিনিও ঝাঁপ দিয়া জলে পড়িলেন। "হৃদয়ের কমলা, তোমাকে কি আবার পাইলাম, না স্বপ্ন দেখিতেছি!" এই বলিয়া সেই চৈতন্যশূন্য শরীর নদীতীরে তুলিলেন।

সেই চন্দ্রালোকে, সেই জনশূন্য নদী-তীরে, সেই নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর পার্শ্বে, নাবিক যত্নসহকারে কমলার চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনিমেষ লোচনে সেই মনোহর বদনমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুন্দর ললাট, সেই নিবিড় কৃষ্ণ ভ্রূযুগল, সেই স্নেহপরিপূর্ণ চিন্তাপ্রকাশক নয়ন, সেই মধুর ওষ্ঠ, ও সেই নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই উন্নত হৃদয় ও সুসৌষ্ঠব বাহুযুগল আবরণ করিতেছে। উপেন্দ্র দেখিতে দেখিতে পাগলের ন্যায় হইয়া সেই হৃদয়ের প্রতিমাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। যখন কমলা পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, স্বামীর আলিঙ্গনে রুদ্ধ রহিয়াছেন, স্বামীর ওষ্ঠে আপনার ওষ্ঠ, স্বামীর হৃদয়ে আপনার হৃদয়!

চিরবিরহের পর পুনর্ম্মিলনে প্রেমিকযুগলের হৃদয়ে যে অতুল আনন্দ, যে অনির্ব্বচনীয় সুখলহরী উথলিয়া পড়িতেছিল, কাহার সাধ্য তাহা অনুভব করে? পরস্পরের মুখ দেখিয়া বহুকালের প্রেমতৃষ্ণা নিবারণ করিয়া তাঁহারা যেরূপ উন্মত্তের ন্যায় অপরিসীম আনন্দসাগরে ভাসিতেছিলেন, কে তাহা অনুভব করিতে পারে? পরস্পরের হৃদয়ে হৃদয় সংস্থাপন করিয়া যে স্বর্গীয় শান্তি লাভ করিতেছিলেন, কে অনু-ভব করিতে পারে? সেরূপ সুখ জগতে নাই, স্বর্গেও বিরল!

অনেকক্ষণ পরে উপেন্দ্র বলিলেন, "নিকুঞ্জবাসিনী কমলা! আমি মরি নাই, কিন্তু তোমাকে আর পাইব, আমার আশা ছিল না, গ্রামের লোকে আমাকে বলিয়াছিল, তোমার পীড়ায় কাল হইয়াছে।"

কমলা বলিলেন, "হৃদয়েশ্বর! আমার সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু অনেক দিন পরে নিস্তার পাইয়াছিলাম।

যখন নিস্তার পাইলাম তখন আমি বনাশ্রমে। কিন্তু তুমি যে নৌকায় গিয়াছিলে, লোকে আমাকে বলিল, সে নৌকা ঝড়ে উল্টাইয়া সকলের মৃত্যু হইয়াছে।

উপে। "সকলের মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের উপর সদয়, অন্ধকার রজনীর পুনর্ম্মিলনের জন্য আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু আর কিছু রক্ষা করেন নাই, পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত আমার ছিল না। ভিক্ষা করিতে করিতে অনেক দিন পর মুঙ্গেরে পঁহুছিলাম। তথায় যাইয়া তোমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিলাম, ইচ্ছা হইল, নৌকার অন্যান্য লোকের সহিত আমারও মৃত্যু হইলে ভাল হইত।"

কম। "ভগবানের কি বিচিত্র লীলা। বহুদিন হইল তুমি একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলে, চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আমাকে পাইলে ও পাণিগ্রহণ করিলে। আজি আমি মূর্চ্ছা হইতে চৈতন্য লাভ করিয়া তোমাকে পাইলাম।"

এইরূপ কথা কহিতে কহিতে উভয়ে ইচ্ছাপুরাভিমুখে গমন করিলেন। উভয়ই পূর্ব্বকালের কথা কহিতে লাগিলেন, সে কথা কহিতে কহিতে কমলার বাল্যকালাবধি সমস্ত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল।

দ্রুতবেগে চন্দ্রশেখরের নিকট আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া কমলা রোদন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্রশেখর বিস্মিত হইয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন,—

"পিতা, এতদিন আপনাকে পিতা বলিয়াছি, আপনিও আমাকে কন্যার অধিক স্নেহ করিয়াছেন, অদ্য জানিলাম আপনি যথার্থই আমার জন্মদাতা।"

সকলেই বিস্মিত হইল। চন্দ্রশেখর কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিয়া সবিশেষ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কমলা অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আপনি অনেকবার আমাকে বলিয়াছেন, আপনি আপন কন্যাকে শৈশবাবস্থায় গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন,—তথা হইতে তাহাকে কে তুলিয়া লয়, জানেন?"

চন্দ্র। "নবদ্বীপনিবাসী হরিদাস ভট্টাচার্য্য।"

কম। "তবে আর সন্দেহ নাই, আমি সেই নবদ্বীপের হরিদাস ভট্টাচার্য্যের দ্বারা পালিত, তিনিও সর্ব্বদা আমাকে বলিতেন, আমি চন্দ্রশেখর নামক যোগী পুরুষের কন্যা।"

চন্দ্রশেখরের বদনমণ্ডল আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। বলিলেন, "ভগবান কি আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবেন, আমার প্রাণের কন্যাকে কি ফিরিয়া পাইলাম," এই বলিয়া কমলাকে পুনরায় বক্ষে লইয়া আলিঙ্গন করিলেন; পরে বলিলেন,—"কমলা আর একটী কথা আছে,—তোমার শরীরে কোন স্থানে কোন চিহ্ন আছে?"

কমলা পিতাকে নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় বক্ষঃস্থল হইতে বস্ত্র অপসারিত করিলে চন্দ্রশেখর দেখিলেন, স্তনদ্বয়ের মধ্যে শিবের আকৃতি এক্ষণও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

তখন চন্দ্রশেখর আনন্দে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কমলাকে ক্রোড়ে লইয়া

আলিঙ্গন করিলেন, বার বার মুখচুম্বন করিতে লাগি-লেন ও বলিতে লাগিলেন, "আজি আমার কি সুখের দিন, আজি যদি আমার অভাগিনী গৃহিণী জীবিত থাকিত, প্রাণের দুহিতাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া হৃদয় শান্ত করিত।"

তখন চন্দ্রশেখর কমলাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এতদিন কোথায় ছিলে, আর অদ্য এ সুখের সংবাদ কোথা হইতে পাইলে ইত্যাদি নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কমলা বলিলেন, "পিতা শ্রবণ করুন—

"হরিদাস ভট্টাচার্য্য আমাকে পাইবার কিছুদিন পর সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে যাত্রা করি-লেন ও তথায় অনেকদিন বাস করিতে লাগিলেন। যখন আমার বয়ঃক্রম ৮।৯ বৎসর হইবে তখন হরি-দাসের একটী পুত্র সন্তান হইল। এতদিন নিঃসন্তান থাকিয়া আমাকেই যত্ন করিয়া কন্যার মত লালন-পালন করিতেন, এক্ষণে বৃদ্ধবয়সে পুত্র হওয়াতে আনন্দের আর সীমা রহিল না।

"পুত্র প্রসব হইবার কয়েক মাস পরে হরিদাসের গৃহিণীর কাল হইল, সুতরাং সেই পুত্রকে লালনপালন করিবার ভার আমার উপর পড়িল। আমি সেই অল্প বয়সে যথাসাধ্য সেই পুত্রকে লালনপালন করিতে লাগিলাম, দিনরাত্রি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া থাকিতাম, আপনার ভ্রাতা অপেক্ষা ভালবাসিতাম।

"সেই শিশুপুত্রের প্রতি আমার এইরূপ যত্ন দেখিয়া হরিদাস প্রথমে আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু পুত্র যেমন বড় হইতে লাগিল, হরিদাসের আমার উপর স্নেহেরও তেমনি হ্রাস হইতে লাগিল। অবশেষে

আমি পরিচারিকারূপে সেই গৃহে থাকিতে লাগিলাম। গৃহের অন্য পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন, আমাকে সকল কার্য্য করিতে হইত;—হরিদাস ও তাহার পুত্র আমাকে দাসী বলিয়া ডাকিতেন।

"আমার অতিশয় মনঃপীড়া হইতে লাগিল, একাকী বসিয়া কখন কখন ক্রন্দন করিতাম, কিন্তু যাহার জগৎসংসারে কেহ নাই, তাহার ক্রন্দন কে শ্রবণ করে, তাহার মনপীড়ায় কি ফল হয়। পিতা, আপনাকে স্মরণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কতবার মনে মনে ইচ্ছা হইত যে, অগাধ গঙ্গাসাগরে যখন আমি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, তখনই আমার মৃত্যু হইত।

"কেবল ইহাই নহে। পিতা আপনি জানেন, আমি জন্মাবধি কিছু অন্যমনস্কা, কিছু চিন্তাশীলা। সে জন্য আমি যে হরিদাসের নিকট কত তিরস্কার, কত ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছি বলিতে পারি না। সমস্ত দিন অবিশ্রামে গৃহের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতাম, ইহাতে যদি কোন কার্য্যে কোন প্রকারে দোষ থাকিত হরিদাস আমাকে গালি দিতেন, কখন কখন সম্মার্জ্জনীদ্বারা প্রহার করিতেন। আমি নীরবে ক্রন্দন করিতাম।

"বয়স যত অধিক হইতে লাগিল, হরিদাসের নিষ্ঠুরতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অন্যান্য দোষ জন্মাইতে লাগিল। যৌবনে যে সমস্ত দোষ হয়, হরিদাসের পত্নীর মৃত্যুর পর সেই সকল দোষ হইতে লাগিল;—ক্রমে তাঁহার গৃহ নানা প্রকার লোকের সমাগমস্থান হইয়া উঠিল।

"সুতরাং আমি তাঁহার গৃহ হইতে পলাইবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলাম;—কিন্তু একটী কারণের জন্য সহসা পলাইলাম না। আমার বোধ হইল যেন

হরিদাসের আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা হ্রাস পাইতে লাগিল। আর আমাকে কখন প্রহার করিতেন না,—বিশেষ কারণ না থাকিলে আমাকে গালিও দিতেন না। যখন গালি দিতেন তখনও সহাস্যবদনে দুই একটী কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন। তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও আমি তাঁহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিতাম, ভাবিলাম, উনি সৎ লোক হউন আর অসৎ লোকই হউন, আমি দাসী, যত দিন খাইতে পাইব, ততদিন সেবা করিব।

"হতভাগিনীর বৃথা আশা! এক দিন সমস্ত দিন কার্য্যের পর প্রায় দুই প্রহর রজনীর সময় আপন গৃহে শয়ন করিতে গেলাম, দেখিলাম,——পিতা আপনার নিকট আমার সকল কথা বলিতে লজ্জা করে,—সংক্ষেপে, সেই পামর হরিদাস আমার সতীত্ব হরণে চেষ্টা পাইল; আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, কি জন্য তিনি ইদানীং আমার প্রতি দয়ালু হইয়াছিলেন, কি জন্য আমাকে দেখিলেই হাসিতেন। চীৎকার করিয়া আমি ঘর হইতে বহির্গত হইলাম। সেই দিন, সেই দুই প্রহর রজনীতে তরুণ বয়সে অসহায় হইয়া সংসারসাগরে ঝাঁপ দিলাম।

"পিতা আপনি যে গঙ্গাসাগরে আমাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহার কূল আছে, কিন্তু আমি যে সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিলাম, তাহার কূল নাই। কিছু দিন নগর হইতে নগরে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতাম, অবশেষে,"—

কমলা লজ্জায় একেবারে মুখ অবনত করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ লজ্জা সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "অবশেষে মুঙ্গের নগরে এক ব্রাহ্মণপুত্র আমাকে বিবাহ করি-

লেন। পিতা আমি বিধবা নহি, আপনার জামতা এক্ষণও জীবিত আছেন।”

এই বলিয়া যথায় উপেন্দ্রনাথ ছিলেন,কমলা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—কিন্তু উপেন্দ্রনাথ তথায় নাই।

এরূপ সময়ে সহসা রোদননিনাদ শ্রুত হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল, উপেন্দ্র নাবিক নগেন্দ্রনাথের পদতলে পড়িয়া রোদন করিতেছেন, ও সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিয়া রোদন করিতেছেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল ও যৎপরোনাস্তি উৎসুক হইল।

উপেন্দ্র নাবিক বলিলেন, “পিতা ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে এই বৃদ্ধ বয়সে যে কষ্ট দিয়াছি, স্মরণ করিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ব্যাঘ্রে খায় নাই, হতভাগ্য এখন জীবিত আছে। আর আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না।”

আনন্দাশ্রুতে বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথের বদনমণ্ডল প্লাবিত হইল, বলিলেন, “উপেন্দ্রনাথ তোমার দোষ নাই, আমিই পাপ করিয়াছিলাম, আমিই পাপাত্মা, তোমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান জানেন, সে পাপের ফল আমি অনুভব করিয়াছি। তুমি যাইবার পরই আমার গৃহশূন্য হইল, তোমার মাতা দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। হতভাগিনি! যদি আজ জীবিত থাকিতে, অশ্বিনীকুমারের ন্যায় দুই পুত্রকে ক্রোড়ে করিতে পারিতে” এই বলিয়া বৃদ্ধ আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উপেন্দ্রনাথও মাতার কথা স্মরণ করিয়া শোকে ব্যাকুল হইলেন।

– আজি ইচ্ছাপুর নগর আনন্দলহরীতে ভাসিয়া গেল। প্রজারঞ্জক জমীদার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ফিরিয়া

পাইয়াছেন, চন্দ্রশেখর আপন কন্যাকে ফিরিয়া পাই-য়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রে ও সেই কন্যার বিবাহ হই-য়াছে। এই আনন্দের বার্ত্তা সেই রজনীতেই ইচ্ছাপুরে সকলেই জানিতে পারিল। পথে পথে, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, আনন্দের ঢাক বাজিতে লাগিল, পুরবাসীগণ বৃদ্ধ নগেন্দ্রনাথও তাঁহার পুত্রের উপর পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল,—পথ ঘাট আনন্দে ভাসিয়া গেল, প্রভাত হইবার পূর্ব্বে সেই সুখসংবাদ নগেন্দ্রনাথের জমীদারীর সকল গ্রামে রাষ্ট্র হইল।

প্রাতঃকালে সুরেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের চরণযুগলে প্রণি-পাত করিয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপ-নার অজ্ঞাতবাসে আমি আপনার প্রতি কত অশ্রদ্ধা দেখাইয়াছি, তাহা ক্ষমা করিবেন,—আমি জানিতাম না, ভ্রমবশতঃ করিয়াছি।"

উপেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "সুরেন্দ্রনাথ! তোমার ক্ষমা চাহিবার আবশ্যক নাই, জগৎসংসারে আমি তোমার মত ভ্রাতা পাইব না, তোমার সাহস বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশলের যশে বঙ্গদেশ যেরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে, দরিদ্রের প্রতি দয়া, প্রজাবাৎসল্য ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্গুণেও তুমি সেইরূপ ভূষিত আছ। আজি যেন আমি নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াছি, কিন্তু যখন তুমি আমাকে দরিদ্র নাবিক বলিয়া জানিতে, তখনও আমার সহিত ভ্রাতার মত স্নেহপূর্ব্বক কথা কহিয়াছ, একত্রে শয়ন করিয়াছ। যাঁহাদের হাতে ক্ষমতা ও ধন থাকে, তাঁহারা সকলেই যদি তোমার মত অমায়িক হয়েন, তাহা হইলে এ জগৎসংসার স্বর্গ হইত।"

চতুস্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

Behold where stands
The usurper's cursed head.
Shakespeare.

রাজা টোডরমল্ল ইচ্ছাপুরে আসিয়াছেন, আজি আনন্দে ইচ্ছাপুরবাসিগণ মত্ত হইয়াছে।

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রাজার সভা হইয়াছে, সে সভার শোভা বর্ণনা করা যায় না। উপরে অতি বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ লম্বিত রহিয়াছে, সেই পট্টবস্ত্র-নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ জরীতে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। চন্দ্রাতপের পার্শ্ব হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্পমালা ভূমি পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে; শুভ্র রক্তবর্ণ নীল পীত প্রভৃতি নানাপ্রকার পুষ্পে সেই চন্দ্রাতপ অধিকতর শোভিত হইয়াছে। চন্দ্রাতপের নীচে বিস্তীর্ণ শয্যা রচিত হইয়াছে, সে শয্যা রক্তবর্ণ মক্‌মলে মণ্ডিত, ও তাহার উপর অতি সুন্দর বিচিত্র স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য শোভা পাইতেছে। সেই মক্‌মলের স্থানে স্থানে সুন্দর পুষ্প, সুন্দর লতা ও অপরূপ পত্র চিত্রিত রহিয়াছে, এত সুন্দর যে সহসা কেহ্‌ আসিলে সেই পুষ্পলতার উপর পদবিক্ষেপ করিতে সঙ্কোচ করে। সভার মধ্যস্থলে একটী দ্বিরদরদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার চারি পার্শ্বে ক্ষমতা ও ধনসম্পন্ন যোদ্ধা ও জমীদারগণ সমবেত রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকারে সুগন্ধ পুষ্প সজ্জিত রহিয়াছে, চতুর্দ্দিকে ভৃত্যগণ বহুমূল্য বস্ত্র পরি-

ধান করিয়া চামর ব্যজন করিতেছে। জমীদার ও যোদ্ধাগণ সকলেই সুবর্ণ ও রৌপ্যখচিত বহুমূল্য বস্ত্রে শোভা পাইতেছিলেন।

সভার তিন দিকে পদাতিগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহীগণ নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রস্তরপুত্তলীর ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া রহিয়াছে,—তাহার পশ্চাতে আবার মাতঙ্গশ্রেণী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এইরূপে তিন দিক্ সৈন্য সামন্তে বেষ্টিত। সম্মুখে রাজার আসিবার জন্য প্রশস্ত ও অতি দীর্ঘ একটী পথ, সে পথও রক্তবর্ণ মকমল দিয়া মণ্ডিত, তাহার দুই পার্শ্বে আবার সৈন্যগণ সেইরূপে সন্নিবেশিত, নিকটে ধ্বজবহ পদাতিক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান, তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহী কৃপাণপাণি হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার পশ্চাতে হস্তী-শ্রেণী। তরুণ-অরুণকিরণে সেই নিষ্কোষিত খড়্গ ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল, প্রাতঃকালের শীতল বায়ুতে সেই উচ্চ পতাকা সকল পতপত শব্দে উড্ডীন হইতে লাগিল। শত শত যুদ্ধক্ষেত্রে যে জয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, আজি ইচ্ছাপুরে সেই জয়পতাকা উড্ডীন হইতেছে, দেখিয়া নিবাসিগণ আনন্দে নিমগ্ন হইতে লাগিল,—যোদ্ধাগণের হৃদয় সাহসে ও উৎসাহে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল।

সূর্য্যোদয় হইবার পরই রাজা টোডরমল্ল সভায় শুভাগমন করিলেন, তদ্দর্শনে সভাসদ্ সকলেই একবাক্যে "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধ হইলে সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে সেই জয়স্তুতি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিল। সে জয়নাদ চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন

ভীষণ দিগন্তব্যাপী মেঘগর্জ্জন গিরিগুহায় বার বার প্রতিধ্বনিত হইল।

রাজা ধীরে ধীরে সভার দিকে আসিতেছিলেন। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে নরেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ, অপর পার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথ সাদীক খাঁ ও তারশন খাঁ যাইতেছেন। পশ্চাতে আর কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন জমীদার ও সৈনিক পুরুষ ধীরে ধীরে যাইতেছেন। রাজা ধীরে ধীরে যাইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন।

তখন একেবারে সহস্র জয়ঢাক হইতে ভীষণ রণবাদ্য আরম্ভ হইল;—সে সুশ্রাব্য গম্ভীর দিগন্তব্যাপী রণবাদ্য গ্রামে গ্রামে শ্রুত হইতে লাগিল, নির্ম্মল প্রাতঃকালের নীল গগনমণ্ডলে উত্থিত হইতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া অশ্ব, গজ আস্ফালন করিতে লাগিল, সৈনিকদিগের রণক্ষেত্রের কথা মনে পড়িল, একেবারে সহস্র অসি কোষ হইতে ঝন্ঝনা শব্দে বহির্গত হইয়া রবিকরে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল।

সে বাদ্য নিস্তব্ধ হইল, তাহার পর কতরূপ দর্শন ক্রমে ক্রমে প্রদর্শিত হইল, তাহা বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। আজি দিল্লীশ্বরের সেনাপতি ও প্রতিনিধি বঙ্গদেশ জয় করিয়া ইচ্ছাপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন,—আজি কত শত বৎসরের পর একজন হিন্দু সেনাপতি বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন; সুতরাং বঙ্গদেশের মধ্যে যেস্থানে যে কোন আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তাহা রাজার সম্মুখে প্রদর্শিত হইবার জন্য সমানীত হইয়াছিল। দূরদেশ হইতে খ্যাতিসম্পন্ন নিপুণ বাদ্যকর আপনার বাদ্য শুনাইয়া রাজা ও সভাসদ্‌গণকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিল, দেশ দেশ হইতে সুন্দর গায়কগণ সুললিত

গীতধ্বনিতে সকলের মন মুগ্ধ করিতে লাগিল। নর্ত্তকী-গণ আপন অতুল্য রূপরাশি বিস্তার করিয়া ও নানা অঙ্গভঙ্গী ও সুললিত স্বরে সকলের হৃদয় অপহরণ করিতে লাগিল। ঐন্দ্রজালিকগণ বিচিত্র ইন্দ্রজাল দেখাইয়া, যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মল্লযুদ্ধ প্রদর্শন করাইয়া, ধানুষ্কগণ বিস্ময়কর তীর বিক্ষেপ করিয়া, সকলেই আপনাপন অপরূপ কৌশল দেখাইয়া সভাসদ্গণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

অবশেষে কবির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বঙ্গদেশে তৎ-কালে যাঁহারা কবি-শক্তিতে পারদর্শী ছিলেন, সকলেই রাজার নিকট আপনাপন গুণের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। একে একে সকলেই আপনা-পন রচিত কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যা ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া দর্শক ও শ্রোতা-দিগের হৃদয় নানারূপ ভাবে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন। কেহ বা যুদ্ধের বর্ণনা দ্বারা সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, যোদ্ধাদিগের খড়্গ যেন স্বতঃই কোষ হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। কেহ বা দেবদেবীর স্তুতি পাঠ করিয়া সকলের মন ভক্তি-পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন, কেহ বা প্রেমের কথা আনিয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় দ্রবীভূত করিতে লাগিলেন, আবার কেহ দুঃখের কথা বলিয়া সভাসদ্গণের চক্ষু জলে প্লাবিত করিতে লাগি-লেন। কবিতার মোহিনীশক্তিতে যোদ্ধার হৃদয়ও গলিতে লাগিল, যোদ্ধার নয়নেও জল আসিল।

সেই কবিমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, বিচার করা অতি-শয় দুরূহ হইল। সভাসদ্গণও সকলেই একবাক্যে দুই জনকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিলেন, একজন যুবক ও অপর বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে, বিবেচনা

করিয়া স্থির করা সহজ হইল না। অবশেষে রাজা টোডরমল্ল আদেশ করিলেন,—"আপনারা আর এক-বার আপনাপন রচিত এক একটী কবিতা পাঠ করুন।"

যুবক উমার একটী স্তুতি পাঠ করিলেন, সে স্তুতি কি অপূর্ব্বভাব কি ভক্তিরস-পরিপূর্ণ। শুনিতে শুনিতে সভাসদ্গণ জগৎ-সংসার ভুলিয়া গেলেন, ঐহিক বাসনা ভুলিয়া গেলেন, এই সংসারের মায়া ভুলিয়া গেলেন। একেবারে ভক্তিরসে অভিভূত হইলেন। রহিয়া রহিয়া কবি যখন "মা" বলিয়া ডাকিতে লাগি-লেন, সভাসদ্গণ যেন সাক্ষাৎ সেই জগৎ-বিমোহিনী বিশ্বেশ্বরী জগৎ-মাতা দুর্গাকে দেখিতে লাগিলেন। কবির কবিতা যখন সাঙ্গ হইল, শ্রোতাগণের কর্ণে সেই সুমধুর কবিতা তখনও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজা টোডরমল্লের হিন্দুধর্ম্মে গাঢ় ভক্তি ছিল। এই ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে যে কিপর্য্যন্ত ভক্তিরসের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। কবিতা সাঙ্গ হইলে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে বলিলেন, "আপনার জন্ম সার্থক, চণ্ডী যথার্থই আপনার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমরা কেবল বৃথা মায়াজালে জড়িত হইয়া রহিয়াছি, রাজ্যশাসন ত্যাগ করিয়া আপনার মত ভিক্ষা করত জীবন ধারণ করিয়াও ঐ অপরূপ কবিতা শিখিতে ইচ্ছা হয়। আপনার নাম কি, নিবাস কোথায়?" এই বলিয়া গলদেশ হইতে সুবর্ণ হার উন্মোচন করিয়া কবিকে প্রদান করিলেন।

কবি উত্তর করিলেন, "মহারাজ, বর্দ্ধমান জেলায় দামুন্যা গ্রাম আমার নিবাস, আমার পিতামহের নাম

জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, আমার নাম মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। এক্ষণে বাঁকুড়ার জমীদারের অধীনে আছি, তিনিই আমাকে প্রতিপালন করিতেছেন,—আমি তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা দান করি।”

রাজা বলিলেন, “আমি তোমার কবিতায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার চণ্ডীর প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি দেখিতেছি, একখানি ‘চণ্ডীকাব্য’ রচনা কর, তোমার নাম চিরস্মরণীয় হইবে,” এই বলিয়া দ্বিতীয় কবিকে পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

সকলেই ইঙ্গিত করিয়া বৃদ্ধ কবিকে কবিতা পাঠ করিতে নিষেধ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, “মুকুন্দরামকে রাজা যেরূপ প্রশংসা করিলেন, আর তোমার কবিতা পাঠ করা বৃথা, কি জন্য অপদস্থ হইবে,—অগ্রেই পরাজয় স্বীকার কর, মানে মানে গৃহে প্রত্যাগমন কর,” কিন্তু কবি কাহারও কথা শ্রবণ না করিয়া কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্রের শোকে রাজা দশরথের মৃত্যু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পাঠারম্ভ করিবার পূর্ব্বে সকলেই স্থির করিয়াছিলেন, মুকুন্দরাম জয় লাভ করিবেন, কিন্তু যখন সেই প্রাচীন কবি গম্ভীরস্বরে, অশ্রুপরিপূর্ণলোচনে সেই দুঃখবার্ত্তা গাইতে আরম্ভ করিলেন, সকলেই একেবারে চমকিত হইলেন। ভাষাসাগর মন্থন করিয়া সুচিক্কণ বাক্যরত্ন সমুদায় নির্ব্বাচন করত যখন কবি আপনার গান আরম্ভ করিলেন, তাহার উপর যখন আপনার অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত ও স্বরমাধুর্য্য প্রদান করিলেন, প্রদান করিয়া যখন প্রাণপ্রিয় রাম লক্ষ্মণ বিরহে বৃদ্ধ রাজা দশরথের শোক বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন সকল সভাসদ্গণের হৃদয়

একেবারে দ্রবীভূত হইয়া গেল। কবির নিরানন্দ শুষ্ক-মূর্ত্তি, শীর্ণবাহু, শীর্ণ কলেবর ও মস্তকে শুক্ল কেশ, অথচ জ্যোতিপরিপূর্ণ নয়নদ্বয় দেখিয়া সকলের হৃদয় অধিকতর দ্রবীভূত হইতে লাগিল। নগেন্দ্রনাথ আপনার পুত্রদ্বয়ের অবর্ত্তমানে যে শোক অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিলেন, সে কথা স্মরণ হইবামাত্র সহসা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—তাঁহার রোদন শুনিয়া ও কবির গীতের মহিমাতে সভাসদাগণের মধ্যে অনেকেই রোদন করিলেন, সকলেরই চক্ষুতে জল আসিল। রাজা টোডরমল্লও চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "মহাশয়, আর আবশ্যক নাই, আপনারা দুই জনই সমতুল, দুই জনই অতুল্য। আপনার নাম কি?" বলিয়া আপন হস্ত হইতে সুবর্ণ বলয় লইয়া কবির হস্তে পরাইয়া দিলেন। কবি উত্তর করিলেন, "আমি নবদ্বীপ জেলার অন্তঃপাতী ফুলিয়া গ্রামের মুরারি ওঝার পৌত্র, নাম কীর্ত্তিবাস ওঝা।"

রাজা বলিলেন,—

"কীর্ত্তিবাস! আপনার কীর্ত্তি বঙ্গদেশে চিরকাল বাস করিবে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আপনার কবিতা পাঠ করিবে, আজি যেরূপ সভাসদ্গণ আপনার কবিতা শুনিয়া ক্রন্দন করিলেন, যুগ যুগান্তরেও কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি পুরুষ, কি অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী সকলেই আপনার কবিতা পাঠ করিয়া ক্রন্দন করিবে।" রাজা সকলকেই কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন।

পরে রাজা আদেশ দিলেন, "আর আমোদ প্রমোদে আবশ্যক নাই, এখনও আমাদিগের প্রধান কার্য্য করিতে আছে, বন্দীকে লইয়া আইস।"

চারি জন সৈনিক পুরুষ শকুনিকে লইয়া আসিল। শকুনি আসিয়া রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। মলিন পরিচ্ছদ, দুই হস্ত বদ্ধ, বন্দী ভূমির দিকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি মহাত্মা সমরসিংহের নিরাশ্রয়, বিধবা ও অনাথা কন্যার পক্ষ হইতে অভিযোগ করিতেছি, এই নরাধম রাজা সমরসিংহের নামে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড করাইয়াছিল। রাজা সমরসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুগত দাস ছিলেন,—দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও সেনাপতির নিকট আমি সেই বীর পুরুষের হত্যার নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রনাথ রাজার হস্তে কতিপয় খণ্ড কাগজ দিলেন। বিমলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ হইতে নৌকাযোগে পলায়ন করিবার সময় এই কাগজ লইয়া গিয়াছিলেন।

শকুনির দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না। শকুনি যে কাগজ জাল করিয়াছিলেন, তাহা রাজার হস্তেই ছিল, তাহা বার বার পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই পত্র সকল সমরসিংহের দ্বারা পাঠান সেনাপতিদিগকে লিখিত হইয়াছিল, এইরূপ অভিযোগে সমরসিংহের প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু সে সকল পত্রে শকুনির হস্তাক্ষর, আর সমরসিংহের মোহর; সেই মোহরের প্রতিকৃতি একটা শকুনির নিজ কক্ষে পাওয়া গিয়াছে। তাহাও বিমলা দুর্গ হইতে লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

তাহার পর ছয় বৎসর কাল মহাশ্বেতা যেরূপে ছিলেন, শকুনির সহস্র চর যেরূপে মহাশ্বেতাকে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে তাড়না করিয়াছিল, যেরূপে মহাশ্বেতা কন্যার সহিত পরিশেষে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরে

রুদ্ধ হয়েন, কোন বিষয়েই প্রমাণের অভাব ছিল না। আর সতীশচন্দ্রের হত্যার কথা রাজা আপনিই জানিতেন।

তখন রাজা টোডরমল্ল সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "পামর! তোর জীবন পাপরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণও জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, পরকালে ভাল হইতে পারে, ইহকালে তোর পাপের ক্ষমা নাই।"

শকুনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমি নির্দ্দোষী।" রাজা আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "জল্লাদ! আর বিলম্বে কায নাই।"

শকুনি তখন বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমার শত্রুদিগের সকল কথা শুনিয়াছেন,—আমার একটী নিবেদন আছে।"

রাজা বলিলেন, "শীঘ্র নিবেদন কর, তোর আর অধিক পরমায়ু নাই।"

শকুনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার দোষ যদি প্রমাণ হইয়া থাকে, তথাপি আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ অবধ্য! আপনি হিন্দুধর্ম্মের পরম ভক্ত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ অবধ্য! শত সহস্র দোষ করিলেও ব্রাহ্মণ অবধ্য! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, হস্তদ্বয় বদ্ধ রহিয়াছে, যে দিকে নিরীক্ষণ করি, সেই দিকেই আমার শত্রু। সুতরাং আপনার আজ্ঞায় বাধা দিবার কেহ নাই, আমাকে সহায়তা করিবার কেহ নাই। এক্ষণে আপনি আমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলে বধ করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন। প্রায় চারিশত বৎসর অবধি

মুসলমানে বঙ্গদেশ শাসন করিতেছে,—তাহারা অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ও ম্লেচ্ছ, তথাপি তাহাদের মধ্যেও বোধ হয়, কেহ ব্রাহ্মণকে বধ করে নাই। আজি ঈশ্বর-ইচ্ছায় এক জন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পরম ধার্ম্মিক রাজা বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন,—শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করা, ব্রাহ্মণ বধ করা কি তাঁহার শাসনের প্রথম কার্য্য হইবে? মহারাজ! সাবধান! আজি আপনি যে পুণ্য কর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার যশ থাকিবে, আজি আপনি যে পাপকর্ম্ম করিবেন, চিরকাল তাহার অপযশ থাকেবে! আমি নিরাশ্রয় বন্দী, আমাকে বধ করা মুহূর্ত্তের কার্য্য, কিন্তু রাজা টোডরমল্লের শুভ্র নিষ্কলঙ্ক যশোরাশির মধ্যে সে কর্ম্ম কলঙ্কের স্বরূপ হইবে,—রাজা টোডরমল্লের জীবনচরিত্র হইতে সে দুরপনেয় কলঙ্ক শত শতাব্দীতেও বিলীন হইবে না। সমস্ত ভারতক্ষেত্রে সে কলঙ্ক রটিবে;—আমাদের কাল হইলে আমাদিগের পুত্রেরা, তাহাদিগের পর আমাদের পৌত্রেরা এ কথা স্মরণ করিয়া রাখিবে,—সহস্র বৎসর পরেও বালকগণ পুরাবৃত্তে পাঠ করিবে যে, রাজা টোডরমল্ল বঙ্গদেশে আগমনের পর প্রথমেই এক ব্রাহ্মণপুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর পরেও বৃদ্ধেরা গল্প করিবে যে, মুসলমানদিগের সময়েও যাহা হয় নাই, রাজা টোডরমল্লের শাসনকালে ব্রাহ্মণহত্যা হইয়াছিল। মহারাজ! সাবধান! আমাকে দণ্ড দিতে পারেন, কিন্তু দেশ দেশান্তরে, যুগ যুগান্তরে আপনার এ কলঙ্ক অপনীত হইবে না, ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাপে আপনার বিস্তীর্ণ যশোরাশি মলিন হইয়া যাইবে।”

শকুনি নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া রাজা চিন্তাশীল হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। শকুনি তাহা

দেখিলেন। যদি, কেহ সে সময়ে শকুনির মুখ বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিত, তাহা হইলে ওষ্ঠের নিকট অল্প হাস্যকণা দেখিতে পাইত। শকুনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন।

"যাহার যেমন তাহার তেমন। বালককে মিষ্টান্ন দিয়া বশ করিতে হয়, যুবতীকে রূপ দেখাইয়া বশ করিতে হয়, আজি যোদ্ধা ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজাকে অপযশ ও অধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া বশ করিয়াছি। যে মোহজাল বিস্তার করিয়াছি, তাহা ছিন্ন করা রাজার সাধ্য নাই। বুদ্ধির চিরকালই জয়।"

রাজা টোডরমল্ল অতিশয় হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ। "ব্রাহ্মণ অবধ্য" এ কথা হিন্দুশাস্ত্রের পত্রে পত্রে লিখিত আছে। শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে রাজা টোডরমল্ল অক্ষম। মৌনভাবে মস্তক নত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সাদীক খাঁ বলিলেন, "মহারাজ আপনি সেনাপতি, সেনাপতির ধর্ম্ম ভুলিবেন না, আপনি শাসনকর্ত্তা, শাসনকর্ত্তার ধর্ম্ম ভুলিবেন না, দোষীকে দণ্ড বিধান করুন।

রাজা ধীরে উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণ অবধ্য।"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই বিধবা ও অনাথার আপনি ভিন্ন আর কেহ নাই, ইহাদের বিচার করুন, দোষীকে দণ্ড দিন।"

রাজা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণ অবধ্য।"

সভাসদ্গণ বলিল, "মহারাজ, আপনি শিষ্টের পালন করিবেন, দুষ্টের দমন করিবেন, আপনি না দিলে এই মহাপাপীর দণ্ড কে দিবে?"

রাজা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "ব্রাহ্মণ অবধ্য।"

ইতিমধ্যে সেই সভার কিছু দূরে একটা অতিশয়

দীর্ঘকায়, শীর্ণকলেবর, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনবেশ পাগলিনী সেই সভার নিকট দৌড়াইয়া আসিল! চীৎকার শব্দ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল! সে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী।

শকুনি এতক্ষণ স্থিরভাবে ছিলেন, যখন তাঁহার মৃত্যুর আজ্ঞা হইয়াছিল, তখনও স্থিরভাবে ছিলেন, কিন্তু পাগলিনীকে দেখিয়া একেবারে কম্পিত-কলেবর হইলেন। বলিতে লাগিলেন,—"আমি দোষী, আমি দোষী, আমার প্রাণবধ করুন, কিন্তু এ পাগলিনীর কথা শুনিবেন না।"

সকলেই বিস্মিত হইল। পাগলিনী পুনরায় দণ্ডায়-মান হইয়া বলিতে লাগিল,—

"মহারাজ! আমাকে রক্ষা করুন! পামর আমার মাতাকে বধ করিয়াছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আমার মাতার বিকট আকৃতি এক্ষণও দেখিতে পাই-তেছি, ঐ দেখুন তাঁহার ভীষণ আকৃতি, ঐ দেখুন আরক্ত নয়ন, ঐ"——আর কথা বাহির হইল না, শকুনির দিকে তাহার নয়ন পতিত হওয়াতে সহসা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। রাজার আজ্ঞায় অনেক জল সেচনের পর পাগলিনীর সংজ্ঞা হইল। তখন তাহাকে পুনরায় সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করায় পাগলিনী রহিয়া রহিয়া আত্মবিবরণ করিতে লাগিল। সেরূপ প্রকারে বলিতে হইলে অনেক বিলম্ব হইবে, সুতরাং আমরা পাগলিনীর কথা সংক্ষেপে বলিব।

পাগলিনী গোপকন্যা, তাহার মাতা পরমা সুন্দরী ছিল, তাহার স্বামীর কাল হইবার পর, বিধবা গোপীকে দেখিয়া একজন ব্রাহ্মণ মোহিত হয়েন। তাঁহার ঔরসে সেই গোপস্ত্রীর গর্ভে শকুনির জন্ম হয়!

শকুনির পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন এই গোপবনিতা ও তাহার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত কন্যা বিশ্বেশ্বরীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যুর পর শকুনি অল্প বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েন। সকলে তাঁহাকে জারজ বলাতে শকুনি অল্প বয়সে অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। একদিন ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আপনার মাতাকে বিষসেবন দ্বারা হত্যা করিলেন! বিশ্বেশ্বরী পলাইল, কিন্তু সেই হত্যা দেখিয়া অবধি পাগলিনী হইল। শকুনি এই মহাপাতকের পর দেশত্যাগ করিয়া সতীশচন্দ্রের গৃহে ব্রাহ্মণপুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেন।

বিশ্বেশ্বরী প্রাণভয়ে অনেকদিন অবধি দেশ দেশান্তরে লুকাইয়া বেড়াইত। অবশেষে যেদিন বনাশ্রম হইতে মহাশ্বেতা ও সরলা চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে বন্দীরূপে নীত হয়েন, সেইদিনেই বিশ্বেশ্বরীও বন্দীরূপে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে নীত হয়। পাছে বিশ্বেশ্বরী শকুনির জন্মের কলঙ্কের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে, সেই জন্য তাহাকে চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে এক অতি অন্ধকার কারাগারে এতদিন বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।

এক্ষণে শকুনি বন্দী হইলে পর বিশ্বেশ্বরী সেই কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কারাবাসে তাহাকে যে কষ্টে রাখা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার শরীরে কেবল অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট ছিল। আপনার এই সমস্ত বিবরণ বলিতে বলিতে তাহার চক্ষুদ্বয় কপালে উঠিল ও রক্তবর্ণ হইল, ললাটে শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। সহসা পার্শ্বস্থ একটী সৈনিক পুরুষের নিকট হইতে একটী তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইয়া সজোরে

শকুনির বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল।' ছিন্ন তরুর ন্যায় শকুনির মৃতদেহ ভূতলে পতিত হইল।

"সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হইল," "সতীশ-চন্দ্রের মৃত্যুর প্রতিহিংসা হইল," "মাতৃহন্তার উপযুক্ত শাস্তি," "কপটাচারীর উচিত দণ্ড," এইরূপ নানা প্রকার কথা বলিয়া সকলেই গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বরীর জীবনের কার্য্যও অদ্য শেষ হইল;—সেই শীর্ণ দেহ হইতে ধীরে ধীরে প্রাণ নির্গত হইল। ভ্রাতার মৃত দেহের দিকে দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে অভাগিনী পাগলিনী প্রাণত্যাগ করিল।

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

Why let the stricken deer go weep,
The hart ungalled play,
While some must watch while some must sleep,
Thus runs the world away.

Shakespeare.

উপরিউক্ত ঘটনার কিছুদিন পরেই রাজা টোডর মল্ল ইচ্ছাপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রতিগমন করিলেন। নগেন্দ্রনাথ পুত্রদিগকে জমিদারীর ভার দিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কোন পুত্র ভার লইতে ইচ্ছা করিলেন না। উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার জমিদারী লইয়া কিছু আবশ্যক নাই, জমিদারীর কার্য্য আমার পক্ষে বিরক্তিজনক বোধ হইবে,—আমি আশ্রমে যাইয়া নীরবে বাস করিতে ইচ্ছা করি, তাহার অধিক আমার আর সুখ নাই।" জ্যেষ্ঠের অসম্মতি দেখিয়া সুরেন্দ্র-

নাথও অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু পিতার অনুরোধে অবশেষে সেই ভার গ্রহণ করিলেন।

উপেন্দ্রনাথ কমলাকে লইয়া বনাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় তাঁহারা কৌতুক বশতঃ একখানি নৌকা রাখিলেন, উপেন্দ্রনাথ সতত‍ই কমলাকে সেই নৌকায় বসাইয়া আপনি দাঁড় বাহিতেন—পরস্পর পরস্পরের প্রেমে অপরিসীম সুখলাভ করিতে লাগিলেন, এ সংসারে তাঁহাদিগের অপেক্ষা সুখী ও নিশ্চিন্ত কেহ জীবন ধারণ করেন নাই।

নগেন্দ্রনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া ইচ্ছাপুরে বাস করিতে লাগিলেন, বৃদ্ধ বয়সে গুণবান্ পুত্র দেখিয়া সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে বিবাহ করিয়া দুইটী বিস্তীর্ণ জমিদারীর একাধীশ্বর হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের মত প্রজাবাৎসল্য, পূর্ব্বের মত অমায়িকতা এক্ষণও রহিল। এক্ষণও ছদ্মবেশে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের অবস্থা জানিতেন, সাধ্যমতে সে অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যত্নবান হইতেন।

সুরেন্দ্রনাথ আপন পুরাতন বন্ধু নবীনদাসকে আপনার দেওয়ান করিলেন,—রুদ্রপুরে বিশ্বেশ্বরী পাগলিনী অমলার হাত দেখিয়া যাহা বলিয়া দিয়াছিল, তাহা যথার্থ হইল,—অমলা দেওয়ানের গৃহিণী হইলেন। অমলা সরলাকে সেইরূপ ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন,—তাঁহার পুরাতন বন্ধু "ইন্দ্রনাথের" সহিত সেইরূপ আমোদরহস্য করিতেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে কখনও সুরেন্দ্রনাথ বলিতেন না, "ইন্দ্রনাথ" ভিন্ন অন্য নামে ডাকিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত,—তাহাতেই মহাহৃষ্ট।

আমাদের ইচ্ছা এই স্থানেই আখ্যায়িকা শেষ করি, কিন্তু জগতে সকলের কপালে সুখ ঘটে না, কাহারও কপালে সুখ থাকে, কাহারও ললাটে দুঃখ থাকে,—দুই একটী দুঃখের কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

পাঠক মহাশয়, জানেন, প্রতিহিংসা মহাশ্বেতার জীবনের গ্রন্থিস্বরূপ হইয়াছিল। বৃদ্ধাবস্থায় যে চিন্তায় ছয় বৎসর কাল অভিভূত ছিলেন, সে চিন্তা তাঁহার জীবনের প্রতিকৃতি স্বরূপ, জীবনের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সে চিন্তা শেষ হইল, জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইল, সরলার বিবাহের কয়েকদিন পর কোন রোগ কি পীড়া বিনা মহাশ্বেতা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আর বিমলা! উন্নতচরিত্রা, ধর্ম্মপরায়ণা, রূপলাবণ্য-সম্পান্না বিমলার কি হইল! হায় যে দিন বিমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই দিন তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়াছিল, সেই দিন অবধি বিমলার পক্ষে জগৎসংসার অন্ধকারময় হইয়াছিল। সে দিন অবধি বিমলার কোন আশা ছিল না, কোন ভরসা ছিল না, কোন সুখের অভিলাষ ছিল না, কোন দুঃখের ভয় ছিল না। সেই দিন অবধি বিমলা উদাসীনা, হৃদয়ে পূর্ব্বে যে সকল প্রবৃত্তি ছিল, সকলই সেই দিন হইতে বিলীন হইয়াছিল, মানবজাতি যে মায়াজালে জড়িত হইয়া জগতে সুখ দুঃখ অনুভব করে, বিমলার সে মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছিল!

বিমলা ভাবিলেন, "আমার হৃদয় শূন্য হইয়াছে।" সেটী ভুল, এক্ষণও একটী প্রবৃত্তি ছিল, নারীর মৃত্যু পর্য্যন্ত যে প্রবৃত্তি জাগরুক থাকে, বিমলার হৃদয়ে সে প্রবৃত্তিটী জাগরিত ছিল। যে দিন সরলার বিবাহ

হইবে, সহসা বিমলার মনে অপরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল; পূর্ব্বের কথা, পূর্ব্বের স্মৃতি, পূর্ব্বের ভাব, পূর্ব্বের প্রেম জাগরিত হইতে লাগিল।

সেই দিন সুরেন্দ্রনাথ একবার বিমলার সহিত দেখা করিলেন, বলিলেন, "বিমলা, বিপদকালে তুমিই আমার সাহায্য করিয়াছিলে,—আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দুই বার আমাকে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছ, আমার আর একটী ভিক্ষা আছে, সেটীও পূরণ কর,—যত দিন তোমার বিবাহ না হয়, পাটেশ্বরী হইয়া আমার গৃহে অবস্থান কর, সরলা তোমার চরণসেবা করিবে, জীবনের ঋণ যদি পরিশোধ করা যায়, আমি যত্ন ও শুশ্রূষা দ্বারা তাহা শোধ করিব। পরে যখন তোমার বিবাহ হইবে সে দিন প্রস্থান করিও।"

শেষ কথাটী শুনিয়া বিমলা বলিলেন, "সে কবে?" বলিয়া একটু হাসিলেন। সে হাসি বিকট ও অস্বাভাবিক, উন্মাদিনীর মর্ম্মান্তিক বেদনা হইলে ওষ্ঠে যেরূপ হাস্য থাকে, এ সেইরূপ;—সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া চমকিত হইলেন।

ক্ষণেক পর সুরেন্দ্রনাথ বিমলার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অতিশয় স্নেহের সহিত বিমলার হস্তদ্বয় আপনার হস্তে লইয়া করুণ বচনে বলিতে লাগিলেন,

"বিমলা, তোমাকে দুঃখিনী দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার জীবনধারণ করিতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। জগতে ধর্ম্মপরায়ণা পরোপকারিণীদিগের যদি এ অবস্থা হয়, তাহা হইলে, এ অসার সংসারে কে বাস করিবে? তুমি আমার জন্য এরূপ কষ্ট

তোমার দুঃখ যদি দেখিতে হইল, তখন আর এ সংসারে আমার সুখ নাই; মানে, ঐশ্বর্য্যে, সম্ভ্রমে, প্রেমে আমার সুখ নাই; পিতা, পিত্রালয় সকল ত্যাগ করিয়া বনবাস করাই বিধেয়। বিমলা শান্ত হও, আমাকে চিরকালের জন্য দুঃখী করিও না, আপনাকে চিরদুঃখী করিও না।”

বিমলা শান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার উন্মত্ততার আর কিছুই চিহ্ন নাই, নীরবে বসিয়া রহিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের করস্পর্শে তাঁহার হস্তদ্বয় ঘর্ম্মে আপ্লুত হইতেছিল, সুরেন্দ্রনাথের অঙ্গে সংস্পৃষ্ট তাঁহার অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সমস্ত বসন সিক্ত করিতেছিল, আর সুরেন্দ্রনাথের শোকপরিপূর্ণ করুণ মধুর বচনে তাঁহার নয়নধারা অবারিত বহির্গত হইয়া বক্ষঃস্থলের বসন একবারে সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কিঞ্চিৎ আশ্বাসও পাইলেন, কেন না যে ক্রন্দন করিতে পারে, ক্রমশঃ তাহার দুঃখের লাঘব হয়। পুনরায় সস্নেহ বচনে বলিতে লাগিলেন;—

“বিমলা, শান্ত হও এ জগতে কেবল সুখের জন্য কয় জন আইসে, কেবল দুঃখের জন্য কয় জন আইসে? চিরকাল কাহারও সুখ তিষ্ঠে না। পতি বা পত্নীবিয়োগ, ধনক্ষয়, মানহানি, আশায় নৈরাশ, প্রিয়তমের বিচ্ছেদ, পুত্রের মৃত্যু, আত্মীয় কুটুম্বের যাতনা, এইরূপ সহস্র বিপদের একটা নয় একটাতে অতি সুখী লোকেরও সুখ নাশ করে, অতিশয় আনন্দের গৃহকেও শোকে পরিপূর্ণ করে, মানবজাতিকে ইহকালে সকলই মায়া ও ভ্রমময়, এইরূপ শিক্ষা দেয়। সেইরূপ কাহারও দুঃখ

শোকনিশার প্রভাত আছে, করুণাময় পরমেশ্বর সকল পীড়ার ঔষধ দিয়াছেন, সকল বিপদেরই উদ্ধারের উপায় দিয়াছেন, সকল শোকেরই শান্তি দিয়াছেন। আমাদিগের সকলকেই নিজ নিজ দুঃখভার বহন করিতে হয়। বিমলা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর, অদ্যকার দুঃখ কল্য থাকিবে না।”

বিমলা নীরবে বসিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ মনে করিতেছিলেন যে, বিমলা তাঁহার কথা শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু বিমলার সে দিকে মন ছিল না, কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের নিকটে বসিয়া আছেন এই মাত্র জ্ঞান ছিল, কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের প্রবোধ বাক্যের সঙ্গীত ও মধুরতা তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ে কোন মধুর চিন্তার উদ্রেক করিতেছিল। বিমলা সেই মধুর সুখের চিন্তায় একাগ্রচিত্তে লিপ্ত ছিলেন, স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া প্রেমের সফলতার কোন স্বপ্নে লিপ্ত ছিলেন,—এক্ষণেই তিনি যথার্থ সংজ্ঞাশূন্য ও পাগলিনী হইয়াছিলেন। যখন সুরেন্দ্রনাথের বচনের শেষ হইল, তখন সেই মধুর চিন্তাসূত্র সহসা ছিন্ন হইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের দিকে দেখিলেন, সহসা পাগলিনীর ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের দিকে হস্ত প্রসারণ করিলেন, তৎক্ষণাৎ বিমলার সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, অমানুষিক মানসিক চেষ্টার দ্বারা হৃদয়ের বেগ সম্বরণ করিলেন। সহস্র সুন্দর সুমিষ্টভাবে মুখ একবার রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আবার সহস্র বিকট নৈরাশ্যজনক ভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে সে রক্ত অপসারিত হওয়ায় বদনমণ্ডল একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইল;—“সুরেন্দ্রনাথ আমি চলিলাম, অভাগিনীকে স্মরণ রাখিও” এই বলিয়া

সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ জলসেচন ও ব্যজন করিয়া তাঁহাকে চৈতন্যদান করিবার চেষ্টা করিলেন,—সে চেষ্টা বৃথা, বিমলার জীবনগ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছিল,—কয়েক মাস হইতে প্রেমের জ্বলন্ত পাবক নিভৃত রাখিবার চেষ্টায় হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ হইতেছিল,—আজি সে বীরান্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল।

সন্ধ্যাকাল সমাগত। শঙ্খধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ হইল, শুভকার্যোপলক্ষে স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি নৈশ গগনে উত্থিত হইতে লাগিল, জমীদারপুত্রের বিবাহোপলক্ষে চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামবাসী ও গ্রামবাসিনী একত্র হইয়া আনন্দধ্বনিতে গ্রাম পরিপূর্ণ করিল। সরলা (বিমলার মৃত্যুবার্ত্তা তাহাকে কেহ অবগত করায় নাই।) অপরিসীম আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল,—কেবল সুরেন্দ্রনাথের ভ্রূকুঞ্চিত ললাট নৈরাশ্যের অনপনেয় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সেইদিন আপন জীবনদাত্রীকে চিতায় স্থাপিত হইতে দেখিয়াছিলেন, ধূ ধূ করিয়া অগ্নিশিখা কয়েক সময়ের মধ্যে সেই শরীরকে ভস্মসাৎ করিল তাহা দেখিয়াছিলেন,—সেই দর্শন দৃষ্টি করিয়া তিনি বিবাহ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আনন্দের দৃশ্যে তিনি কেবল সেই অগ্নিরাশি দেখিতে লাগিলেন, আনন্দের শব্দে কেবল সেই দাহের শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, এ সংসারে যত দম্ভ, যত আনন্দ, যত গর্ব্ব, যত ঘোরঘটা যত হাস্যধ্বনি সকলই সেই ভীষণ চিতা-শব্দের প্রারম্ভ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না।

তিনশত বৎসর অতীত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের

বীচিমালার ন্যায় নূতন বংশ ও নূতন লোক এক্ষণে তাঁহাদের স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.